

আশাপূর্ণাদেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ক

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে
পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য প্রস্তাবিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক
বিশ্বজিৎ রায়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. দীপক কুমার রায়
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর, ২০১৪

Declaration

I declare that the Thesis entitled ‘আশাপূর্ণাদেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ক’ has been prepared by me under the guidance of Dr. Dipak kumar Roy, Professor of Bengali Department, University of North Bengal. No part of this Thesis has formed the basis for the award of my degree or fellowship previously.



Department of Bengali
University of North Bengal
Rajarammohanpur
Darjeeling, 734013
West Bengal, India
Date-

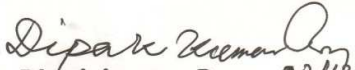
Dr. Dipak Kumar Roy
Assistant Professor,
Department of Bengali
University of North Bengal



P.O. North Bengal University
Raja Rammohunpur, Dist.
Darjeeling, Pin – 734013
West Bengal, India

CERTIFICATE

I certify that Biswajit Ray has prepared the thesis entitled
'আশাসূৰ্গাদেবীৰ উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ক', for the award of Ph.D. Degree of
the University of North Bengal, under my guidance. He has
carried out the work at the Department of Bengali N.B.U.


Dr. Dipak Kumar Roy *22/12/14*
Assistant Professor
Department of Bengali
Department of Bengali
University of North Bengal

University of North Bengal

Date-

গবেষণা অভিসন্দর্ভের বস্তুসার

ভূমিকা

গবেষণার শিরোনাম ‘আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ক’।
উপন্যাসিকের নিজস্ব উপলব্ধি ও তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত দাম্পত্য সম্পর্কের
মূল্যায়ন করা হয়েছে। মানুষের নারী-পুরুষ কেন্দ্রিক দাম্পত্য জীবনের
সামগ্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে গবেষণা সন্দর্ভ রচিত হয়েছে। আশাপূর্ণা
দেবীর উপন্যাসের প্রেক্ষিতে মূলত দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে জীবনের
সঠিক পথের অনুসন্ধান করা হয়েছে এই গবেষণা সন্দর্ভে।

প্রথম অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী’র জীবন ও সাহিত্য কৃতির পরিচয়

প্রথম অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকীর্তির
কথা তুলে ধরে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ও উপলব্ধি
প্রকাশ করা হয়েছে। কীভাবে তিনি একজন নারী হয়েও ঊনবিংশ শতাব্দীর
করাল সমাজ ব্যবস্থায় নিজের উদ্যোগেই ও অদম্য চেষ্টায় পড়াশুনা
শিখেছেন। এবং কত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন
তুলে ধরা হয়েছে তার বিবরণ। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত দাম্পত্য জীবন
কেমন ছিল সেকথাও আলোচিত হয়েছে। তিনি সমাজকে কীভাবে দেখেছেন
এবং উপলব্ধি করেছেন; তার কতটা পরিমাণ সাহিত্যে তুলে ধরেছেন
সূত্রধারকরে তা উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও
সাহিত্যিক হয়ে ওঠার ইতিহাস প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।
‘আশাপূর্ণা দেবী’ শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত যে সমস্ত মানুষের সাহচর্যে
একজন যথার্থ সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন, যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলেই

স্মরণীয়। মূলত বিশেষ একজন মরমী কথাকারের জীবনী আলোচনার মধ্য দিয়ে আদর্শ জীবনের সন্ধান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসের ক্রমানুসারে পর্যায় বিভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ রচিত উপন্যাসগুলির সুমার্জিত পর্যায় বিভাগ করে প্রকাশকাল সহ তুলে ধরা হয়েছে। মূলত তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্য রচনার প্রেক্ষিত হিসেবে উপন্যাসগুলোর পর্যায় বিভাগ করা হয়েছে। শ্রেণীবদ্ধ পর্যায় বিভাগে তিনটি পর্বে যথাক্রমে ‘প্রভাত পর্ব’, ‘মধ্যাহ্ন পর্ব’ ও ‘সায়াহ্ন পর্ব’ নামে বিভক্ত করে উপন্যাসগুলোর পর্যায়ক্রম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যাতে করে ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ কোন সময়কালে কী কী উপন্যাস লিখেছেন এবং তাঁর লেখার ধরন কেমন ছিল তা বোঝা যায়। ‘প্রভাত পর্বে’ সমাপ্তি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র প্রকাশকাল পর্যন্ত ধরা হয়েছে। কারণ সূর্যের আভা যেমন প্রভাতের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্নিগ্ধ ও মধুর থাকে, তেমনি ‘আশাপূর্ণা দেবী’র ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাস পর্যন্ত একটি মনোরম পর্ব হিসেবে ধরা যায়। ‘মধ্যাহ্ন পর্বে’ বেশীরভাগ বিখ্যাত উপন্যাসগুলো স্থান পেয়েছে। একই ভাবে ‘সায়াহ্ন পর্বে’ শেষ জীবনের রচিত উপন্যাসগুলোর নাম ও প্রকাশনা সহ প্রকাশ কাল উল্লেখিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী'র পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপরেখা

তৃতীয় অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের কথা কীভাবে লিপিবদ্ধ আছে তা তথ্যাকারে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা উপন্যাস রচনার সূচনালগ্ন থেকে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র

সময়কাল পর্যন্ত সমস্ত ঔপন্যাসিকদের কথা সূত্রাকারে তুলে ধরা হয়েছে। আর তা করতে গিয়ে স্বভাবতই দাম্পত্যপূর্ব জীবন ও বিবাহ কেন্দ্রিক নানাতর সমস্যা ও সমাধানের বিশ্লেষণ ও ঔপন্যাসিকদের মতামত যথাযথ ভাবে আলোচিত। এই অধ্যায়ে বিবাহ রীতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবনের পর্যালোচনা করে বর্তমান কালের দাম্পত্য সম্পর্কের বিবর্তন নির্দেশিত। উক্ত বিষয়ে ঔপন্যাসিকদের চিন্তা-চেতনা ও মননের প্রকাশ সাহিত্যে কতটা পরিমানে হয়েছে তাই আলোচনা মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিবরণ

চতুর্থ অধ্যায়ে 'আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসগুলিতে কিরূপ দাম্পত্য সম্পর্ক আছে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে জীবনের প্রথম দিকে রচিত উপন্যাস ও পরবর্তী সময়ে রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিন্নতা ও উৎকৃষ্টতার অনুসন্ধান করা হয়েছে। মূলত একজন মরমী কথাকার হিসেবে 'আশাপূর্ণা দেবী' কিরকম দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাস করেন। তিনি কতটা উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশ করতে পেরেছেন তা নির্ভুলভাবে আলোচিত। তিনি পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিক বা সাহিত্যিকদের থেকে আলোচ্য বিষয়ে কতটা স্বতন্ত্র ছিলেন; সেকথাও অনেকাংশে এই অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে নারীর সামাজিক অবস্থান

পঞ্চম অধ্যায়ে 'আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে নারীর জীবনের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করে সূত্রাকারে আলোচনা করা

হয়েছে। মূলত বাঙালী ঘরের নারীকে কন্যা, জায়া, জননী হিসেবে দেখা হয়; কিন্তু তার পেছনে পুরুষ শাসিত সমাজের মূল উদ্দেশ্য কী থাকে? তাই অনুসন্ধান করা হয়েছে। একজন নারী যেমন সম্পর্কের সৃষ্টিদাত্রী, তেমনি আবার ধ্বংসের মূর্তি। নারীর বিচিত্র রূপের বর্ণনার মধ্য দিয়ে নারীসত্তা নির্মাণে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ কতটা সফল তার অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাঁকে সাহিত্য সমালোচকরা অনেক ক্ষেত্রে রান্নাঘরের লেখিকা বলেছেন। তার কারণ তিনি যত সূক্ষ্মভাবে ও মুরতি মনে নারী জীবনের বিশ্লেষণ করেছেন, অন্যকোন ঔপন্যাসিক তেমনভাবে তা করতে পারেননি। আলোচ্য প্রসঙ্গে তাঁর সফলতা ও অন্য ঔপন্যাসিকদের ব্যর্থতা উল্লেখযোগ্য। নারীর বিভিন্ন রূপের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে আসলে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিতকেই স্পষ্ট করে দেখা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় আশাপূর্ণা দেবী ও অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ও অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাসের চরিত্রের দাম্পত্য জীবন প্রসঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের বেশীর ভাগ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তুলনায় কতটা ভিন্নতা আছে, তাই এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ‘পুরুষ ঔপন্যাসিক’ ও ‘নারী ঔপন্যাসিক’ দুটি পর্বে বিভক্ত। কারণ পুরুষ ঔপন্যাসিকরা চিত্রকল্প রচনায় যেখানে কলম থামিয়ে দিয়েছেন, কিছু ক্ষেত্রে নারী ঔপন্যাসিকরা সেখান থেকে শুরু করেছেন। তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে দাম্পত্য জীবনের ভিন্নতা ও ঔপন্যাসিকদের দাম্পত্য সম্পর্ক কেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার

পরিশেষে সম্পূর্ণভাবে গবেষণা বিষয়ের জটিলতা ও সফলতা তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণার সময়কালের অভিজ্ঞতা ও জীবনাবিজ্ঞা আলোচ্য অংশে লিপিবদ্ধ। যেভাবে প্রতিদিন মানুষের সম্পর্কগুলো ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে, খুব সহজে একে অপরের সঙ্গে আমরা সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিচ্ছি। মানুষ রূপে আমরা মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা ভুলে যাচ্ছি। প্রতি ক্ষেত্রেই একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে, সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ফেলি। এসবের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের কী করা উচিত? ‘আশাপূর্ণা দেবী’ দাম্পত্য জীবন যাপন করা সম্পর্কে কীরকম মত পোষণ করেন? গোটা গবেষণার সংক্ষিপ্ত কথা রূপে তাই তুলে ধরা হয়েছে। মূলত ‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাসের প্রেক্ষিতে শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ের বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সঠিক পথের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

গবেষকের স্বাক্ষর

.....

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

.....

নিবেদন

‘আশাপূর্ণাদেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ক’ শিরোনামে আমার গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করেছি। ‘পিএইচ. ডি.’ উপাধির জন্য গবেষণা শুরুর আগে ‘রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ফেলোশিপ’ নিয়ে ২০০৮-২০১০ শিক্ষাবর্ষে ‘এম. ফিল’ পাঠক্রম শেষ করি। ‘এম. ফিল’ পাঠক্রমে ‘আশাপূর্ণাদেবীর জীবন ও ত্রয়ী উপন্যাসে নারী চরিত্রের ক্রমবিকাশ’ শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছিলাম। ‘এম. ফিল’ পাঠক্রমের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষকদের পরামর্শ নিয়ে পরবর্তীকালে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র বিখ্যাত উপন্যাসগুলি নিয়ে অনুসন্धानে ত্রয়ী হই। তারপর ‘রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ফেলোশিপে’র অধীনে পরবর্তী পর্যায়ে ২০১২ সনের ২৬ মার্চ তারিখে পিএইচ. ডি রেজিস্ট্রেশন হয়। এবং পূর্ববর্তী গবেষকদের গবেষণার বিষয় ব্যতিরেকে, আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমার গবেষণার সন্দর্ভ রচনা করি। আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দীপক কুমার রায়ের পরামর্শ ও সহযোগিতায় গবেষক জীবনের প্রথম আলোকশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়। তত্ত্বাবধায়কের আদেশে ‘এম. ফিল’ পাঠক্রমের শেষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সেখানকার গবেষণা কর্মের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করি। আর সেই তালিকার ভিত্তিতে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাসের অনালোচিত বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করি।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নিখিলেশ রায় আমাকে গবেষণা কর্মে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। অধ্যাপক অক্ষুশ ভট্ট, অধ্যাপক সুবোধ কুমার যশ, ড. উৎপল মণ্ডল, ড. তপন

কুমার মণ্ডল প্রমুখ শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপরামর্শ দিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রেজাউল করিম উত্তরবঙ্গ থেকে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেও মুঠোফোনের মাধ্যমে অনেক সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর অনুপ্রেরণা আমাকে নতুন নতুন বিষয়ে ভাবনায় ভাবিত করেছে। শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র সাহিত্য নিয়ে কয়েকটি গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই তাঁর কাছে আমার গবেষণা কর্মের অনেক জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান হয়েছিল। সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সহযোগীতায় আমার জানার পরিধি অনেকটাই সমৃদ্ধ হয়েছে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের আশীর্বাদ আমার আগামী জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।

আমার পিতা শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায় ও মাতা শ্রীমতীবাসুকা রায় গবেষণা কাজের সময় সমস্ত রকম সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের আশীর্বাদে আমার প্রতিদিনের পথ চলা। সহধর্মিণী মিঠুরাণী দাস সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করেছে গবেষণা কাজে, তার দায়িত্ববোধ ও কর্মপ্রেরণা দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার গবেষণার পরিপন্থী। অগ্রজ পিংকু রায় সংসারের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে পড়াশোনা করতে সাহায্য করেছে, তার সহযোগীতা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। এছাড়াও আমার গবেষণায় সাহায্য করেছে আরো কিছু মানুষ, যাদের সহযোগীতায় বাস্তব জীবনের দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার জানার পরিধি বেড়েছে। তাদের প্রতিদিনের জীবন যাপনে দাম্পত্য সম্পর্কের সুস্মৃ অনুভূতিগুলি আমাকে ভাবিত করেছে। যার ফলে দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করার জন্য উৎসাহিত বোধ করি। তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থভবন থেকে প্রয়োজনীয় গবেষণা
অভিসন্দর্ভ, বই ও পত্র-পত্রিকা আমার গবেষণাকে উত্তরোত্তর ত্বরান্বিত
করেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার থেকে কিছু
সহযোগিতা পেয়েছি। কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন গবেষণাগারের অধিকর্তা
সন্দীপ দত্ত অনেক পত্রিকা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে গবেষণা শুরুর মুহূর্তে
বিষয় নির্বাচনে পরামর্শ দিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের
প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় অশ্রুকুমার শিকদার মহাশয়, কোচবিহার ঠাকুর
পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার রায়, গৌড়বঙ্গ
বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. বিকাশ রায়, শিলিগুড়ি কলেজের
অধ্যাপিকা শ্রদ্ধেয়া ড. উমা মাজি মুখোপাধ্যায় কিছু বিষয়ে সুপরামর্শ
দিয়েছেন। গবেষণা কর্মে আদ্যন্ত যিনি সারথি হিসেবে আমাকে পরিচালিত
করেছেন, আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় দীপক কুমার রায়ের আশীর্বাদ ও
সুপরামর্শ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আমার গবেষণা কর্মের মৌলিকতা বজায়
থেকেছে শ্রদ্ধেয় সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের অনুপ্রেরণায়। সকলের প্রতি
কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানিয়ে আগামী দিনে আমার গবেষণার সাফল্য কামনা
করি।

বিশ্বনাথ ঠাকুর

স্বাক্ষর

তাং
স্থান—

সূচিপত্র

ভূমিকা	১-৬
প্রথম অধ্যায় আশাপূর্ণা দেবী'র জীবন ও সাহিত্য কৃতির পরিচয়	৭-২৯
দ্বিতীয় অধ্যায় আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসের ক্রমানুসারে পর্যায় বিভাগ	৩০-৪৬
তৃতীয় অধ্যায় আশাপূর্ণা দেবী'র পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপরেখা	৪৭-৮৭
চতুর্থ অধ্যায় আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিবরণ	৮৮-১৩৩
পঞ্চম অধ্যায় আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে নারীর সামাজিক অবস্থান	১৩৪-১৮২
ষষ্ঠ অধ্যায় আশাপূর্ণা দেবী ও অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা	১৮৩-২০৫
উপসংহার	২০৬-২১০
গ্রন্থপঞ্জি	২১১-২২৯
নির্ঘণ্ট	২৩০-২৩৫

ভূমিকা

স্বহৃদয়শীল মানুষ রচনা করেন সাহিত্য। সাহিত্য জিজ্ঞাসায় যিনি নিষ্ঠাবান, তিনি স্বহৃদয়শীল পাঠক বা সমালোচক। প্রতিটি মানুষের অভিপ্রায় থাকে – “কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত তুলিতে, খোন্তায়, কলমে, কত আঁকজোক, কত প্রয়াস-বাঁদিক হইতে ডাহিনে, ডাহিন দিক হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হইতে অন্য সারে। কী? না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না; তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া, প্রবাহিত হইয়া চলিবে”^(১)। এই একই অভিলাষ নিয়ে একজন ঔপন্যাসিক সমাজের চারপাশে দ্রষ্টব্য নানাতর মানবিক সম্পর্কে উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। ঔপন্যাসিকরা মূলত তাঁদের লেখায় তুলে ধরতে চান মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক নানা সম্পর্ক। আর সেই সম্পর্কের বিন্যাসে মানুষ ও মানুষের মনন বেশী করে প্রাধান্য পায়। আর মননের রূপায়নে উঠে আসে ভিন্ন ধর্মী সম্পর্কের বিন্যাস। মানুষের ভিন্নতর সম্পর্কের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। মূলত দাম্পত্য জীবনের প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে বেশীরভাগ উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়ে থাকে। দাম্পত্য সম্পর্কের নানাদিক বিশ্লেষণ করার জন্য ‘আশাপূর্ণা দেবী’র কিছু উপন্যাস প্রেক্ষিত হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলির প্রেক্ষিতে যে গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করেছি, সম্ভবত এই ধরনের আলোচনা পূর্বে কোন গবেষণায় আলোচিত হয়নি বলে মনে হয়। আমার গবেষণার মাধ্যমে মানুষের দাম্পত্য সম্পর্কের ভিন্নতা ও উৎকৃষ্টতার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষের বিবাহপরবর্তী জীবনের ঐতিহাসিক সত্যতা উল্লেখের মাধ্যমে, ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে কিভাবে, কেন ও কোন পর্যায়ে দাম্পত্য সম্পর্কের

কথা তুলে ধরেছেন। সেইসব বিষয়ের বিশ্লেষণ করে গবেষণা পত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একদিকে যেমন ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’র পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনায় কিরকম দাম্পত্য সম্পর্ক রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি। অন্যদিকে পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের তুলনায় তাঁর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের কতটা ভিন্নতা আছে; তার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। সামগ্রিকভাবে আমার গবেষণাপত্রে মূলত ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাসের প্রেক্ষিতে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিন্নতা প্রসঙ্গে একটা সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে মানুষের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সংস্কার ও সামাজিকতার বন্ধনের আড়ালে, দাম্পত্য সম্পর্কের সঠিক মূল্যায়ন করার মধ্য দিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনের রসদ অনুসন্ধান করে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন অধ্যায়ে।

প্রথম অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকীর্তির কথা তুলে ধরে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ও উপলব্ধির প্রকাশ করা হয়েছে। কীভাবে একজন নারী হয়েও বিংশ শতাব্দীর করাল সমাজ ব্যবস্থায়, তিনি নিজের উদ্যোগেই ও অদম্য চেষ্টায় পড়াশোনা শিখেছেন। কত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার বিবরণ এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত দাম্পত্য জীবন কেমন ছিল, সেকথাও লিপিবদ্ধ হয়েছে এই অধ্যায়ে। তিনি সমাজকে কীভাবে দেখেছেন এবং নিজস্ব উপলব্ধির মাধ্যমে সাহিত্যের পাতায় কতটা তুলে ধরেছেন? সূত্রাকারে তাই উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্যিক হয়ে ওঠার ইতিহাস, ধারাভাষ্য আকারে প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ যে সমস্ত মানুষের সাহচর্যে একজন যথার্থ সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন, তাঁদের সকলের কথা যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। মূলত একজন মরমী

কথাকারের জীবন বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি আদর্শ দাম্পত্য জীবনের সন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ রচিত উপন্যাসগুলির সুমার্জিত পর্যায় বিভাগ করে প্রকাশকাল সহ তুলে ধরা হয়েছে। মূলত তাঁর জীবনের ধারাবাহিকতা ও সাহিত্য রচনার সময়কে প্রেক্ষিত হিসেবে নিয়ে উপন্যাসগুলোর পর্যায় বিভাগ করা হয়েছে। তিনটি পর্ব যথাক্রমে ‘প্রভাত পর্ব’, ‘মধ্যাহ্ন পর্ব’ ও ‘সায়াহ্ন পর্ব’ নামে শ্রেণীবদ্ধ পর্যায় বিভাগে উপন্যাসগুলোর পর্যায়ক্রম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যাতে করে ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ কোন সময়কালে কী কী উপন্যাস লিখেছেন, এবং তাঁর লেখার ধরন কেমন ছিল তা বোঝা যায়। ‘প্রভাত পর্বে’র সমাপ্তি ঘটেছে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র প্রকাশকাল পর্যন্ত। কারণ সূর্যের আভা যেমন প্রভাতের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্নিগ্ধ ও মধুর থাকে, তেমনি যেন ‘আশাপূর্ণা দেবী’র ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাস পর্যন্ত একটা স্নিগ্ধ ধারা দেখা যায়। ‘মধ্যাহ্ন পর্বে’ বেশীরভাগ বিখ্যাত উপন্যাসগুলো স্থান পেয়েছে। ‘বৃত্তপথ’, ‘সুবর্ণলতা’, ‘বকুলকথা’, ‘যুগলবন্দী’, ‘মায়াদর্পণ’, ‘বিরহী বিহঙ্গ’, ‘দ্বিতীয় অধ্যায়’, ‘নিভৃত আকাশ’, ‘পলাতক সৈনিক’, ‘বালির নিচে ঢেউ’, ‘সন্ধিক্ষণ’ প্রভৃতি উপন্যাসগুলি প্রতিনিধিত্বান্বিত। এই পর্বের উপন্যাসগুলিতে নারীর জীবন ও দাম্পত্য সম্পর্কের নানাবিধ পরিষ্কার-নিরীক্ষা করেছেন ঔপন্যাসিক। ‘সায়াহ্ন পর্বে’ ঔপন্যাসিকের জীবনের অবিজ্ঞতায় রচিত উপন্যাসগুলির প্রকাশকের নাম ও প্রকাশ কাল সহ উল্লেখ করা হয়েছে। এরকম পর্ব বিভাগের মাধ্যমে উপন্যাসের সঠিক প্রকাশকাল জানা সম্ভব হয়। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পর্যায়ক্রমে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাসের প্রেক্ষিতে দাম্পত্য সম্পর্কের সঠিক বিশ্লেষণে এই পর্ব বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনায় দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণের ক্রমপর্যায় তথ্যাকারে আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য উপন্যাস রচনার সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র সময়কাল পর্যন্ত প্রতিনিধিত্বান্বিত ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের কথাই সূত্রাকারে উল্লেখিত। আর তা করতে গিয়ে স্বভাবতই মানুষের দাম্পত্যপূর্ব জীবন ও বিবাহ কেন্দ্রিক নানাতর সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ঔপন্যাসিকদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে বিবাহ রীতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচিত। সেইসঙ্গে মানুষের বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবনের পর্যালোচনা ও বর্তমানকাল পর্যন্ত দাম্পত্য সম্পর্কের বিবর্তনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে ঔপন্যাসিকদের চিন্তা-চেতনা ও মননের প্রকাশ সাহিত্যে কতটা পরিমানে ধরা পড়েছে তাই আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাসগুলিতে মূলত কিরূপ দাম্পত্য সম্পর্ক আছে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তাঁর গোটা ঔপন্যাসিক জীবনের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিন্নতা ও উৎকৃষ্টতার অনুসন্ধান করা হয়েছে। মূলত একজন মরমী কথাকার হিসেবে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ কিরকম দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং কতটাই বা তাঁর উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে; মূলত তাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিক বা সাহিত্যিকদের থেকে আলোচ্য বিষয়ে কতটা স্বতন্ত্র ছিলেন, সেকথাও অনেকাংশে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে নারীর জীবনের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করে, সূত্রাকারে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত বাঙালী ঘরের নারীকে কন্যা, জায়া, জননী হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু তার পেছনে কি থাকে পুরুষ শাসিত সমাজের মূল উদ্দেশ্য, তাই আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। একজন নারী যেমন সম্পর্কের সৃষ্টিদাত্রী তেমনি আবার ধ্বংসের প্রতিমূর্তি। নারীর বিচিত্র রূপের বর্ণনার মধ্য দিয়ে নারীসত্তা নির্মাণে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ কতটা সফল, তাই মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁকে সাহিত্য সমালোচকরা অনেক ক্ষেত্রে ‘রান্নাঘরের লেখিকা’ বলেছেন। তার কারণ তিনি যত সূক্ষ্মভাবে ও মুরতি মনে নারী জীবনের বিশ্লেষণ করেছেন; অন্য কোন ঔপন্যাসিক তেমনভাবে তা করতে পারেননি। আলোচ্য প্রসঙ্গে তাঁর সফলতা ও অন্য ঔপন্যাসিকদের কার্য কুশলতার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। নারীর বিভিন্ন রূপের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে আসলে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিতকেই স্পষ্ট করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ও অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণে তুলনামূলক আলোচনা নির্দেশিত হয়েছে। মানুষের দাম্পত্য জীবন প্রসঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে তুলনায় কতটা ভিন্নতা আছে, তাই এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ‘পুরুষ ঔপন্যাসিক’ ও ‘নারী ঔপন্যাসিক’ দুটি পর্বে বিভক্ত করে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। কারণ পুরুষ ঔপন্যাসিকরা দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্রকল্প রচনায় যেখানে কলম থামিয়ে দিয়েছেন, কিছু ক্ষেত্রে নারী ঔপন্যাসিকরা সেখান থেকে শুরু করেছেন। তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে মানুষের দাম্পত্য জীবনের ভিন্নতা ও

ঔপন্যাসিকদের রচিত সাহিত্যে দাম্পত্য সম্পর্ক কেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উপসংহার অংশে গবেষণা বিষয়ের একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষণার সময়কালের অভিজ্ঞতা ও জীবনাবিজ্ঞা আলোচ্য অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেভাবে প্রতিদিন মানুষের সম্পর্কগুলো ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে, খুব সহজে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিচ্ছে। মানুষ হিসেবে মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা ভুলে যাচ্ছে, প্রতি ক্ষেত্রেই একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ফেলছে। এসবের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের কী করা উচিত? তা গবেষণার প্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রেক্ষিতে মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের জীবনচরণের সঠিক পথ নির্দেশিকা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অংশে মূলত ‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাসের প্রেক্ষিতে এবং গবেষণা সন্দর্ভের শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:- (১) সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪র্থ সং, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৮৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪.

প্রথম অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর জীবন

ও

সাহিত্য কৃতির পরিচয়

‘আশাপূর্ণা দেবী’র মতো সাহিত্যিকদের জীবন ও জীবনের সমস্তরকম সৃষ্ট সাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনার জন্য, সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁদের সাহিত্য-কর্মের যথার্থ মূল্যায়নের জন্যও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট স্বতঃসিদ্ধ ভাবে উঠে আসে। সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসেবে সাহিত্যিক অনেকটাই বাহ্য হয়ে যান। যদিও আমরা সাহিত্যকর্মের মাঝেই সৃষ্টিকর্তাকে পেয়ে যাই; তবুও গবেষণার প্রক্ষিতে ব্যক্তি ও তাঁর কর্ম দুইই প্রাধান্য পায়। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ একজন মরমী কথাসাহিত্যিকের পরিচয়ে সারা বিশ্বব্যাপী পরিচিত। মূলত তাঁর খ্যাতি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে। ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি বাঙালী জীবনের নানারকম বৈচিত্র্যকে উপন্যাসের কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। জীবনের শুরু থেকে শেষদিন পর্যন্ত কলমই ছিল তাঁর একমাত্র হাতিয়ার। তাঁর সাহিত্যিকজীবন ভালো করে বুঝতে হলে, অবশ্যই ব্যক্তি ‘আশাপূর্ণাকে’ও সঠিকভাবে জানা দরকার। এইপ্রসঙ্গে সাহিত্যসম্রাট ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের’ সাহিত্য সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তার প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ‘ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ’ গ্রন্থের ভূমিকাংশে তিনি লিখেছেন –

“কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে
সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।

কবিতা দর্পণমাত্র –তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা কীর্তি –তাহা ত আমাদের হাতেই আছে–পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে কি প্রকারে, এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন তাহা বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনা দত্ত প্রধান শিক্ষা এবং জীবনী সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য”^(১)।

‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ যদিও কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে মন্তব্যটি করেছিলেন, তথাপি সাহিত্য সৃষ্টির সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর যুক্তিটি প্রাধান্যযোগ্য বলে মনে করা যেতে পারে। তাই ‘আশাপূর্ণা দেবী’ রচিত উপন্যাস তথা কথাসাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে ব্যক্তি ‘আশাপূর্ণা’কে আমাদের যথাযথ ভাবে জানা দরকার। কারণ ব্যক্তিজীবন মানেই জন্ম ও কর্মের বিস্তারিত আলোচনা, তাতে করেই একজন সৃষ্টিশীল মানুষের জীবনের সঠিক মূল্যায়ণ করা সম্ভব হয়।

ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী (১৩১৫ সনের ২৪শে পৌষ)। তাঁর বাবার নাম ‘হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত’, মায়ের নাম ‘সরলাসুন্দরী দেবী’^(২)। তিনি ছোটবেলা থেকেই সমকালীন তথাকথিত সমাজের নানারকম কুসংস্কারের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার সমস্তক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁর ভাই ও দাদারা পড়াশুনা করার ও স্কুলে যাওয়ার অধিকার পেয়েছিল, কিন্তু তিনি ও তাঁর বোনেরা কেউ সেই অধিকার ভোগ করতে পারেননি। নিজের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও সাধনায় তিনি অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন; কিন্তু তা করতে তাঁকে অসম্ভবকে সম্ভব করতে হয়েছিল, তিনি তাঁর ভাই ও দাদাদের সঙ্গে উল্টোদিকে বই পড়তে বসে উল্টো অক্ষরজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে উল্টো অক্ষরজ্ঞান সোজা করে

নিয়ে, শিক্ষায় মনোযোগী হয়ে পড়েন। এবং কালক্রমে তিনি বোনেদের সঙ্গে কবিতা মুখস্থ করা, ও কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে একদিন সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সাহিত্য রচনার সাধনায় পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটলে, তিনি সাহিত্যের দরবারে চিরকালের শ্রদ্ধার আসনটি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি যখন সাহিত্য রচনা শুরু করছিলেন তখন সাহিত্যাকাশে সর্বক্ষেত্রে রচনাগুণে ‘রবি-প্রতিভা’ পূর্ণপ্রভা দান করে ফেলেছিল। তা-সত্ত্বেও তিনি নিজস্ব প্রতিভায় চিরকালের শ্রদ্ধার সাহিত্যিক স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অজানাকে জানার জন্য সভ্যতার আদিকাল থেকে মানুষ সমস্তরকম বিপদের ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত। শত-সহস্র বাঁধা থাকা সত্ত্বেও যা দুর্লভ অথবা যাকে সহজে জয় করা যাবে না। তার প্রতিই মানুষ তীব্র বাসনায় বহুবার ব্যর্থতার পরেও সাফল্যের চুড়ায় পৌঁছাতে চায়। ‘আশাপূর্ণা দেবী’র ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা হলে এরকমই কিছু তত্ত্বকথা উঠে আসতে পারে। কারণ তাঁর সম্পূর্ণ জীবনের স্বীকৃতির পেছনে ছিল নানারকম প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তিনি যেসময় জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন বাংলাদেশের মাটিতে অনেক সাহিত্যিক পূর্ণপ্রভায় বিরাজমান ছিলেন। সেই কৃতি-সাহিত্যিকদের পরিমণ্ডলে থেকেও তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব ও কর্মের মধ্য দিয়ে আলাদা পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মানুষের ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সর্বকালের স্মরণীয় মরমী কথাকার হিসেবে কাল থেকে কালোত্তীর্ণ হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিকলগ্নে ১৯০৯-০১-০৮ তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এবং প্রায় গোটা শতাব্দী বাংলার সাহিত্যের জগতে বিরাজমান ছিলেন। সাহিত্যের জগতে নানারকম অমৃতের সন্ধান দিয়ে এই ‘অমৃতস্য কন্যা’ বিংশশতাব্দীর শেষলগ্নে ১৯৯৫-০৭-১৩ তারিখে কল্পলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

উল্লেখ্য ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ‘উত্তর কলকাতার পটলডাঙায়’ তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ‘হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত’ ছিলেন সেযুগের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। সেই সময়ে ইংরেজদের আমলের তিনি ‘মানসী’, ‘মর্মবাণী’ ও ‘ভারতবর্ষ’ ইত্যাদি পত্রিকায় ছবি আঁকেছিলেন। এমনকি ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদটি ছিল তাঁর আঁকা। ইংরেজদের বিখ্যাত ‘ল্যাজারাস কোম্পানি’তে তিনি আসবাব পত্রের নকসা আঁকে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ মা ‘সরলাসুন্দরী দেবী’ ছিলেন ‘লাহোর’ শহরের বিখ্যাত ‘ট্রিবিউন’ পত্রিকার সম্পাদক-‘অমৃতলাল রায়ের’ বোন। তাঁর মা ও বাবা দুজনেই ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি একনিষ্ঠ প্রাণ। নিজের মা-বাবা সম্পর্কে ঔপন্যাসিক নিজেই জানিয়েছেন—

“আমাদের বাড়িতে চলতো দুটো বিপরীত হাওয়া। একদিকে বাবা আর একদিকে মা। তখনকার পরিবেশে একজন মানে বাবা রাজভক্ত, আর অন্যদিকে মা রাজ-বিদ্বেষী কটুর স্বদেশী।...তিনি (বাবা) হাঁচি, টিকটিকি, শনি-মঙ্গল, যাত্রা-অযাত্রা, পিছুডাক, এক তারা বা এক শালিক দেখার বিপদ বিশ্বাস করতেন। আর অন্যজন (মা) এগুলো না মেনে দেখিয়ে দিতে চান এসব বাজে।”^(৩)

‘আশাপূর্ণা দেবী’ ছিলেন এরকম পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান। তাঁরা ছিলেন পাঁচ ভাই, তিন বোন, মোট আটজন। সেসময়ের নিয়ম অনুযায়ী ঠাকুরমা ‘নিস্তারিণী দেবীর’ কড়া শাসনে বাড়ির মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বারণ ছিল। কিন্তু ‘সরলাসুন্দরী দেবী’ ছিলেন আধুনিকমনস্ক, চেতনাসম্পন্ন উদার মনের মানুষ। তিনি চাইতেন মেয়েরাও ছেলেদের মতো স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখবে, পড়াশোনা করে দেশ ও জাতিকে চিনবে। কিন্তু তার সেই অভিপ্রায় পুরোপুরি পূর্ণ হয়নি। তবে তাঁর মেয়েরা বাড়িতেই কিছুটা লেখাপড়া শিখেছিল। তিনি নিজেও লিখতে-পড়তে জানতেন। সেকালের প্রচুর নামি পত্রিকা যেমন:—

‘নারায়ণ’, ‘বঙ্গদর্শন’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘প্রবাসী’, ‘সবুজপত্র’, ‘বসুমতী’, ‘মালঞ্চ’, ‘ভারতী’, ‘মানসী ও মর্মবাণী’, ‘অর্চনা’, ‘বালক’, ‘শিশুসার্থী’, ‘বিচিত্রা’, ‘সন্দেশ’ ইত্যাদি পত্রিকার তিনি নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। এছাড়াও তিনি তিনটি গ্রন্থাগার ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’, ‘জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী’ ও ‘চৈতন্য লাইব্রেরী’র সদস্য ছিলেন। নিজের যেমন বই পড়ার প্রচণ্ড নেশা ছিল, ঠিক তেমনি চাইতেন মেয়েরাও পড়াশুনা করুক স্কুলে যাক। তিনি বড় মেয়ে ‘রত্নমালা দেবীকে’ পড়াশুনা করাতে না পারলেও, ‘আশাপূর্ণা দেবীকে’ পড়াশুনার জন্য উৎসাহিত করতেন। কারণ সেকালের নিয়ম মেনে ‘রত্নমালা দেবী’র গৌরীদান প্রথার মাধ্যমে বিবাহ হয়ে যায়। মায়ের সদৃশ্যে এবং নিজের অদম্য আগ্রহে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ দাদাদের সঙ্গে বাড়িতে পড়তে বসেই আয়ত্ত করেন বাংলা বর্ণমালা পড়ার অভ্যাস। সেও ছিল অভিনব, কারণ পুস্তকের অভাবের জন্য দাদাদের পড়ার সময় উল্টো দিক থেকে দেখে দেখে বইপড়ার সুযোগ পেতো বলে, তাঁর অক্ষরজ্ঞান হয়েছিল উল্টোদিক থেকে। উক্ত প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন —“আমি কারও কাছে লেখাপড়া শিখিনি। দাদারা পড়তেন। এই শুনতে শুনতেই পড়তে শেখা।”^(৪) তাঁর মায়ের ব্যবহৃত পত্র-পত্রিকা, বই-পত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়িতে ছিল; তাই পড়াশুনা করার জন্য বাইরের স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন তেমন ছিল না। তাঁর মায়ের বই-পত্র ছিল তাঁর দিন যাপনের একমাত্র সঙ্গী। তিনি শৈশবকাল থেকেই বই পড়তে শেখার আগেই কবিতা মুখস্থ করার অভ্যাস আয়ত্ত করে ফেলেন। কারণ তিনি দাদাদের বইপড়া শুনে শুনেই মনে রাখতেন। অবশ্য সেক্ষেত্রে কবিতা সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের থেকে বেশী প্রাধান্য পেতো। তাঁদের দুইবোনের কবিতা মুখস্থ করে বলা ছিল একটি অন্যতম খেলা। সমালোচক ‘শিবেন্দু শেখর চক্রবর্তী’ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“আশাপূর্ণা ছোটবেলা থেকেই আর পাঁচটা মেয়ের থেকে স্বতন্ত্র

ছিলেন।...আর মায়ের প্রভাবে তাঁর পাঠ ক্ষুধাতো প্রবল ছিলই। তাই স্কুলে কোনদিন না গেলেও শিক্ষায় কোন ঘাটতি পড়েনি”।^(৫)

‘আশাপূর্ণা দেবী’ স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি, কারণ সেসময়ে সমাজ ব্যবস্থায় আর দশটা মেয়ের মতো তাঁরও বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ ছিল। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে গৃহবন্দী জীবন ‘শাপে বর’ হয়ে দেখা দিয়েছিল। নিজের চাহিদা, প্রত্যাশা ও অদম্য ইচ্ছায় বইকেই একমাত্র বন্ধু করে নিয়েছিলেন। মায়ের প্রবল উৎসাহে এবং প্রশ্নে পাঠ্যবইয়ের পাঠ্যাংশের অর্থজ্ঞানের অপেক্ষা না রেখেই অবিরত মুখস্থ করতেন। অবশ্য তারও আগে তাঁর আড়াইবছর বয়সে অর্জিত উল্টোদিকে শেখা অক্ষরজ্ঞান সোজাভাবে শিখে নিতে হয়েছিল। তাঁর থেকে তিনবছরের ছোটবোন ‘সম্পূর্ণা দেবী’র জন্মের সময় আঁতুড় ঘরের বাইরে বসে, তিনি মাকে উচ্চস্বরে বইপড়ে শোনাতেন। অর্থাৎ আমরা সহজেই একথা বলতে পারি যে, তিনবছরের মধ্যেই তিনি বই পড়ার অভ্যাস আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন।

শুধুমাত্র পড়াশুনার ক্ষেত্রে নয়, সমস্তরকম কাজে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ প্রবল আগ্রহী ছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি নিত্যদিনের কাজকর্ম খুব মনোযোগ সহকারে খেয়াল করতেন। তিনি বাল্যকালে পুতুলখেলার চাইতে অন্যান্য খেলাতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ছোটবেলার দিনগুলি সম্পর্কে তিনি নিজেই জানিয়েছেন— “আমি তো খুব ডাকাবুকো ছিলাম। ছেলেবেলায় ঘুড়ি ওড়াতাম, মারবেল খেলতাম, ক্যারাম খেলতাম দাদাদের সঙ্গে।”^(৬) আর দশটা মেয়ের মতো তিনি ঘরকুনো বা ছিঁচকাঁদুনে ছিলেন না। তিনি সমস্ত কাজকর্ম এত দৃঢ়তার সঙ্গে করেছেন যে, তাঁর পরবর্তী প্রজন্মও সেসব কথা গল্পের আকারে পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর কন্যা ‘পুষ্পরেণু রায়’ আলোচ্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করে লিখেছেন—

“শুনেছি ছেলেবেলায় মার খেলাধুলা ছিল অভিনব প্রকৃতির। খেলাঘরে খেলনাবাটি সাজিয়ে খেলা এসবে মন ছিল না। ছেলেদের মতো ঘুড়ি, লাটাই, লাটু, ডাংগুলি ইত্যাদি খেলা পছন্দের খেলা ছিল। আর ছোট ছোট কাগজের টুকরো, মোটা পিজবোর্ড, হাতুড়ি, রাংতা জোগার করে নিয়ে দিব্যি খেলনার বাড়ি গাড়ি তৈরি করে ফেলতেন। এই সব খেলায় উৎসাহ ছিল খুব।”^(৭)

যাঁর পড়াশুনা ও খেলাধুলায় এত অভিনবত্ব, তিনি যে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা, সেকথা তাঁর বাবা মা’ও বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই লেখিকাকে তাঁরা সমস্তরকম কাজে প্রশ্রয় দিয়েছেন। যতদিন ‘হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত’ একান্নবর্তী পরিবারের সঙ্গে উত্তর কোলকাতার ‘বৃন্দাবন বসু লেনে’র ভাড়াবাড়িতে ছিলেন, ছেলে-মেয়েদের প্রতি নজর দেওয়ার অবকাশ পেতেন কম। কিন্তু যখন স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে আলাদা ভাবে বসবাস শুরু করলেন ‘আপার সারকুলার রোডের ১৬৬ নম্বর বাড়ি’তে তখন সন্তানদের প্রতি তিনি যত্নবান হয়েছিলেন। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ নতুন বাড়িতে এসে অনেক কিছু শিখেছিলেন এইকথা নিজেও স্বীকার করেছেন—

“আপার সারকুলার রোডের সেই বাড়িটাকে দেখা মাত্রই আমি, আমার ছোট বোন আর দিদি একযোগে প্রেমে পড়ে গেলাম! আমরা তিন বোন ছিলাম যেন একটা ট্রিলজি’র অখণ্ড সংস্করণ। এক মলাটে তিনখানি গ্রন্থ”।^(৮)

পূর্বে যৌথ একান্নবর্তী পরিবারে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ পাঁচ-ছয় বছর একত্রে বসবাস করেছিলেন। কিন্তু তবু ‘বৃন্দাবন বসু লেনে’র বাড়িটাই তাঁর কাছে বেশী প্রিয় ছিল। কারণ সেই বাড়িতে ছিল সবার প্রাণ সঞ্চরকারী গৃহকর্তী ‘নিস্তারিণী দেবী’। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ পরবর্তী জীবনে ঠাকুরমা ‘নিস্তারিণী দেবীর’ কথা বহুবার বহুভাবে বলেছেন। ঠাকুরমা সম্বন্ধে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি হল —“দেহ ও মনে অসম্ভব শক্তিমতী এই মহিলা মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে বিধবা

হন পাঁচ ছেলে আট মেয়ে নিয়ে (যাদের মধ্যে একটি তখনো জননী জঁঠরে) তদবধিই ছাঁটা চুল, পরনে থান, নির্জলা একাদশী, নিত্য গঙ্গা স্নান এবং আশি বছর ব্যাপী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গঙ্গাজল পান”।^(৯)

‘নিস্তারিণী দেবীর’ নিজের জীবনযাপনে যেমন নিয়মের কোন ঢগটি হত না; পরিবারের অন্য কারো ক্ষেত্রেও নিয়মভঙ্গ করা তিনি মেনে নিতে পারতেন না। তিনি পুরোনো দিনের ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী বলে বাড়ির মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বারণ করেছিলেন, সেই বারণ তাঁর জীবিত থাকা পর্যন্ত কেউ অমান্য করতে সাহস পায়নি। দুই প্রজন্ম ধরে সবাই তার সেই নিষেধ বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। আর সেই কারণেই ‘আশাপূর্ণা দেবী’র বাড়ির বাইরে স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ হয়নি। প্রথম জীবনের শুরুতে পারিবারিক রক্ষণশীলতার ঘেরাটোপে প্রতিটিদিন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দিদি সকলে যখন ‘আপার সারকুলার রোডে’র ছোট ভাড়া বাড়িতে চলে আসে, তখন থেকেই তাঁর জীবনের গতিপথ পাল্টে যায়। তিনি সমস্তরকম কাজের ক্ষেত্রে ‘না’ আর ‘নিষেধের বন্ধন’ থেকে মুক্তি পেয়ে চারপাশের জগৎকে অনুভব করেছিলেন। কিন্তু আগে যৌথ পরিবারে থেকেও তাঁর খেলার সাথী কেউ ছিল না, কারণ তাঁর খেলা ছিল এত কঠিন খাটুনির যে, কেউ তাঁর সঙ্গে খেলতে সহজে রাজি হত না। সেই যৌথ একান্নবর্তী পরিবারের বর্ণনায় তিনি প্রায় একটি সৈন্যদলের মতো বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ঠাকুরমার পাঁচ-সাতটি সেনাবাহিনী ছিল নাতি-নাতনীদেব নিয়ে। এছাড়া আটজন মেয়েদের মধ্যে কেউ না কেউ পাশে থাকতো সবসময়, আবার তাঁদের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মস্ত একটা ‘ভূতো সম্রাজ্যের’ মধ্যে বসবাস ছিল। ছোটবেলায় তাঁর দস্যিপণাকে বাগে আনতে মা ‘সরলাসুন্দরী দেবী’ তাঁর হাতে বই ধরিয়ে দিতেন। আর বই পাগল ঔপন্যাসিক নিরিবিলা ঘরেরকোণে পড়ে থাকতেন, আর কেউ আঁচ করতে পারতো না দস্যি মেয়েটি কোথায় আছেন। আসলে নিজেকে

সবসময় কোন একটা কাজে ব্যস্ত না রাখলে তাঁর ভালোলাগতো না। আর জীবনের উপান্তে এসে একটি সাক্ষাৎকারে আলোচ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন— “আমি যত না লেখিকা তার চেয়ে বড় পাঠিকা”।^(১০) তিনি যে প্রচুর পরিমাণে বই পড়তেন, তা যেকোনো পাঠক খুব সহজে অনুভব করতে পারবেন তাঁর লেখা পাঠ করে। সমকালীন সমাজের রীতি-নীতির কারণে তাঁর স্কুলে যাওয়া হয়নি ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজেই কখনো পড়াশুনায় ফাঁকি দেননি। তিনি দীর্ঘদিন উত্তর কোলকাতায় ছিলেন। তাঁর চোখের সামনেই একটা পাড়া-গাঁ কিভাবে ব্যস্ত নগরীতে পরিণত হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে, তার বর্ণনায় তিনি জানিয়েছেন—

“আমার ছোটবেলার কলকাতা ছিল সোনার কলকাতা।

উত্তর কলকাতার অনেক অঞ্চলই ছিল বলতে গেলে পাড়া-গাঁ। এখানে ওখানে ডোবা, পুকুর, কচুবন। সন্ধ্যা থেকেই শেয়ালের ক্যা-ছ্যা-ক্যা-ছ্যা। সকালবেলা দেখতাম আকাশে ট্যাঁ ট্যাঁ করে চক্কর খাচ্ছে শঙ্খচিল। এত বিজলি বাতি, গাড়ি-ঘোড়া তখন ছিল নাকি! রেডিয়ো টিভি ভিডিও তো দূরের কথা, সিনেমা টিনেমা ছিল না, থাকার মধ্যে থিয়েটার। স্টার, মিনার্ভা এইসব”।^(১১)

কলকাতায় তখন যাকিছু ছিল এবং যাকিছু ঘটত তিনি প্রায় সবটাই খবর রাখতেন। একদিকে যেমন খবর রাখতেন কোন পত্রিকায় কি প্রকাশিত হচ্ছে। অন্যদিকে সমাজ-সংস্কৃতির কোথায় কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটছে কিনা সেই খবরও রাখতেন। এরমধ্যে তাঁদের নিজেদের বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছিল ‘আপার সারকুলার রোডে’ই। ‘১৫৭/১ নম্বর বাড়িটা’তে তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন। এই নতুন বাড়িতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর দিদি ‘রত্নমালা দেবীর’ বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তিনজন বোনের একসঙ্গী চলে গেলে তিনি ও তাঁর বোন একটা শূন্যতার মধ্যে পড়ে যান। সেইসময় ক্রমেই বাড়িতে থাকে তাঁদের কবিতা চর্চা ও মুখস্থ বলার প্রতিযোগিতা। আর এই সাহিত্য চর্চার পরিবেশেই একদিন

সঙ্গীহারা দু'বোন নিজেরাই হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'কে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেয়। যদিও চিঠির বিষয় ছিল খুব সামান্য, তবু সেই সময় 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'কে চিঠি লেখা, সেকথা ভাবার স্পর্ধা সেকালের অনেকেরই ছিল না। কিন্তু তিনি ও 'সম্পূর্ণা দেবী' সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'কে একটি চিঠি লেখার সাহস করেছিলেন। সেই যুগের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই প্রচুর সাহস ও উদ্যমের প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয়। এই চিঠি লেখা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই 'আমার ছেলেবেলা' প্রবন্ধে জানিয়েছেন—

“নতুন বাড়িতে আসার পরই দিদির বিয়ে হয়ে গেল, চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ি। মন সর্বদাই খাঁ খাঁ। এই খাঁ খাঁ করা মনে হঠাৎ একদিন করে বসলাম একটা অসম সাহসিক কাণ্ড। বাড়ির কাউকে না জানিয়ে 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'-এর নামে একটি চিঠি লিখে প্রেরণ করে ফেললাম। দুই বোনের যুগল স্বাক্ষরে। বিষয়বস্তু? কিছুই না, শুধু একটি আবেদন। 'নিজের হাতে আমাদের নাম লিখে একটি উত্তর দেবেন'। বহু কষ্টে খাম, চিঠির কাগজ এবং ঠিকানা জোগার করে পাঠিয়ে দিলাম সে চিঠি! ব্যাস, তারপরই শুরু হল বুক ধড়ফড়, ভয়”।^(১২)

অবশ্য বেশীদিন এরকম অবস্থায় কাটাতে হয়নি। চিঠি লেখার পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' স্বহস্তে লেখা প্রতি-উত্তরের চিঠি তাঁরা পেয়ে যায়। তাতে লেখা ছিল “আশাপূর্ণা তুমি সম্পূর্ণা”^(১৩)। আর তার পরেই পরিবর্তন ঘটে যায় 'আশাপূর্ণা দেবীর' জীবনে। তিনি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' লেখা চিঠিতে যে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, তাকেই কার্যে রূপ দিতে হঠাৎ একদিন 'শিশুসাথী' পত্রিকায় একটি কবিতা লিখে পাঠিয়ে দেন। কবিতাটির নাম ছিল 'বাইরের ডাক'। ১৩২৯ সালের চৈত্র সংখ্যায় 'শিশুসাথী' পত্রিকা আয়োজিত সেই কবিতা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন। পত্রিকার

সম্পাদক ‘রাজকুমার চক্রবর্তী’ পরবর্তীকালে তাঁকে গল্প লিখে পাঠাবার অনুরোধ জানান। অর্থাৎ একথা আমরা বলতে পারি ‘শিশুসাহিত্য’ পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই তিনি সাহিত্য জগতে সমুখপানে চলার প্রেরণা লাভ করেন। আর ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের’ প্রেরণ করা চিঠি ছিল সাহিত্য জগতে পদার্পণ করার ছাড়পত্র।

‘আশাপূর্ণা দেবী’ স্বীকার করেছেন সাহিত্য জগতে তাঁর প্রতিভার বিস্তারে সহযোগিতা করেছিল সেযুগের পত্রিকা সম্পাদকেরা। তাঁদের ঋণ তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। অবশ্য প্রথমজীবনে সেই কবিতা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রাপ্তির কথা পরবর্তী জীবনে তিনি বহুবার উল্লেখ করেছেন –

“আমার সাহিত্য জীবনের মূলে কিন্তু সেযুগের সম্পাদকেরা। তাঁরা যদি আমাকে লেখা পাঠাতে না বলতেন, তা হলে আর লেখা পাঠাতাম না, আমার সাহিত্য জীবনের ওখানেই ইতি হয়ে যেত”।^(১৪)

ওখানেই বলতে লেখিকার প্রথম কবিতা ‘বাইরের ডাক’ লেখার কথা বলেছেন। ঐ কবিতা লেখার জন্যই ছোটগল্প লেখার অনুরোধ আসে, আর তারপর—“পীচঢালা রাস্তায় গড়গড়িয়ে গাড়ি চালিয়ে যাই। প্রথম গল্প লেখার পরে আবার চিঠি এসে যায়, আবার লিখি। ...অন্য শিশু পত্রিকা থেকেও চিঠি এসে পড়ে। মৌচাক, রংমশাল, খোকা-খুকু ইত্যাদি”।^(১৫)

পত্রিকার সম্পাদকদের ঋণ তিনি জীবনে বহুবার বহুভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতা যথাযথ ভাবে না পেলে তাঁর কোনদিন আর লেখিকা হওয়া হত না। অবশ্য কবিতা লেখা দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হলেও, শেষপর্যন্ত তিনি একটি কাব্যও প্রকাশ করেননি। তুলনায় ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় তিনি খুব বেশী সাবলীল ছিলেন।

‘শিশুসার্থী’ পত্রিকার পর ‘খোকাখুকু’ নামে আর একটি পত্রিকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে; আর সেখানেও তিনি প্রথমস্থান অধিকার করেছিলেন। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী পনেরোবছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলো। প্রথম স্থানাধিকারী হিসেবে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ নাম ঘোষণা হওয়ার পর পুরস্কার প্রদানে কয়েক মাস দেরি হয়ে যায়। ততদিনে তাঁর বয়স পনেরো বছর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এবং সেকথা তিনি ‘খোকা-খুকু’র সম্পাদক ‘নিশিকান্ত সেন’ মহাশয়কে চিঠি লিখে জানিয়ে দেন। সবাই ভেবেছিল এই পুরস্কার আর পাওয়া যাবে না, কিন্তু ‘নিশিকান্ত সেন’ মহাশয় পুরস্কার তো পাঠান, উপরন্তু তাঁর চিঠি লিখে সত্যকথা জানানোর জন্য আরোও একটি বাড়তি পুরস্কার পাঠিয়ে দেন। এভাবে সমকালীন সম্পাদকদের আশীর্বাদ ও আগ্রহে তাঁর একজন যথার্থ সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পথ অনেকটাই মসৃণ হয়। এরপর কয়েক মাসের মধ্যে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ বিয়ে ঠিক হয় কৃষ্ণনগরের মাঝের পাড়া নিবাসী ‘নরেন্দ্র নাথ গুপ্ত’ ও ‘সরোজিনী দেবীর’ জ্যেষ্ঠ পুত্র বাইশ বছর বয়সী ‘কালিদাস গুপ্তের’ সঙ্গে। শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার প্রসঙ্গে লেখিকা খুব সুন্দর করে জানিয়েছেন—

“পুরস্কারলব্ধ অনেকগুলো ভালো ভালো বই, যার মধ্যে ছিল ‘রাজকাহিনী’ ‘ক্ষীরের পুতুল’ ‘নালক’ ‘নীল পাখি’ ‘টমকাকার কুটির’ ‘শিশু ভোলানাথ’ ইত্যাদি নতুন টাক্কে পুরে নিয়ে এক গলা ঘোমটা টেনে শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের ট্রেনে চেপে গুটি গুটি শ্বশুর বাড়ি যাত্রা! সেটা হচ্ছে বাংলা ১৩৩১ সাল। ব্যাস সেইখানেই ছেলেবেলার ইতি”।^(১৬)

এরপর শ্বশুর বাড়িতে নতুন করে জীবন শুরু করলেন ‘আশাপূর্ণা দেবী’। তাঁর স্বামী চাকরি করতেন কোলকাতায় ‘মারকেনটাইল ব্যাঙ্কে’। প্রতি সপ্তাহে একবার কৃষ্ণনগর যাতায়াত করতেন। স্বামীর পরিশ্রম লাঘব করার জন্য ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে (আনুমানিক) ‘ভবানীপুরের রমেশ মিশ্র রোডে’ বাড়িভাড়া করে তাঁরা

সপরিবারে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি লেখালিখির পুরোনো জগতে প্রবেশ করলেন। দুই বছরের মতো সময় জুড়ে তাঁর লেখায় একটু ভাটা পড়েছিল; আবার সেই সৃজনের কাজ মসৃণ রাস্তায় চলতে থাকল। শ্বশুর বাড়ির প্রত্যেকে মা, বাবা ও দুই দেবর কেউ তাঁর লেখার বিষয়ে বিরূপ কোনো মন্তব্য করেননি, বরং খুশি হয়েছেন। এই ব্যাপারে তিনি জানিয়েছেন—

“আমার শ্বশুর বাড়িতে আমার লেখার ব্যাপারে কোনো বাধাই আসেনি। বরং আমি লিখি শুনে সবাই খুশি ছিলেন। তাছাড়া আমার বাপের বাড়ির পরিবার ছিল বড়, বরং সময় ছিল কম। শ্বশুর বাড়ির পরিজন ছিল ছোট, লেখার ব্যাপারে তাই অসুবিধে হয়নি”।^(১৭)

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে সতেরো বছর বয়সে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ প্রথম সন্তানের জননী হয়েছিলেন। ১৯২৬-১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি ‘পুষ্পরেণু’, ‘প্রশান্ত’ ও ‘সুশান্ত’ নামে তিন সন্তানের জননী হয়েছিলেন। সংসার ও সন্তানদের সমস্তরকম কাজ-কর্ম সামলানোর পরেও তিনি সাহিত্য রচনার জন্য সময় বের করে নিতেন। যদিও সন্তানদের প্রতি তাঁর দায়-দায়িত্ব অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছিল, তবু কোথাও কোনরকম কাজে খামতি পড়েনি। বেশীরভাগ সময়টা তাঁর নিজের শিশুকন্যাদের নিয়ে থাকতে হত বলেই হয়তো ১৯২২-৩৬ সাল পর্যন্ত ছোটদেরকে নিয়েই ছোটগল্প লিখেছেন। তিনি ছোটদের মনস্তত্ত্ব খুব ভাল করে বুঝতে পারতেন বলেই হয়তো দীর্ঘদিন শুধু ছোটদের জন্যই ছোটগল্প লিখেছেন। প্রথম ছোটগল্প সংকলন গ্রন্থের নাম ‘ছোটঠাকুরদার কাশীয়াত্রা’; ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ছোটগল্প সংকলনটি প্রকাশিত হয়। এরই মধ্যে তাঁর সন্তানরা বড় হয়ে উঠতে থাকলে, বড়দের জন্যও তিনি লিখতে শুরু করেন। তাঁর বয়স যখন আঠাশ বছর (১৯৩৬) সেসময় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় বড়দের জন্য প্রথম ছোটগল্প ‘পত্নী ও প্রেয়সী’ প্রকাশিত হয়। তাঁর বড়দের জন্য ছোটগল্প লেখা কিছুটা দেরি হওয়ার কারণ হিসাবে তিনি তৎকালীন সামাজিক

অবরোধজনিত সংকোচের কথা বলেছেন। তিনি আলোচ্য প্রসঙ্গে লিখেছেন —

“তখন মনে হত—বড়দের জন্য লেখা মানেই তো প্রেম-দ্রোম অর্থাৎ নর-নারী
ঘটিত ব্যাপার? তার মানেই তো —আবেগ অস্থিরতা রোমান্টিক সিন-ফিন এসে
যাওয়া? সেই বস্তু গুরুজনদের চোখে পড়বে, না বাবা কাজ নেই”।^(১৮)

অবশ্য তিনি জীবনের প্রারম্ভে একবার লেখা শুরু করে আর মাঝপথে এসে
কোনদিন তা বন্ধ করে দেননি। তিনি দীর্ঘ ১২-১৪ বছর শিশু সাহিত্য রচনা
করে যখন বয়স্কপাঠ্য ছোটগল্প রচনায় হাত দিলেন, তারপর শুধুই এগিয়ে
যাওয়ার পালা। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ‘জল আর আগুন’ নামে প্রথম বয়স্কপাঠ্য
ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয় ‘দাশগুপ্ত এণ্ড কোং’ প্রকাশক সংস্থা থেকে।
একদিকে যখন তাঁর নতুন সংসার ভরে উঠেছে অন্যদিকে লেখার জগতে
নতুনত্বের আহ্বান। অনবরত তিনি লিখে যাচ্ছেন এরকম সময় তাঁর মা
‘সরলাসুন্দরী দেবী’ পরলোক গমন করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৫
খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সারা দেশে যখন দেশভাগ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, অনাহারে মানুষের
জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে, তখন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও পারিবারিক
বিপর্যয় নেমে আসে। যদিও ছোটবেলায় তিনি ‘প্রথম বিশ্বযুদ্ধের’ ভয়াবহতা
হয়তো কিছুটা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ার দরুণ
বহির্জগতের ওঠা-নামা স্পষ্ট করে ঠিক ততটা বুঝে উঠতে পারেননি বলে মনে
করা যেতে পারে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে কন্যা পুষ্পরেণু দেবীর বিবাহ দেন বাঁকুড়ার
রায় পরিবারের ‘অতুল কৃষ্ণ রায়ের’ সঙ্গে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস
‘প্রেম ও প্রয়োজন’ প্রকাশিত হয় ‘কমলা পাবলিশিং’ থেকে। তাঁর কথায়—

“প্রথম উপন্যাস? সেটা আর এক কাহিনী। যার অন্তরালে ছিল প্রয়াত
প্রীতিভাজন বন্ধু বিশু মুখোপাধ্যায়ের ষোলআনায় অবদান। তিনি প্রায় জোর
করেই আমাকে দিয়ে একখানা উপন্যাস লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে ছিলেন”।^(১৯)

তারপর থেকে তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাস সমান তালে লিখতে থাকেন,

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ‘কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়’ থেকে ‘লীলা পুরস্কার’ লাভ করেন। এরই মধ্যে যেসব উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প প্রকাশিত হয় সেগুলি হল — ‘জল আর আগুন’, ‘মেকী টাকা’, ‘বিস্ফোরণ’, ‘রঙিন মলাট’, ‘শকুন্তলার পরাজয়’, ‘বীরাঙ্গনা’, ‘সিঁধকাঠি’, ‘কঙ্কাবতীর ইতিকথা’, ‘মায়া কাজল’, ‘তাজমহল’, ‘মাপকাঠি’, ‘ছিষ্টিছাড়া’, ‘হোমশিখা’, ‘বহুরূপী’, ‘ছেঁড়াতার’, ‘বাজে খরচ’, ‘চেঞ্জ’, ‘বন্দিনী’, ‘কালের হাওয়া’, ‘পদাতিক’, ‘স্বাধীনতার সুখ’, ‘নীলকন্ঠ’, ‘অভিনেত্রী’, ‘স্বর্গাদপি’, ‘শোলা ফুল’, ‘পত্রাবরণ’, ‘স্বীকারোক্তি’, ‘নিখাদ’ ইত্যাদি ছোটগল্প। প্রথমদিকে তিনি ছোটগল্প বেশী লিখেছেন, উপন্যাস লেখা শুরু করেন পরবর্তী সময়ে এবং ‘লীলা পুরস্কার’ প্রাপ্তি পর্যন্ত তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা চার-পাঁচটি ছিল। এর পরবর্তী সময়ে অবশ্য তাঁর লেখার গতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, লেখার মানের গভীরতা ক্রমে গুলীজনমহলে সমালোচিত ও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য দীর্ঘদিন তাঁর লেখার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় থাকলেও ব্যক্তি ‘আশাপূর্ণা দেবী’কে তেমনভাবে কেউ জানতেন না। সকল পাঠকই ভেবেছিলেন নারীর ছদ্মনামে কোন পুরুষ ঔপন্যাসিক লিখছেন। তাছাড়া তাঁকে চিহ্নিত করবার তেমন কোন উপায় ছিল না। কারণ পত্রিকার দপ্তরে তাঁর বেশীরভাগ লেখা তিনি ডাকযোগে পাঠাতেন অথবা তাঁর স্বামী কিংবা দেবর পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তরে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। রক্ষণশীল সংস্কার সম্পন্ন বাড়ির বৌ হওয়ার কারণে তাঁকে দীর্ঘদিন অবরোধের মধ্যেই থাকতে হয়েছিল। একমাত্র লেখালেখির মধ্য দিয়েই বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। অবশ্য একটা সময় আসে যখন তাঁকে ঘোমটার আড়াল থেকে বাইরের জগতে বেরিয়ে আসতে হয়। কারণ পাঠকদের চাহিদা দিনের পর দিন ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। আর তাঁর লেখার গুণেই সাহিত্যিকের যথার্থ মর্যাদা গ্রহণ করার জন্য সাহিত্যের দরবারে সশরীরে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। দীর্ঘদিন অবরোধ বাসিনীর জীবন যাপন করার পর বাইরের জগতে

বেরিয়ে আসার প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানিয়েছেন—

“চল্লিশ বছর পর্যন্ত কেউ

জানতো না, আশাপূর্ণা দেবী আসলে কে? ওটা কোন পুরুষের ছদ্মনাম নয় তো? পরে যখন বাইরের জগতে বেরিয়ে পরে সকলের সঙ্গে দেখা-টেকা হয়েছে, অনেকে বলেছেন, এই যেমন প্রেমেন দা (প্রেমেন্দ্র মিত্র), সজনী কান্ত দাশ — আমরা তো ভাবতাম ওটা বোধহয় একটা ছদ্মনাম, আসলে পুরুষের লেখা^(২০)।

পাঠকদের ভুল ভাঙাতে লেখিকা ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের প্রয়োজনে বাড়ির বাইরের জগতে পা রাখলেন। কবি ‘নরেন্দ্র দেবে’র অনুরোধে তিনি বাড়ির সিংহ-দুয়ারের বাইরে একজন লেখিকার পরিচয় নিয়ে সর্বপ্রথম বেরিয়ে আসেন ১৯৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ‘কথাশিল্প’ নামে একটি ছোটগল্প-সংকলনের জন্য আয়োজিত ছোটগল্প রচনার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী ‘নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়’কে শুভেচ্ছা দেওয়ার জন্য তিনি পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন। এরপর শ্রীরামপুরের ‘বনফুল’ নামক সাহিত্য-সংস্থা আয়োজিত সভায় প্রথম তিনি সভানেত্রী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এরপর আর কোনদিন তাঁকে অবরোধবাসিনী জীবনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ‘কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়’ তাঁকে “ভুবন মোহিনী স্বর্ণপদক” পুরস্কারে সম্মানিত করে। তিনি এইসময় তাঁর বিখ্যাত ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসটি রচনা করতে থাকেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ‘মিত্র ও ঘোষ প্রা: লি:’ থেকে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ঐ বছরেই তিনি ‘নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে’ যোগ দেওয়ার জন্য ‘কটক শহরে’ চলে যান, এবং বাংলাসাহিত্য শাখার অধিবেশনে সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন। সেইসময় থেকে ‘নরেন্দ্র দেব’, ‘রাধারাণী দেবী’, ‘তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়’, ‘সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়’, ‘বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়’, ‘বনফুল’, ‘সজনী কান্ত দাশ’, ‘পরিমল গোস্বামী’, ‘গজেন্দ্র কুমার মিত্র’, ‘সুমথ নাথ ঘোষ’, ‘মহাশ্বেতা

দেবী’, ‘নরেন্দ্র নাথ মিত্র’, ‘শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়’, ‘নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী’, ‘সবিতেন্দ্র নাথ রায়’ প্রমুখ বাংলাসাহিত্যের দিকপাল সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে উঠেছিল। এর পরবর্তী সময়ে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যার বিষয় ছিল সমকালীন ভারতবর্ষে চিনের আক্রমণ। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল —“চিনের আক্রমণের বিরুদ্ধে বাংলার সাহিত্যিক সমাজের রোষ ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ”^(২১)। পরের বছর ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার’ ‘আশাপূর্ণা দেবী’কে ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় উপন্যাসের দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘সুবর্ণলতা’র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সংসার ও সামাজিকতার চরম ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর লেখালেখির সঙ্গে তিনি কোনদিন আপোষ করেননি। তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্প ও উপন্যাসগুলি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল। তাঁর লেখা উপন্যাস হিন্দি ভাষায় সবচেয়ে বেশী অনুবাদিত হয়েছে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ‘অগ্নিপরীক্ষা’ নামক উপন্যাসটি প্রথম হিন্দিতে অনুবাদিত হয়। ১৯৬৪ থেকে ২০০০ পর্যন্ত তাঁর ১২০ টি উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। ‘হংস কুমার তেওয়ারী’ ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের প্রথম হিন্দি অনুবাদ করেন। অবশ্য এই অনুবাদের পরেই লেখিকা হিসেবে তাঁর পরিচিতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে শিলিগুড়ি শহরে আয়োজিত ‘বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন’এর অধিবেশনে তিনি কথাসাহিত্য শাখার সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই সভায় সভানেত্রীর ভাষণে তিনি বলেন—

“এমন কোনো জীবন থাকতে পারে না যার মধ্যে উপন্যাসের উপকরণ নেই। এমন কোনো ‘বিষয়’ নেই যা সাহিত্যের বিষয় বস্তু হতে পারে না। সাহিত্যিকের কাজ, শুধু সেটি হাতে তুলে নিয়ে সামান্যের মধ্য থেকে ‘অসামান্য’কে খুঁজে বার করা, সাধারণের মধ্য থেকে অসাধারণকে আবিষ্কার করা। ...কথাই তো ‘জীব’ জগত থেকে মানুষ জাতটাকে পৃথক করেছে, ...কথাই সভ্যতার বাহন,

সংস্কৃতির বাহন। ...কথাই ‘বাণী’ কথাই ‘ব্রহ্ম’ ...কথার মধ্য দিয়ে মানব মনের মুক্তি। সে মুক্তি স্রষ্টারও, ভোক্তারও”।^(২২)

এরকম যুক্তি নিয়ে তিনি পরবর্তীকালে ‘নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন’ জামশেদপুরেও সাহিত্য শাখার সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও অন্যান্য উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার পাশাপাশি তিনি ত্রয়ী উপন্যাসের শেষখণ্ড ‘বকুলকথা’ রচনা করেন; গ্রন্থটি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তারপরের বছরেই ‘কথাসাহিত্য’ পত্রিকা (মাসিক পত্র, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত) ‘আশাপূর্ণা দেবী সম্বর্ধনা সংখ্যা’ প্রকাশিত করে। সেই সংখ্যায় লেখিকা ‘আশাপূর্ণা দেবী’র প্রসঙ্গে অনেক গুণী লেখক তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করেন। প্রখ্যাত ভাষাচার্য ‘সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়’, ‘হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়’, ‘প্রমথ নাথ বিশী’, ‘রাধারাণী দেবী’, ‘লীলা মজুমদার’, ‘গজেন্দ্র কুমার মিত্র’ প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ ‘কথাসাহিত্যের’ সেই সংখ্যায় প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এরপর আসে তাঁর জীবনের সেই স্মরণীয় মুহূর্ত; তিনি সাহিত্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত হন। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বকালের মরমী কথাকার রূপে একই বছরে ‘জ্ঞানপীঠ’ ও ‘পদ্মশ্রী’ সম্মান পেলেন। আর কোনো কথাসাহিত্যিকের জীবনে এমন বিরলতম ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না। ঐবছরে ‘শিশু সাহিত্য পরিষদ’ থেকে তাঁকে ‘ভুবনেশ্বরী পদক’ দেওয়া হয়। অনেক সম্মান ও পুরস্কার তিনি পেয়েছেন যা অন্যকোন সাহিত্যিকের থেকে অনেক বেশী বলে মনে হয়। উক্ত সমস্ত পুরস্কার প্রাপ্তি ও জীবনের সমস্ত কর্মের যখন মূল্যায়নের সময় এলো, সেই বছর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জীবনের সমস্ত কর্ম-কাণ্ডের সঙ্গী ‘কালিদাস গুপ্ত’ দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর পরলোক গমন করেন। যার ফলে তিনি সেসময় সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে পড়েন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে দিল্লী যেতে হয়েছে ‘জ্ঞানপীঠ’ পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য। উল্লেখ্য ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ‘জ্ঞানপীঠ’ পুরস্কারে ভূষিতা

হয়েছিলেন। তাঁর স্বামীর প্রয়াণ অন্তরে গভীরতম বেদনার সৃষ্টি করেছিল বলেই তিনি পুরস্কার গ্রহণ করতে যেতে পারেননি। ‘মহাশ্বেতা দেবী’ উক্ত প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

“বয়সে বৈধব্য অনেকেরই আসে। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থেই, জীবন সঙ্গী চলে যাওয়া মানে তাঁকে একলা করে রেখে যাওয়া। তখন থেকেই কি বাঁচার ইচ্ছে অবচেতনে তুলে নিয়েছিলেন?”^(২৩)

কিন্তু তবু তাঁর চিরকালের সঙ্গী ‘কলম’টিকে কোনমতেই তুলে রাখতে পারলেন না, যাকে দিয়ে তাঁর এতদিনের সৃষ্টির পথ চলা। তিনি এরপরেও একটির পরে আরো একটি করে সৃষ্টি করেছেন নতুন থেকে নতুনতর শিল্পকর্ম। যদিও তাঁর স্বামীর পরলোক গমনের কারণে যদিও একটি বিস্তৃত অধ্যায় জুড়ে সাহিত্য রচনায় ছেদ পড়েছিল।

জীবনে সায়াহু পর্বে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ অনেক সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ‘জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়’ থেকে সম্মান সূচক ‘ডক্টরেট উপাধি’ লাভ করেন। তাছাড়াও তিনি একাধারে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ থেকে ‘হরনাথ ঘোষ পদক’, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ‘রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়’ থেকে সম্মান সূচক ‘ডক্টরেট উপাধি’, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ‘বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়’ থেকে ‘ডক্টরেট উপাধি’, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ‘বিশ্বভারতী’ থেকে ‘দেশিকোত্তম উপাধি’, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়’ তাঁকে সম্মান সূচক ‘ডক্টরেট উপাধি’, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ‘কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়’ থেকে ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ‘সাহিত্য আকাদেমি’র ‘ফেলো’ নির্বাচিত হন। এত সম্মান ও পুরস্কার তাঁর সমকালীন ও পরবর্তীকালে খুব কম কথাসাহিত্যিকরা পেয়েছেন বলে মনে হয়।

তিনি যেমন তাঁর লেখার গুণে অনন্য, তেমনি সম্মান ও পুরস্কার প্রাপ্তির দিক থেকেও ব্যতিক্রমী। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ ও ‘শরৎ পুরস্কার’ একাধারে দুটি সম্মানেই সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি অর্ধেক জীবন বাড়ির অন্তঃপুরে, আর বাকি অর্ধেক জীবন সমৃদ্ধ সমাজের রূপে কাটিয়েছেন। কিন্তু যখন তাঁর অন্তঃপুরের পর্দা উঠল, ততদিনে পৃথিবীর মানুষ নতুন যুগ তৈরি করেছে। এতদিনের তাঁর দেখা রূপের মানুষের সঙ্গে এই যুগের কোনো মিল নেই। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতি তিনি তেমন গভীরভাবে উপলব্ধি করেননি বলে মনে হয়। আর তাই হয়তো তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি। আসলে রাজনীতির প্রতি তাঁর কোনদিনই তেমন আগ্রহ ছিল না। তাঁর নিজের কথায়—

“রাজনীতি সম্পর্কে আমার বরাবরই অনীহা।...বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদের কাঠামোর ওপর রচিত কোনো সাহিত্য আমায় কখনোই আকর্ষণ করে না। তা সে তৎকালীন জন-জীবনকে প্রবল ভাবে আলোড়িত করলেও। ...যে সত্য কেবলমাত্র তৎকালীন, ‘চিরকালীন’ নয়, সেটা আমায় কখনোই আশ্রয় করে না”।^(২৪) অবশ্য একথাও বলতে হবে তিনি নিজেও কখনো রাজনীতি করেননি, কোনো বিশেষ মতাদর্শে চিরকাল নিজের বিশ্বাস অটুট রাখেননি। কারণ তিনি মানতেন যে, মানুষ নিজেই অলসতা ত্যাগ করে যেদিন জেগে উঠবে সেদিনই হবে মানুষের প্রকৃত জয়। এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি শুধু লেখালেখির জগতে ব্যস্ত ছিলেন, নতুন নতুন বহুচরিত্র তৈরি করেছেন, কেবলমাত্র অর্ধমৃত মানুষের আঁতে ঘা দিয়ে জাগিয়ে তোলার জন্য। তিনি বাইরের জগতের টানা-পোড়েন নিয়ে বিশেষভাবে কোন কথা বলেননি, লিখেছেন মানুষের জীবনের অন্তঃপুরের কথা। যে অন্তঃপুরে বাইরের সমাজের সমস্তরকম ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গে কল্লোলিত হয়ে ওঠে। আসলে তিনি সোজাসুজি বাইরের কথা না লিখলেও অন্তঃপুরের বর্ণনার মধ্য দিয়ে বহির্বিশ্বকে জানার চেষ্টা করেছেন, এবং

বাইরের জগত ও অন্তঃপুরের মিল দেখিয়ে আধুনিক জন-জীবনের প্রকৃত চিত্ররূপ অঙ্কনে সক্ষম হয়েছেন। তিনি কখনোই লেখেননি সমাজের বৃত্ত কিরকম, কিভাবে ও কেমন হওয়া উচিত? সমাজে যা কিছু ঘটে তাই তিনি সর্বদাই লিখেছেন তাঁর সাহিত্যের পাতায়। তিনি যেমন তাঁর শৈশবের ভারতবর্ষ কে দেখেছেন, তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তীকালের ভারতবর্ষকেও দেখেছেন, তাই দুই রকম অবস্থারই বর্ণনা তাঁর রচিত সাহিত্যে আছে। তিনি অবশ্য বলতেন—“আমি পুরনো নৈতিকতায় বিশ্বাসী”^(২৫), কিন্তু তাঁর আধুনিক কালের দ্বন্দ্ব সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা ছিল। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ‘নবনীতা দেবসেন’ আলোচ্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—
“আমি তো জানি, পিসিমা পশ্চিম সাহিত্য কিছুই পড়েননি। তাঁর ‘আধুনিকতা’ সবটাই নিজস্ব জীবন থেকে শেখা। তার এতটুকুও ধার করা নয়। তিনি সশিক্ষিত, আমাদের মতো ইংরেজী শিক্ষিত নন। আমার মা- মাসিরা সকলেই যেমন, তিনিও তেমনই। অথচ কী করে তিনি নাগাল পান আধুনিকতার মূল্যবোধের, সন্ধান পান মোক্ষম মৌল সব যন্ত্রনাগুলোর। কিভাবে তিনি ধরতে পারেন চলতি যুগের নাড়িটা চেপে! সার্থক বদ্যির মেয়ে”^(২৬)

উক্ত মন্তব্যের সমর্থনে আমরা খুব সহজে স্বীকার করে নিতে পারি, তিনি সত্যি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। আর তাই হয়তো অনেক প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিকদের রচনার পাশে আজও কালের নিয়মে তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাস শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠিত ও পর্যালোচিত হয়ে থাকে।

<<<<<>>>>>

তথ্যসূত্র

- ১) ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, ভূমিকাংশ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩.
- ২) আশাপূর্ণা দেবী, উপাষণা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯.
- ৩) আজকাল, কলকাতা সংখ্যা, ১৩৯৬ (আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে : সুব্রত সেনগুপ্ত), পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪.
- ৪) আনন্দমেলা, সম্পাদক- শ্যামল কান্তি দাস, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
- ৫) ‘আত্মবিকাশ’ সাহিত্য পত্রিকা, শতপুষ্পে বিকশিত আশাপূর্ণা, প্রথম বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা, জুন-আগষ্ট :২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪২.
- ৬) আজকাল, কলকাতা সংখ্যা, ১৩৯৬ (আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে : সুব্রত সেনগুপ্ত), পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪.
- ৭) পুষ্পরেণু রায়, আশাপূর্ণা মা, প্রকাশক : অভিনব প্রকাশন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: ২০০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯.
- ৮) আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ-১৪১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৮.
- ৯) আভা, শারদীয়া আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পাদক- সমীরণ রুদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৯০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭১.
- ১০) দেশ, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, (সাক্ষাৎকারে : চিত্রা দেব), পৃষ্ঠা সংখ্যা— ২৮.
- ১১) আনন্দমেলা, সম্পাদক- শ্যামল কান্তি দাস, ১৭ ই সেপ্টেম্বর : ১৯৮৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫২.
- ১২) আমার ছেলেবেলা, আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ-১৪১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা— ৪২.

১৩) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা— ৪২.

১৪) আশাপূর্ণা দেবী, উপাষণা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৪,
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬.

১৫) আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড,
তৃতীয় মুদ্রণ-১৪১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৩.

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা — ৪৪.

১৭) আশাপূর্ণা দেবী, উপাষণা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৪,
পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৮.

১৮) আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড,
তৃতীয় মুদ্রণ-১৪১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৫.

১৯) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা — ২৬.

২০) দেশ, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, (সাক্ষাৎকারে : চিত্রা দেব), পৃষ্ঠা সংখ্যা— ২৯.

২১) আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড,
তৃতীয় মুদ্রণ-১৪১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা — ৪৭.

২২) তদেব — ১৬১.

২৩) দেশ, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, (সাক্ষাৎকারে : চিত্রা দেব), পৃষ্ঠা সংখ্যা -১৬.

২৪) আশাপূর্ণা দেবী, উপাষণা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৪,
পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৭.

২৫) আমার ছেলেবেলা, আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ
প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ-১৪১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৭৪.

২৬) কথাসাহিত্য, ‘আমার প্রসিদ্ধা পিসিমা এবং বেচারী আমি’- নবনীতা দেবসেন,
কার্তিক ১৩৮১, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩১.

<<<<<>>>>>

দ্বিতীয় অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের রচনার ক্রমানুসারে পর্যায় বিভাগ

‘আশাপূর্ণা দেবীর’ সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম মাধ্যম কবিতা; কালক্রমে তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ছোটগল্প ও সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমের থেকে উপন্যাস রচনায় তিনি সবচেয়ে বেশী সাবলীল ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘প্রেম ও প্রয়োজন’ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে উপন্যাসিকদের মধ্যে নিজস্ব গুণে আলাদা স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। অবশ্য তিনি বলেছিলেন লেখালেখি শুরুতে সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষের উৎসাহ না পেলে হয়তো তাঁর লেখিকা হওয়া হত না। আবার তিনি একথাও বলেছেন— “একটা লেখা টেনে নিয়ে যায় আর একটা লেখার দিকে”^(১)। আর তাই লেখার তাগিদেই একসময় ছোটগল্প আর উপন্যাসের সংখ্যা সমকালের অনেক সাহিত্যিকদের লেখালেখির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায়। সারাজীবনে তিনি যেভাবে উপন্যাস লিখেছেন তা সংখ্যায় প্রচুর, অবশ্য বেশীরভাগ উপন্যাস রচনা করেছেন পত্রিকার সম্পাদকদের অনুরোধ রক্ষা করার জন্য। অবশ্য লেখাটাই ছিল তাঁর একমাত্র অন্যতম জীবনসঙ্গী। পরিবারের সমস্ত কাজ শেষ করে, সবার কাছে নিজেই জবাব দিয়ে রাতেরবেলা তিনি লিখতে বসতেন, গভীর রাত পর্যন্ত সেই লেখালেখির কাজ করে তারপর শুতে যেতেন। পরিবারের কেউ কোনদিন তাঁর লেখার জন্য কোনো অভিযোগ করতে পারেনি, কারণ তাঁর লেখার জন্য কোনদিন কোনো কাজে ফাঁকি পরে যায়নি।

‘আশাপূর্ণা দেবী’ সারাজীবনে যেসমস্ত উপন্যাস লিখেছেন সবগুলিকে একত্রে উল্লেখ করার সূত্রে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। পর্ব তিনটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘প্রভাত পর্ব’, ‘মধ্যাহ্ন পর্ব’ ও ‘সায়াহ্ন পর্ব’। প্রতিটি মানুষের জীবন যেমন করে কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য তিনটি পর্বে পরিসমাপ্তি লাভ করে; তেমনি যেকোন সৃষ্টিকর্তার রচিত সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে অন্তপর্ব পর্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে তিনটি পর্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাসের তিনটি পর্বের উল্লেখ করলে একদিকে যেমন রচনাকালের প্রেক্ষিতে বিভাজিত করা হয়, অন্যদিকে তেমনি বিষয়ের সমতা রক্ষা পাবে বলে মনে করা যেতে পারে। ‘প্রভাত পর্ব’ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রচিত উপন্যাসগুলিকে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসটি তাঁর জীবনে তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। তাই উক্ত উপন্যাসটির প্রকাশকাল পর্যন্ত সময়কালকে ‘প্রভাত পর্বের’ শেষ বলে ধরা হয়েছে। প্রভাতের সূর্য যেভাবে আলোক ও উষ্ণতায় ধীর গতিতে মধ্যাহ্নে প্রবেশ করে, ঠিক তেমনি ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাস রচনার ‘মধ্যাহ্ন পর্ব’ ধরা হয়েছে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসটির পরবর্তী সময়কাল থেকে। তিনি এইপর্বেই একাধিক পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁর বৈচিত্র্যময় উপন্যাস রচনা করার জন্য। মধ্যাহ্নে যেমন সৌরতাপ প্রখর হয় তেমনি যেন তাঁর ‘মধ্যাহ্ন পর্বের’ উপন্যাসগুলি বিষয় ও রচনাগুণে তুলনায় ‘প্রভাত পর্বের’ থেকে অনেক বেশী উৎকৃষ্ট বলে মনে হয়। সেইদিক থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিকে ‘প্রভাত পর্ব’ উল্লেখ করার চেষ্টা করা হল। এই সময়পর্বে যে উপন্যাসগুলি তিনি রচনা করে প্রকাশিত করেছেন সেগুলি যথাক্রমে ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হল:-

প্রভাত পর্ব

“প্রেম ও প্রয়োজন, কমলা পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৪৪
খ্রিস্টাব্দঅনির্বাণ, সঞ্চয়ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মিতির বাড়ি, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
বলয়গ্রাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
অগ্নিপরীক্ষা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
যোগ বিয়োগ, ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
নবজন্ম, ইন্সটলাইট বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
কল্যাণী, মহেন্দ্র পুস্তক ভবন, কলকাতা, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
নির্জন পৃথিবী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
শশীবাবুর সংসার, ইন্সটলাইট বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
উন্মোচন, সরস্বতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ
নেপথ্য নায়িকা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ
আংশিক, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ
অতিক্রান্ত, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ
জনম জনমকে সাথী, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ
কনকদীপ (কিশোর উপন্যাস), রাইটার্স সিডিকেট, কলকাতা, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
ছাড়পত্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
মেঘ-পাহাড়, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, কলকাতা, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ
উত্তরলিপি, কথাকলি প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ
মুখর রাত্রি, তুলি কলম, কলকাতা, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ
সমুদ্র নীল আকাশ নীল, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃলিঃ, কলকাতা, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ
প্রথম লগ্ন, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ
সোনার হরিণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ

তিনছন্দ, সুরভি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
দিনান্তের রঙ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
আর এক বাড়, অর্চনা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
নদী দিক হারা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
একটি সন্ধ্যা একটি সকাল, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
জহুরী, সাহিত্যায়ণ, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
জলছবি, এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
দোলনা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
উড়োপাখি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
বহিরঙ্গম, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
জীবন স্বাদ, গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
আবহ সঙ্গীত, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
এক সমুদ্র অনেক ঢেউ, সংযোগ, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
বেগবতী, মিত্রালয়, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
উত্তরণ, সুরভি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ
জনতার মুখ, ত্রিবেণী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ
লঘু ত্রিপদী, রূপা এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ
শুভ্র সাগর, কনটেমপোরারি পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ
প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ^২

মধ্যাহ্ন পর্ব

‘আশাপূর্ণা দেবী’ প্রথম পর্বে যেসমস্ত উপন্যাস লিখেছেন তার পেছনে কিছু সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী মানুষের অবদান। লেখিকা নিজেও বহুবার তা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি নিজের প্রথম উপন্যাস সম্পর্কে লিখেছেন—

“প্রথম উপন্যাস? সেটা আর এক কাহিনী! যার অন্তরালে ছিল প্রয়াত প্রীতিভাজন বন্ধু বিশু মুখোপাধ্যায়ের ষোল আনাই অবদান। তিনি প্রায় জোর করেই আমাকে দিয়ে একখানা উপন্যাস লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে ছিলেন। বলেছিলেন আমার অত ধৈর্য নেই, ছোটোগল্পটা বড় হয়ে গেলেই মনে হয় কতক্ষণে টেনে তুলব। ও হবে না। সেই শান্ত নিরাভিমानी মানুষটি বলেছিলেন, ‘আচ্ছা, আপনি ভাবুন অনেকগুলো ছোটোগল্পই লিখছেন। দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে’। কী হল তা জানি না, তবে হয়ে গিয়েছিল। আমার সেই প্রথম উপন্যাসের নাম ‘প্রেম ও প্রয়োজন’। প্রকাশক ‘কমলা পাবলিশিং’। সম্পাদক মহাশয়ের চাহিদা ছিল- একটি ‘প্রথম’-এর, পরপর তিন তিনটি ‘প্রথম’ সাপ্লাই করে বসলাম।”^(৩)

সূত্রের প্রেক্ষিতে বলা যে তিনি উপন্যাস লিখেছেন শুধুমাত্র সম্পাদকদের তাড়ায়, এবং শেষে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জীবনের অন্যতম কাজ। প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে তাঁর দেখা চারপাশের মানুষের কথাই বেশী করে তুলে ধরেছেন বলে মনে হয়। ‘প্রেম ও প্রয়োজন’ উপন্যাসটি তাঁর প্রথম লেখা। উপন্যাসটির মধ্যে তাঁর সমকালের সমাজ চিত্র ও নারী জীবনের এক নতুন রূপ ফুটে উঠেছে। ‘আশাপূর্ণা দেবী’কে আমরা সরাসরি নারীবাদী লেখিকা হিসেবে হয়তো চিহ্নিত করতে পারি না, তবু তিনি মরমী মানসিকতায় সেকালের নারীর অন্তঃবেদনাকে লেখার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন ‘স্তিমিত অন্তঃপুরের’ ভাঙা-গড়ার ইতিহাস নিয়ে ‘তুচ্ছ দৈনন্দিনের পৃষ্ঠপটে আঁকা এই ছবি’; এর মধ্য দিয়ে প্রবহমান কালের একটি অংশকে সার্থক ভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয়। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ নিজেকে অন্তঃপুরের লেখিকা বলেছেন বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। আমরা সেকথার প্রমাণ পাই উপন্যাস ও ছোটগল্পের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে। আর সংসারের অন্তঃপুরের কথা নারীর চেয়ে কে বেশী জানে? একজন নারী যেমন চুল বাঁধে তেমনি ভাতও রাঁধে, একথা আমরা

জানি। ‘আশাপূর্ণা দেবী’র প্রথম দিকের উপন্যাসে মূলত নারীর অন্তঃমননের কথাই বেশী করে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজের চারপাশে যা দেখেছেন সেই চিত্রই হুবহু তুলে আনার চেষ্টা করেছেন, সফলও হয়েছেন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে। সমালোচক ‘আমিনুল ইসলাম’ লেখিকার জীবনাভিজ্ঞতার প্রকাশ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন –

“অন্যান্য অনেক শিল্পীর মতো তাঁর রচনায় না আছে ভূগলের বিশাল ব্যাপ্তি, না আছে অচেনা মানব-সমাজের মর্ম-রহস্য উদঘাটনের ঐকান্তিক প্রয়াস। তিনি দেখতে চেয়েছেন, যা প্রতিনিয়ত আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা দিচ্ছে, যে-মানুষদের আমরা প্রত্যহ আমাদের চারপাশে দেখছি, যাদের সঙ্গে সর্বদা মেলামেশা করছি, কথা বলছি, ভাবের আদান-প্রদান করছি, তারা আমাদের কত অচেনা, হয়তো তাদের মনের খবর আমরা কিছুই জানি না বা রাখি না। যেটুকু আমরা জানি বলে গর্ব করি, সেটুকুও ঠিক নয়। উপন্যাসে ও ছোটগল্পে আশাপূর্ণা চিরকাল চেনা মানুষদের যেন নতুন করে খুঁজতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন তাদের হৃদয়-রহস্য। এজন্য তাঁকে কখনও চার দেওয়ালের বাইরে পা বাড়তে হয়নি, তিনি আজীবন চার দেওয়ালের চিত্রকর হয়েই বাংলা সাহিত্যের পাঠকের রসাস্বাদ মিটিয়েছেন”^(৪)।

আর তাই হয়তো ‘মিতির বাড়ি’, ‘বলয়গ্রাস’, ‘শশীবাবুর সংসার’, ‘উন্মোচন’, ‘জনম জনমকে সাথী’, ‘নেপথ্য নায়িকা’, ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ ইত্যাদি উপন্যাসে তাঁর সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। ‘মধ্যাহ্ন পর্বের’ উপন্যাসগুলিতে লেখিকার দৃঢ় অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে। তিনি প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে যে কথাগুলিকে ছেড়ে দিয়েছেন অথবা ঘুরিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন, ‘মধ্যাহ্ন পর্বের’ উপন্যাসগুলিতে স্পষ্ট করে নিজের বক্তব্যকে প্রকাশ করবার অবকাশ পেয়েছেন বেশী। তিনি ‘মধ্যাহ্ন পর্বে’ যেসমস্ত উপন্যাস লিখেছেন সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল:—

“বৃত্তপথ, আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
যুগে যুগে প্রেম, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
সুয়োরানীর সাধ, সুরভী প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
আকাশ মাটি, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
আলোর স্বাক্ষর, গুপ্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
মায়াজাল, ইন্ডিয়ান প্রোগেসিভ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
সুখের চাবি, শ্রী গোপাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
সুরভি স্বপ্ন, কলিকাতা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
রাতের পাখি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ
মায়াদর্পণ, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ
যুগলবন্দী, আভেনির পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ
শেষ রায়, সুরভী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ
নীল পর্দা, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ
দুইমেরু, গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ
সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
নীলাঞ্জনা, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
সমুদ্রকন্যা, শ্রী গোপাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
কাঁচ পুঁতি হীরে, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, কলকাতা, খ্রিস্টাব্দ
বালুচরী, সুরভী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
সেই রাত্রি সেই দিন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
অন্য মাটি অন্য রঙ, রূপা এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
অবগুণ্ঠিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
অন্তর বাহির, শৈব্যা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
যাহা চাই তাই, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ

দুই নায়িকা, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ
বিজয়ী বসন্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ
সময়ের স্তর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ
শুধু তারা দুজনে, রূপা এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ
গাছের পাতা নীল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
জালি কাটা রোদ, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
মনমর্মর, উজ্জ্বলসাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
দ্বিতীয় অধ্যায়, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
দর্শকের ভূমিকায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
নীল বন্দর, বিচিত্রা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
বিরহী বিহঙ্গ, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
কুমকুম, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ
মনের মুখ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ
একাল সেকাল অন্যকাল, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ
অনিন্দিতা, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
মধ্য সমুদ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
নিভৃত আকাশ, গোপা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
দূরের জানালা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
চাঁদের জানালা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
রাত্রির পরে, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
রেললাইন, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ
যা'র যা দাম, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ
বিনুকে সেই তারা, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
ডাকাতের কবলে আমি, সিটি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ

শিকল কাটা পাখি, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ
যবনিকা, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ
নক্সা কাটা ঘর, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ
তরঙ্গহীন, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ
ওরা বড় হয়ে গেল, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ
বকুলকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ
ভালোবাসার মুখ, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ
হারানো খাতা, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ
রাজকুমারের পোষাক, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ
যে যার দর্পণে, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ
কখনও দিন কখনও রাত, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ
হয়তো সবাই ঠিক, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ
হে ঈশ্বর তোমার যবনিকা, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ
পলাতক সৈনিক, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ
উত্তর পুরুষ, সন্ধ্যা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ
লোহার গারদের ছায়া, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ
বংশধর, সন্ধ্যা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ
সময় অসময়, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ
এই যুগ এই মন, বিশ্বাস পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ
চার দেওয়ালের বাইরে, অমরা সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
পাখির খাঁচা ও খাঁচার পাখি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
সোনার কৌটো, পাত্রজ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
শরণার্থী, পাত্রজ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
ত্রিনয়নী, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ

শূন্যতার বাসা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
দূরের বাঁশী, মনোহর সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
যুগান্তের যবনিকা পারে, বিমলারঞ্জন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
মুখের রাত্রি, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
তিন ছন্দ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
দিগন্তের রং, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
সুয়োরানির সাধ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
আবহসঙ্গীত, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
সমুদ্র কন্যা, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
তিন ছন্দ, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
অবিনশ্বর, অমরা সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
গজ উকিলের হত্যা রহস্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
সাপের ছোবল, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
বালির নীচে ঢেউ, তিন সঙ্গী, কলকাতা, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ
পুঁথির লেখা, সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ
সুখের নিলয়, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ
প্রতীক্ষার বাগান, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ
অহল্যা উদ্ধার, সপ্তর্ষী, কলকাতা, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ
সূর্যোদয়, তিন সঙ্গী, কলকাতা, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ
জবর দখল, ভবানী পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ
অফুরন্ত, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ
সন্ধিক্ষণ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ
তুলির টানে আঁকা, কসমা প্রিন্ট, কলকাতা, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ
জরিপ, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ

ছুটিতে ছোট ছুটি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ
ঘর একই ছাঁদের নিচে, এ. কে. পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ
মায়াজাল, কামিনী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ
সূর্যাস্তের রঙ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
সূর্যাস্তের পরে, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
অস্তিত্ব, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
অচল পয়সা, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
নীটফল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
কত কাণ্ড রেল গাড়িতে, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
নির্ণয়, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ”^(৫)

সায়াহ পর্ব

জীবনের শেষদিকে এসে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র সাহিত্য রচনায় দায়িত্ব যেন আরও বেড়ে যায়। তিনি পূর্বের ন্যায় রচনায় আত্ম-নিয়োজিত থাকলেন এবং শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে বেশী করে নিজের অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন বলে মনে করা হয়। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা তুলনায় সমকালীন ঔপন্যাসিকদের থেকে অনেক বেশী। তিনি প্রচুর পরিমাণে সাহিত্যে রচনার পক্ষপাতী। তিনি চিত্রা দেবকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

“সবেই যদি অনুশীলনের উৎকর্ষে আসে, লেখাতেই বা সেটা হবে না কেন? ক্ষুরকে যদি শান দিতে হয়, কলমকেই বা নয় কেন? কুড়িটা লিখলে একটা ভালো হতে পারে। মাত্র একটা লিখলে সেটা ভাল নাও হতে পারে। তাহলে? লাভের ঘরে শূন্য। পৃথিবীর মাটিতে নানারকম গাছ। গোলাপ, ঘেঁটু সবই আছে। শুধু গোলাপ চাষ করলেই হবে? না হয় কিছু

আগাছাও জন্মালো। তাতে মাটি শক্ত হয়”।^(৬)

তাঁর মত অনুযায়ী আমরা সহজেই বলতে পারি, তিনি যেমন উল্লেখযোগ্য কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন তেমনি কিছু সাধারণ ধর্মী উপন্যাসও রচনা করেছেন, তাতে কোন দ্বিমত নেই। তাঁর তৃতীয় পর্যায় তথা সায়াহু পর্বের উপন্যাসগুলি হল:—

“নীটফল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
নির্ণয়, শশধর প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
উৎসমূল, তথ্য কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
অমরলতা, তথ্য কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
অচল পয়সা, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
শেষ রায়, আদিত্য প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
ওরা ভাঙে না, আদিত্য প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
উজ্জ্বল উন্মোচন, সাহিত্যম, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
রমণীর মন, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
নিজস্ব রমণী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
মান সম্ভ্রম, সাহিত্য বিহার, কলকাতা, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
নিলয় নিবাস, নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলকাতা, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
সেকেন্ড হ্যান্ড, দরবারী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
সাদায় কালোয় নক্সা, অমৃতধারা, কলকাতা, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
ইঠাৎ একদিন, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
মেকআপ, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
উত্তর পুরুষ, কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
বেগবতি, কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ

নায়ক নায়িকা তিন, কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
অবৈধ, কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
পরমেশ্বরী, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
দেবতার মুক্তি, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
যা'র বদলে যা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
চিত্রকল্প, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
অনিন্দিতা, সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
নিভৃত আকাশ, সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
বিরহী বিহঙ্গ, সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
মাকড়সা, সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
এখানে ওখানে সেখানে, প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ
সৃষ্টিছাড়া, প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ
লীলা চিরন্তন, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
অবগুপ্তিতা, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
সোনার কৌটো, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
স্বর্গকেনা, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
ভালোবাসার মুখ, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
হয়তো সবাই ঠিক, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
মনমর্মর, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
নিমিত্ত মাত্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
ষড়যন্ত্রের নায়ক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
মজার মামা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
কখনও কাছে কখনও দূরে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
যুগলরত্ন টিকটিকি অফিস, ভাস্কর, কলকাতা, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
চাবিবন্ধ সিন্দুক, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
নষ্টকোষ্ঠী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ
ব্যাপারটা কি হলো, কল্লোল, কলকাতা, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ
রানী মায়াবতীর অন্তর্ধান রহস্য, ভক্তক, কলকাতা, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ
ছোট সে তরী, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ
দিব্যহাসিনীর দিনলিপি, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
শূন্য সেতু, ভক্তক, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
অমরাবতীর অন্তরালে, ভক্তক, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
ভি. আই. পি. বাড়ির লোক, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
ভুল ট্রেনে উঠে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
তনুশ্রীর জগৎ, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
একটি মিথ্যাভাষী নায়ক, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
ত্রৈাশিক, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
যাচাই, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
দ্বিতীয় বসন্ত, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
চশমা পাল্টে যায়, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
অনমনীয়া, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
আদিত্যের ইচ্ছাপত্র রহস্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
অভয় নন্দন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
শাঁখ কাটা করাত, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
নীল চশমা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
কাঁটা পুকুর লেনের কমলা, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
অদ্বিতীয়, সাহিত্যম, কলকাতা, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্বাস অবিশ্বাস, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ

স্মৃতি সত্তা জীবন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ”^(৭)

যাঁর উপন্যাসের পরিমান এত বেশী তাঁর দিকে অবশ্যই মাথা উঁচু করে তাকাতে হয়। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর মনোভাবকে অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাতে হয়, যখন তিনি সবিনয়ের লিখেছেন –“কতটুকু কাজ করতে পেরেছি, সে হিসেব রাখার দায়িত্ব আমার নয়। তবু কৃতজ্ঞ আমার সেই চিরসঙ্গীর কাছে, দূর অতীতে একদা যাকে নেহাতই খেলাচ্ছিলে হাতে তুলে নিয়েছিলাম। সেই আমার কলমটি এক একনিষ্ঠ ভালোবাসায় এখনও পর্যন্ত আমার সঙ্গে চলছে। ছেড়ে চলে যায়নি। তার কাছে পরম ঋণ”^(৮)। ‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাস সম্পর্কে উপরিউক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়; যাঁর উপন্যাসের পরিমান ও বিষয়ের ভিন্নতায় রচনার সমৃদ্ধি এসেছে। তাতে করে সমস্ত উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা বিশেষভাবে জরুরী বলে মনে করেছি। যেপরিমানে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন ভাবী-কালের অন্যকোন ঔপন্যাসিকের রচনার তেমনভাবে সন্ধান পাওয়া যায় না বলেই মনে হয়। তাই একটি মন্তব্য আলোচ্য প্রসঙ্গে করা যেতে পারে যে, ‘ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যার বিচারে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র নাম সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়’।

<<<<<>>>>>

তথ্যসূত্র

১) আর এক আশাপূর্ণা, আশাপূর্ণা দেবী, প্রকাশক-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স,
প্রথম প্রকাশ -১৪০১ সাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৯.

২) আশাপূর্ণা দেবী, জীবনী গ্রন্থমালা ৪৬, সম্পাদক-উপাসনা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ
বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ-২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৫-১০৩.

ও

আশাপূর্ণা দেবী, সম্পাদক-মানসী দাশগুপ্ত, প্রকাশক-সাহিত্য অকাদেমি
(ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা), প্রথম প্রকাশ-২০০৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮-৪৬.

ও

আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, শিলীন্দ্র, সম্পাদক- কমল মুখোপাধ্যায়, ত্রৈমাসিক
সাহিত্যপত্র, ৪৪-বছর-১-সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬০-৯০.

ও

আশাপূর্ণা দেবী নারীসত্তার বিনির্মাণ ও শিল্পরূপ, সংকলন ও সম্পাদনা-
বিপ্লব মাজী, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০১১,
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৬-১৮৪.

৩) শিলীক্ল - আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পাদক- কমল মুখোপাধ্যায়, ত্রৈমাসিক
সাহিত্যপত্র, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৩৯.

৪) আর এক আশাপূর্ণা, আশাপূর্ণা দেবী, প্রকাশক-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স,
প্রথম প্রকাশ -১৪০১ সাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৬.

৫) আশাপূর্ণা দেবী, জীবনী গ্রন্থমালা ৪৬, সম্পাদক-উপাসনা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ
বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ-২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৫-১০৩.

ও

আশাপূর্ণা দেবী, সম্পাদক-মানসী দাশগুপ্ত, প্রকাশক-সাহিত্য অকাদেমি
(ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা), প্রথম প্রকাশ-২০০৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮-৪৬.

ও

আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, শিলীন্দ্র, সম্পাদক- কমল মুখোপাধ্যায়, ত্রৈমাসিক
সাহিত্যপত্র, ৪৪ বছর- ১ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬০-৯০.

ও

আশাপূর্ণা দেবী নারীসত্তার বিনির্মাণ ও শিল্পরূপ, সংকলন ও সম্পাদনা-
বিপ্লব মাজী, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০১১,
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৬-১৮৪.

৬) সমকালের জিয়নকাঠি, সম্পাদক-নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, আশাপূর্ণা দেবী বিশেষ সংখ্যা, ২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩০৩.

৭) আশাপূর্ণা দেবী, জীবনী গ্রন্থমালা ৪৬, সম্পাদক-উপাসনা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ-২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৫-১০৩.

ও

আশাপূর্ণা দেবী, সম্পাদক-মানসী দাশগুপ্ত, প্রকাশক-সাহিত্য অকাদেমি (ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা), প্রথম প্রকাশ-২০০৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮-৪৬.

ও

আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, শিলীন্দ্র, সম্পাদক- কমল মুখোপাধ্যায়, ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র, ৪৪ বছর- ১ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬০-৯০.

ও

আশাপূর্ণা দেবী নারীসত্তার বিনির্মাণ ও শিল্পরূপ, সংকলন ও সম্পাদনা- বিপ্লব মাজী, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৬-১৮৪.

৮) আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, শিলীন্দ্র, সম্পাদক- কমল মুখোপাধ্যায়, ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৯.

<<<<<>>>>>

তৃতীয় অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপরেখা

বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। যদিও বাংলা গদ্যসাহিত্য চর্চার আরম্ভ ও বিকাশ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই তরান্বিত হয়েছিল। কিন্তু উপন্যাস খুব কমসময়ের মধ্যে পুরাতন কাব্য ও নাট্য শাখার তুলনায় অনেক বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আমাদের প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয় যে, বাংলা গদ্যের বিকাশ ও ব্যাপ্তি ঘটার ফলেই উপন্যাসের আবির্ভাব। কিন্তু যখন মানুষের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ নব জাগরিত মস্তকের মতো ক্রমানুসারে জাগ্রত হয়ে উঠেছে; সেইসময়ে উপন্যাস নিজস্ব স্বতন্ত্ররূপ লাভ করেছিল। যেভাবে বাংলা গদ্যচর্চা শুরুর মধ্য দিয়ে উপন্যাস রচনার সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল। সেইধারাই পরবর্তীকালে ‘প্যারীচাঁদ’, ‘ভূদেব মুখোপাধ্যায়’ ও ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’-এর সময়ে এসে প্রদীপ প্রোজ্জ্বলণ ঘটায়। অবশ্য তারও বহু আগে থেকেই একটা দীর্ঘসময় জুড়ে বাংলা ভাষায় অনেকেই উপন্যাস রচনার প্রয়াস করেছিলেন। সার্থকতার নজীর ছিল না, কিন্তু ‘ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়’ থেকে ‘হেনা ক্যাথারিন ম্লুয়েন্সের’ নাম এক্ষেত্রে স্মরণ করতে পারি। কারণ ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তার পেছনে পূর্বজ সাহিত্যিকদের অবদান কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। ছোট ছোট অনেকগুলি জলের কণা যেমন করে মহাসাগরের সৃষ্টি ও ব্যাপ্তির কারণ, ঠিক তেমনি ‘বঙ্কিমচন্দ্রের’ আদর্শ উপন্যাস রচনার পেছনে অনেক সাহিত্যিকদের অবদান স্বীকার করে নিতে হয়। আর

একটি বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন যে, প্রথম পর্যায়ে যাঁরা উপন্যাস রচনা করছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ঔপন্যাসিক ছিলেন পুরুষ, নারী ঔপন্যাসিক ছিলেন হাতে-গোণা দু'একজন। প্রথম নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে আমরা 'হেনা ক্যাথারিন ম্যুয়েন্স'-এর নাম স্মরণ করতে পারি। তাঁর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' রচনাটির সার্থকতা তেমন নেই কিন্তু ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। রচনাটির প্রকাশকাল ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ। 'আশাপূর্ণা দেবী' একজন মহিলা ঔপন্যাসিক, তাঁর পূর্ববর্তী মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে 'হেনা ক্যাথারিন' বিখ্যাত। অবশ্য প্রথম দিকের উপন্যাস নিয়ে সমালোচকদের নানারকম মন্তব্য আছে। সমালোচক 'সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়' লিখেছেন—

“ইতিহাসের যে ন্যায়সূত্রের অমোঘ নির্দেশে ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপন্যাসের জোয়ার, তারই কিঞ্চিৎ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের সামাজিক বিন্যাসেও বিদ্যমান ছিল এরকম ভাবা হয়ে থাকে। বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নের ইতিহাসটি আমাদের উপন্যাসের গতি প্রকৃতি এবং শক্তি দৌর্বল্য উপলব্ধির জন্য বিশেষ ভাবে অনুধাবনীয়”।^(১)

উদ্ধৃত উক্তির প্রেক্ষিতে 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' থেকে 'আশাপূর্ণা দেবীর' সময়কাল পর্যন্ত যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করা যায়। অবশ্য একেবারেই শুরুর দিকে 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়' রচিত 'নববাবুবিলাস'(১৮২৩) গ্রন্থটি সাহিত্যজগতে উপন্যাস রচনায় সলতে পাকানোর কাজ করেছে। 'হেনা ক্যাথারিন ম্যুয়েন্সের' পরবর্তীকালে 'প্যারীচাঁদ মিত্রে'র 'আলালের ঘরের দুলাল'(১৮৫৮) সমালোচকমহলে বহুভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। এরপরে 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়' রচিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'(১৮৫৭) প্রকাশিত হলে সেই সমালোচনার জগতে নতুন করে ঘূতাহতি পরে। যার ফলে সার্থক উপন্যাসের অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে বাঙালি পাঠক সমাজ। তবে 'বঙ্কিমচন্দ্রের' পূর্বে বাংলা উপন্যাস রচনার প্রয়াস যাঁরা করেছেন

তাঁরা প্রণয়, কারণ কোন কিছুই শুরু করাটাই হল সব থেকে কঠিন কাজ। সমালোচকের মতেই বলা চলে —“উপন্যাসের জন্ম ইতিহাসে ভবানীচরণের নকশা, ম্ল্যুয়েন্সের পারিবারিক চিত্র, প্যারীচাঁদের আলাল, ভূদেবের অঙ্গুরীয় বিনিময় এবং কৃষ্ণকমলের দুরাকাঙ্ক্ষার ভূমিকা আছে”^(২)। অন্যভাবে বলা যায় ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের’ উপন্যাসে অগ্রজদের অনুসরণ নেই, কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আগামী দিনের পথ দেখানোর আলোকশিখা আছে।

উপন্যাসের বিষয়ের মধ্যে মানুষের প্রণয় অথবা দাম্পত্য সম্পর্কের প্রসঙ্গ থাকবে সেকথা স্বাভাবিকভাবে মনে করা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক দাম্পত্য জীবনের প্রসঙ্গ কিছুটা হলেও উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাই উপন্যাস সৃষ্টির প্রথমলগ্ন থেকেই ঔপন্যাসিকদের রচনায় অন্যতম বিষয় হিসেবে দাম্পত্য সম্পর্কের নানাতর উত্থান-পতনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ রচিত প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫) থেকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর প্রথম উপন্যাসে রোমান্সের প্রভাব আছে বলে অনেক সমালোচক মন্তব্য করেন। উপন্যাসটিতে যতটা ইতিহাসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ততটা সমাজের বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়নি। মানুষের জীবনের সম্পর্কের থেকে সমস্যাটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে যেভাবে রোমান্সের প্রতিফলন ঘটেছে তাতে করে দাম্পত্য সম্পর্কের বিবরণ খুব বেশী একটা নেই। পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দাম্পত্য ঘনীভূত হতে হতেই ঘটনার মোড় নিয়েছে অন্যদিকে। ‘কপালকুণ্ডলা’ ও ‘মৃণালিনী’ উপন্যাসদুটি বাদ দিলে বাকি উপন্যাসগুলি সামাজিক উপন্যাস হিসেবে ব্যাখ্যা করা চলে। মূলত প্রেম ও সামাজিক নীতিবোধ উপন্যাসগুলিতে দ্বন্দ্ব আকারে প্রকাশ পেয়েছে। ‘বিষবৃক্ষ’

উপন্যাসে ‘নগেন্দ্রনাথ’ ও পরমা সুন্দরী ‘সূর্যমুখী’ দাম্পত্য সম্পর্ক প্রথমাবধি কোনভাবে রাহুর কালো ছায়াগ্রস্ত ছিল না। কিন্তু তার নিজের পোঁতা বিষবৃক্ষে একদিন তার দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরে ভেঙে যায়। ‘কুন্দনন্দিনী’ নামে সেই বিষবৃক্ষের সঙ্গে একদিন ‘নগেন্দ্রনাথের’ বিবাহ হয়, এবং অসুখীদাম্পত্য জীবনের কারণে ‘কুন্দনন্দিনী’ আত্মহত্যা করে। তারপরে আবার পুতুল খেলার মতো ‘নগেন্দ্রনাথের’ সঙ্গে ‘সূর্যমুখী’ দাম্পত্য সম্পর্কে জড়িয়ে পরে, কিন্তু সে বন্ধনে কোনো মনের মিল ছিল না। ট্রাজেডির মৌন হাহাকারে দুজনের মধ্যে চিরকালের জন্য একটা অদৃশ্য পার্থক্য তৈরি হয়। সুখী দাম্পত্য জীবন কিভাবে একটু ভুলের জন্য নষ্ট ও অসুখী সম্পর্কে পরিণত হয় ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাস তারই চিহ্নবাহক। অন্যদিকে ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে ‘শৈবালিনী’ যেভাবে নিজেই রচনা করতে চেয়েছেন প্রকৃত প্রণয় থেকে দাম্পত্য জীবন, তাতে একদিকে তার হারাতে হয়েছে বিবাহিত স্বামী ‘চন্দ্রশেখর’কে, অন্যদিকে নিয়তির অমোঘ নির্দেশে প্রতাপকে। কোন দিকেই কোনভাবেই তার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়িত্ব পায়নি। ‘রজনী’ উপন্যাসটি ব্যতিক্রমী কারণ এখানে ‘লবঙ্গলতা’ ও ‘অমরনাথের’ অসামাজিক প্রেমের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন একটি অসামাজিক দাম্পত্য সম্পর্কে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ‘শচীশ’ ও ‘রজনীর’ মধ্যে রোমান্টিক প্রণয়ের স্বার্থকতার মধ্য দিয়ে সুখী দাম্পত্যের চিত্র অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসটি দাম্পত্য সম্পর্কের একটি গূঢ়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সফল হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। ‘গোবিন্দলাল’ অধীর হয়ে যৌবনাকাজ্জার দায়ে শুধুমাত্র কামভাবকে প্রাধান্য না দিয়ে, তার স্ত্রী ‘ভ্রমরকে’ পরিত্যাগ করে রূপবতী ‘রোহিণী’কে গ্রহণ করে। কিন্তু একসময় সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাম-তৃষ্ণার পৃষ্ঠপোষক ‘রোহিণী’কে নিজের হাতেই ধ্বংস করতে চায়। আর স্বামীর অবহেলার কারণে ‘ভ্রমর’ আত্মহত্যা করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে দাম্পত্য সম্পর্ক

দীর্ঘসূত্রতা লাভ করে না, তা যে নষ্ট-দাম্পত্য সম্পর্কে পরিণত হয় তার নির্যাস তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’। তাঁর প্রদর্শিত পথেই বাংলা উপন্যাস রচনার জগতে এসেছিলেন ‘সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ ও ‘রমেশচন্দ্র দত্ত’। ‘পালামৌ’ উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে ‘সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ ভ্রমণ সাহিত্যে নবদিগন্ত খুলে দিয়েছেন। এছাড়াও ‘রামেশ্বরের অদৃষ্ট’, ‘দামিনী’ তাঁর অন্যতম রচনা। যদিও রচনাগুলিকে সার্থক উপন্যাস বলা হয় না। আবার ‘রমেশচন্দ্রের’ সামাজিক উপন্যাসে বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহের প্রতি সরাসরি ঔপন্যাসিকের সমর্থনের কথা জানা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি জীবনকে ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ অনুধাবন করে সাহিত্যের মধ্যে চিত্রিত করার প্রয়াস করেছেন। মানুষের মনস্তত্ত্বের রহস্য, নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিন্যাস, যৌন ভাবনার প্রকাশ ও ব্যক্তির সামাজিক মুক্তির প্রত্যাশা ঔপন্যাসিক তাঁর লেখায় প্রকাশ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীসমাজের নারী কেন্দ্রিক মূল সমস্যা ছিল বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধ করা। বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ কেন্দ্রিক দাম্পত্য জীবন কেমন হয়, তাই তাঁর বেশীরভাগ উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। তাঁর সমসাময়িক কোনো ঔপন্যাসিক বাংলাসাহিত্য রচনায় তেমন ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি। বটবৃক্ষের ছায়ায় যেমন কোনো গাছ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি তাঁর সময়কালে কোনো ঔপন্যাসিক তেমন ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। সেকালের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের সংখ্যা যেমন কম ছিল, তেমনি বিষয় বৈচিত্রেও আধুনিকতার ছাপ তেমন ছিল না বলে মনে হয়। সেসময়ের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষ করে ‘সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’(১৮৪৩-৮৯), ‘তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়’(১৮৪৩-৯১), ‘ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়’(১৮৪৭-১৯১৯),

‘শিবনাথ শাস্ত্রী’(১৮৪৭-১৯১৯), ‘রমেশচন্দ্র দত্ত’(১৮৪৮-১৯০৯), ‘ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়’(১৮৪৯-১৯১১), ‘যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু’(১৮৫৪-১৯০৫), ‘হরপ্রসাদ শাস্ত্রী’(১৮৫৩-১৯৩১) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে পুরুষ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে মহিলা ঔপন্যাসিকদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁরা নিজেদের রচনার গুণেই সাহিত্যের দরবারে অনন্যা। ‘আশাপূর্ণা দেবী’র পূর্ববর্তী মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জনপ্রিয় ও প্রচারিত কয়েকজন ঔপন্যাসিকের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যাঁরা সাহিত্যের আকাশে আজও উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁদের মধ্যে ‘স্বর্ণকুমারী দেবীর’ নাম সর্বাত্মে স্মরণীয়; তাঁর আবির্ভাবকাল ও সাহিত্য রচনাগুণে। পরবর্তীকালে যথাক্রমে ‘নিরুপমা দেবী’, ‘অনুরূপা দেবী’, ‘সীতা দেবী’, ‘শান্তা দেবী’, ‘আশালতা দেবী’, ‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’, ‘অমলা দেবী’, ‘ইন্দিরা দেবী’, ‘শৈলবালা দেবী’, ‘গিরিবালা দেবী’ প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের নাম করা যায়। পুরুষ ঔপন্যাসিকদের পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’ বাংলাসাহিত্যের অঙ্গনে নারী হয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন অধিকার করে নিয়েছেন তাঁর রচনাগুণের কারণে। উপন্যাস, গল্প, নাটক এবং কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন যথেষ্ট পারদর্শী। তাঁর সম্পাদিত ‘ভারতী’ পত্রিকা সমকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হল, —‘দীপ নির্বাণ’ (১৮৭৬), ‘ছিন্ন মুকুল’ (১৮৭৯), ‘মালতী’ (১৮৮০), ‘মিবাররাজ’ (১৮৮৭), ‘হুগলীর ইমামবাড়ি’ (১৮৮৮), ‘স্নেহলতা’ (১৮৯০), ‘বিদ্রোহ’ (১৮৯০), ‘ফুলের মালা’ (১৮৯৫), ‘মিলন রাত্রি’ (১৮৯৫), ‘কাহাকে’ (১৮৯৮)। মূলত সামাজিক উপন্যাস রচনায় তিনি সাবলীল ছিলেন, তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাতেও তিনি কৃতিত্বের দাবিদার। তাঁকে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ অর্থে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘দীপ নির্বাণ’ কম বয়সের রচনা, তাই

স্বাভাবিকভাবেই কাহিনীর অঙ্গঙ্গি সম্পর্কের সঙ্গে প্রণয় প্রসঙ্গের বর্ণনাতেও কাঁচা হাতের ছাপ লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে দাম্পত্য ও প্রণয়সম্পর্ক সম্বন্ধে লেখিকার বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রকাশ লক্ষ করা যায় সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে। ‘হিন্ন মুকুল’, ‘স্নেহলতা’, ‘হুগলীর ইমামবাড়ি’, ‘কাহাকে’ ইত্যাদি উপন্যাসে যেরকম বাস্তব অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর উপন্যাসিক রেখেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ‘স্নেহলতা’ উপন্যাসে একটি বিধবা নারীর প্রেম ও বিবাহের মধ্য দিয়ে যে ঔচিত্য উপন্যাসিক সেই যুগে দেখিয়েছেন তা সেকালের বিরল ঘটনার সাক্ষ্যবাহী। অন্যদিকে ‘কাহাকে’ উপন্যাসটিকে তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা হয়। কারণ লেখিকার সারাজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা লব্ধ অভিব্যক্তির স্পষ্ট প্রকাশ ‘কাহাকে’ উপন্যাসে লক্ষ করার মতো বিষয়। উপন্যাসের নায়িকা ‘মণি’ ওরফে ‘মৃণালিনী’ নিজের প্রেম ও বিয়ের উপাখ্যান বর্ণনা করেছে আত্মকথন ভঙ্গীতে। স্পষ্ট ও সাবলীলভাবে সেযুগের একজন নারীর আত্মকথন বিশেষত স্পর্ধার দাবি রাখে। নায়িকা ‘মণি’ যেমন তার বাল্য প্রেমের কথা বলেছে, তেমনি অকপটে বলেছে যৌবনের প্রেমের কথাও। একইসঙ্গে স্বীকার করেছে ‘ব্যারিস্টার রমানাথ’ ও বাল্যপ্রেমিক ‘বিনয় কুমারের’ সঙ্গে রোমাঞ্চকর প্রেমের প্রসঙ্গ। ‘মণির’ কথার ভঙ্গীতে লেখিকার নারীবাদী চেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সে পুরুষ-বিদ্বেষী নয় কিন্তু পুরুষের মানসিকতার সাথে তার মানসিক বিরোধ। ‘মণি’ বিবাহ পরবর্তী প্রেমকে একমাত্র মনে করেনি, নিজের মনের কথা তথা প্রেমের কথা বলতে গিয়ে জড়তা বা সংশয়ে আক্রান্ত হয়নি। সে যেভাবে একাধিকবার বহু পুরুষকে ভালোবেসেছে সেকথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রেম সম্পর্কে প্রথাগত ধারণাকে সে ভেঙে দিয়েছে, তেমনি ভাবে তাঁর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’ নিজেই ‘কাহাকে’ উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ ‘An unfinished song’ করেছিলেন, স্বদেশ ও বিদেশে তাঁর অনুবাদ

বহুবার বহুভাবে প্রশংসিত হয়েছে। শুধু ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ কখনো তেমনভাবে তাঁর ন’দিদির লেখাকে গুরুত্ব দেননি অথবা প্রশংসা করেননি। ‘ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী’কে লেখা একটি চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন—

“ন’দিদি আমাকে তাঁর

‘ফুলের মালা’র তর্জমাটা পাঠিয়ে ছিলেন। এখানকার সাহিত্যের বাজার যদি দেখতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন এসব জিনিস এখানে কেন কোন মতেই চলতে পারে না। এরা যাকে ‘Reality’ বলে সে জিনিসটা থাকা চাই”।^(৩)

‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ যে যথার্থ বলেননি তার প্রমাণ বর্তমান পাঠক সঠিকভাবে ‘কাহাকে’ উপন্যাসটি পাঠ করলে হয়তো বুঝতে পারবেন। বর্তমানকালের অন্যতম উপন্যাস সমালোচক ‘সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়’ অথবা ‘সুদক্ষিণা ঘোষ’-এর মতো সমালোচকরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, ঔপন্যাসিক সত্তায় ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’ সমকালীন অনেক লেখকদের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিলেন। তাঁরা মনে করেন শুধু ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ নয় পরবর্তীকালের অন্যতম উপন্যাস সমালোচক ‘শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়’ও তাঁর ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ নামে সুপরিচিত গ্রন্থে পুরুষদের পক্ষপাতিত্ব করেছেন।

‘স্বর্ণকুমারী দেবীর’ পর নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে ‘অনুরূপা দেবী’ এবং ‘নিরূপমা দেবীর’ নাম বিশেষ ভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। এঁদের উপন্যাসে স্বাভাবিক ভাবে স্থান করে নিয়েছে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি। ‘নিরূপমা দেবী’র ‘অন্নপূর্ণার মন্দির’, ‘দিদি’ ও ‘শ্যামলী’ ইত্যাদি উপন্যাসে সমাজে প্রচলিত প্রথাগত সংস্কারগুলি বিশেষ করে লক্ষ করা যায়। দাম্পত্য সম্পর্কের ক্রম-পরিণতির মধ্য দিয়ে প্রতিটি উপন্যাসের সমাপ্তি সাধিত হয়েছে। পতিসেবা ও পারিবারিক আচার-বিচার পালন করতে গিয়ে নারী কতটা কাছে থাকে

পতিদেবতার, নাকি ক্রমশ তৈরি হতে থাকে মানসিক দূরত্ব। মনের ব্যবধান বাড়তে থাকে মনের মানুষের কাছ থেকে। সেসব কথাই উপন্যাসগুলিতে তুলে ধরেছেন ‘নিরুপমা দেবী’। অন্যদিকে ‘অনুরূপা দেবী’র উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে মনোমালিন্যের আভাসই বেশী করে চোখে পড়ে। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা তেত্রিশ। তাঁর উপন্যাসে সমকালীন নারী জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আছে। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বিধবার প্রেম, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারীর পুনর্বিবাহ প্রভৃতির বিপক্ষে ছিলেন। তবু তাঁর রচিত উপন্যাস ভিন্ন মাত্রা বহন করে। মনীষী ‘ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের’ পৌত্রি হিসেবে তিনি ভারতের ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি অনুগত থেকেও অনেক সার্থক উপন্যাস রচনা করেছেন। ‘মন্ত্রশক্তি’, ‘মহানিশা’, ‘মা’, ‘গরিবের মেয়ে’, ‘পথহারা’, ‘ত্রিবেণী’, ‘চক্র’, ‘জ্যোতিহারা’ ইত্যাদি উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নানা আঙ্গিক চোখে পড়ার মতো। সমালোচকের মতে বলা যায়,

“স্বর্ণকুমারী দেবী’র মতো তেমন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ছিল না পরবর্তিনী অনুরূপা, নিরুপমা, গিরিবালা দেবীদের। নাগরিক মননের বৈদগ্ধ্য ছিল না তাঁদের। তাই মূলত গ্রামভিত্তিক ঘরোয়া সমাজ জীবনের কাহিনী রচনা করেছিলেন তাঁরা। সমাজের মূল্যবোধ যথেষ্ট দৃঢ়মূল ছিল তাঁদের মনে, মাতৃত্বে নারীর সার্থকতা একথা অবিশ্বাস করার কথা কল্পনাও করেননি তাঁরা, ভালো স্ত্রীরাও ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত উপেক্ষা, বিচ্ছেদ সত্ত্বেও সতী থেকেছে সামাজিক ঐতিহ্যের মাপেই। সমকালীন সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে নারী পুরুষের অবস্থাগত বৈষম্য তাঁদের চোখে ধরা পড়েছে। পণপ্রথায়, কন্যাদায়ে, পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহে, বৈধব্যের নিঃসঙ্গতায় নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে নারীর যন্ত্রণাময় অবস্থিতি তাঁদের উপন্যাসে স্থান পেয়েছে”।^(৪)

মন্তব্যটি যে যথার্থ সে সম্পর্কে দ্বিমত নেই। শুধু পর্যালোচনার খাতিরে ‘অনুরূপা দেবী’র ‘মা’ উপন্যাসের একটু অংশ তুলে ধরা যেতে পারে। ‘মা’

উপন্যাসে ‘মনোরমা’ একই সাথে একজন আদর্শ মা ও অন্যদিকে একজন আদর্শ পত্নী। তার স্বামী অরবিন্দ পিতৃআজ্ঞা পালন করে তাকে পরিত্যাগ করে। সে ‘রামায়নের’ সীতার মতোই পতিব্রতা, তাঁর বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য একমাত্র সন্তান অর্জিত। ঔপন্যাসিক ‘অনুরূপা দেবী’ ‘রামায়নের’ সীতা চরিত্রের প্রভাব ‘মনোরমা’ চরিত্রের উপর সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি যুগের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাই হয়তো ‘মা’ উপন্যাসের নায়িকা ‘অরবিন্দে’র দ্বিতীয় স্ত্রী ‘ব্রজরানী’। সে যেমন দ্বিতীয় স্ত্রী তার উপর সন্তানহীনা, তাই স্বামীর ভালোবাসা ও মেয়েমহলের সন্মান কিছুই সে পায়নি। তাই জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মতো সে ‘অরবিন্দে’র জীবন সন্দেহ ও বাক্যবানে জর্জরিত করে রেখেছিল। ‘মা’ উপন্যাসটি আসলে দুজন নারীর ভিন্ন ধরনের দুঃখের কাহিনী। ‘মনোরমা’ ভারতীয় নারীর সনাতন আদলে গড়া, ‘ব্রজরানী’ নিজের অধিকার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। আর তাই হয়তো ঔপন্যাসিক ‘ব্রজরানী’র সংলাপে বলেন—“সতীনের উপর যারা মেয়ে দেয়, তাদের মতো মেয়ের শত্রু আর এ পৃথিবীতে কেউ নেই। ...সতীনের উপর মানুষ কেন মেয়ে দেয়? গঙ্গায় তো এখনও জলের অভাব হয়নি”^(৫)। এই বক্তব্য শুধু ‘অরবিন্দ’ ও ‘ব্রজরানী’র গুরুজনদের বিরুদ্ধে নয়, যে সমাজ পুরুষের একাধিক বিবাহের বিধান আছে, সেই সমাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। অন্যদিকে পিতৃসত্য পালনের জন্য সংসার ত্যাগী স্বামীর প্রতি কোন ক্ষোভ প্রকাশ করে না ‘মনোরমা’, সে অপেক্ষা করেন শুভদিনের আশায়, কিন্তু কখনোই তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। পিতার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা যেন অটুট থাকে, সেজন্য সে পুত্রকে বুঝিয়ে বলে—“যদি তিনি নিয়ে যান, আপনিই যাবেন। যদি নিয়ে যাবার উপায় না থাকে, তবে অনর্থক ওঁর মনে আমরা কষ্ট দিতে যাব কেন?”^(৬) একটি দায়-দায়িত্বহীন দাম্পত্য সম্পর্কে এমন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তেমনভাবে কোন ঔপন্যাসিক চিত্রিত করেননি। ‘শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়’ এর মতে—

“উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য অংশ অরবিন্দ ও ব্রজরাণীর দাম্পত্য সম্পর্কের বর্ণনা। অরবিন্দের ব্যবহারে নিখুঁত নিশ্চিদ্র লৌকিক কর্তব্য পালনের সঙ্গে অবিচলিত উদাসীনতার সমন্বয় হইয়াছে। মনোরমার প্রতি বাক্যে ও ব্যবহারে সে কিছুমাত্র স্নেহ প্রকাশ করে নাই— যৌবনের সেই প্রথম প্রেমাগরজিত অধ্যায় সে একেবারে জীবন হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। অথচ তাহার ক্ষুদ্রতম কার্যে, তাহার ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিতে ব্রজরাণী নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে, তাহার সবটুকু প্রেম, সবটুকু উৎসাহ তাহার সপত্নী নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে, প্রেমের পাশে তাহার জন্য এতটুকু উদ্ধৃত পড়িয়া নাই। সমস্ত লৌকিক কর্তব্যপালনের মধ্যে অরবিন্দের নিঃসঙ্গ অনাসক্ত মনের চিত্রটি খুব চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের সহজ সমৃদ্ধি, প্রাণরসের নিগূঢ় সঞ্চরণ তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রতিজ্ঞা পালনের শুষ্কবৃত্তে সে কোনরূপে নিজেকে ধরিয়া রাখিয়াছে মাত্র। স্নেহ-প্রবৃত্তির এই নির্মম নিপীড়নে, এই কঠোর আত্মনিগ্রহে তাহার জীবনী-শক্তি তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইতে চলিয়াছে। অবশেষে যে পক্ষাঘাত আসিয়া তাহাকে শয্যাশায়ী করিয়াছে তাহা এই জীবনব্যাপী আত্মনিরোধের চরম, অবশ্যস্ভাবী পরিণতি মাত্র”।^(৭)

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম হয়েছিল নানাতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তারমধ্যে একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমাজের অবহেলিত নারীদের নীতিশিক্ষা প্রদান করা। কিন্তু পুরুষের লেখার তুলনায় নারীর কলমে নারীর প্রতি শিক্ষা প্রদান স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে দেখা দিল। পুরুষ উপন্যাসিকরা চেয়েছিলেন উপন্যাস পাঠিকা হিসেবে নারী সতীত্ব ধর্মে অবিচল থাকবে এবং সংসারের জন্য যাবতীয় কর্ম নিরলস ভাবে করবে। সেখানে নারীর মর্ম কথা ও মর্মাস্তিক পীড়নের কথা তেমনভাবে স্থান পায়নি। পরবর্তীকালে নারীর হাতেই নারীর চরিত্র স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হতে থাকল। ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’ ‘অনুরূপা দেবী’, ‘সীতা

দেবী’, ‘শান্তা দেবী’ প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের লেখাতেই বিবর্তনের ধারার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অবশ্য আমরা এই কথাও স্বীকার করে নেই যে বাঙালী নারীরা যখন উপন্যাস লেখা শুরু করেন তখন পুরুষ সমালোচক ও লেখকরা সেই প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখেনি। যদিও অবহেলিত বাঙালী নারী সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো উপন্যাস রচনাতেও খুব বেশী দেরি করেননি। পুরুষদের উপন্যাস রচনা শুরু করার দু’দশকের মধ্যেই তাঁরা উপন্যাস রচনা শুরু করেন। ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’ যে আড়ম্বরে নারী রচিত উপন্যাসের শুভ সূচনা করেছিলেন, তাকে পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন ‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’ ও ‘আশাপূর্ণা দেবী’র মতো ঔপন্যাসিকরা। যাঁদের লেখায় নানাভাবে নারীর অন্তঃমননের বহু-বিচিত্র কখন ফুটে উঠেছে। শুধু নারীর জীবন কথাই নয় পুরুষের জীবনের সঙ্গে তার ওতপ্রোত মিল খোঁজার চেষ্টাও করেছেন। পুরুষের জীবনকে তাঁদের নিজের মতো করে পরিলক্ষিত করে উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। নারী ও পুরুষের অমোঘ দাম্পত্য সম্পর্ক প্রসঙ্গেও একইভাবে চিত্রিত করেছেন একের পর এক চিত্রপট। অবশ্য একথা একবাক্যে স্বীকার করতে হয় যে, নারী ঔপন্যাসিকদের লেখায় তুলনায় পুরুষ ঔপন্যাসিকদের থেকে অনেক বেশী বাস্তব আকারে নারীজীবনের সমস্যা চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু নারীকে সহজে কোনখানেই সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ জায়গা ছেড়ে দেয়নি। ঔপন্যাসিক হিসেবে ‘অনুরূপা দেবী’ যখন প্রতিষ্ঠার পথে, সেইসময় বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ লেখিকা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। তিনি ‘অনিলা দেবী’ ছদ্মনামে ‘অনুরূপা দেবী’র বিখ্যাত উপন্যাস ‘পোষ্যপুত্র’(১৩১৭ বঙ্গাব্দ) সম্পর্কে লেখেন—

“ইহারও ভাষা যে অতি মধুর, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমার মেয়ে বলিতেছিল, এত মধুর যে মুখ মারিয়া যায়, আর গিলিতে পারা যায় না। তা ভাষা যাহাই হোক, প্রায়ই উপমাগুলি যে না জানিয়া লেখা, তাহা পড়িলেই চোখে ঠেকে। আর একটা জিনিস তার চেয়েও বেশী ঠেকে—সেটা

অসহ্য জ্যাঠামো”।^(৮)

‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে’র মতো সমালোচকদের ক্ষেত্রে আলোচ্য মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য কারণ তিনি একজন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক। কিন্তু সমালোচনা করার সময় তিনি হয়তো ভুলে গেছেন যে একজন নারী ঔপন্যাসিকের উপন্যাস সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন। আমরা জানি প্রতিটি উপন্যাসে প্রধানত ঔপন্যাসিকের অন্তরাত্মার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। তাই যে কোন উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনায় পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকা দরকার :-

১. ঔপন্যাসিক কোন পদ্ধতিতে তাঁর সমকালীন জগত ও সমাজ জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।
২. তিনি সামাজিক রীতি-নীতির কী কী বিষয় গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন।
৩. তিনি সমাজের কী কী বিষয় পরিহার করেছেন।
৪. তিনি মানুষের জীবনের কোন ধরনের সমস্যা উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন।
৫. তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, কোন ধরনের নৈতিক মূল্য নিষ্কাশিত করেছেন।

‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে’র ক্ষেত্রে হয়তো এইসমস্ত দিকে লক্ষ্য দেওয়া সেসময়ে সম্ভব ছিল না বলেই মনে করা যেতে পারে। তাই হয়তো ‘অনুরূপা দেবী’র লেখা সম্পর্কে তিনি একাধিকবার বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অবশ্য সুখের বিষয় এই যে, পরবর্তীকালে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ‘অনুরূপা দেবী’র প্রশংসা করেছেন। ‘কথাসাহিত্য পত্রিকা’ ‘অনুরূপা দেবী বিশেষ সংখ্যা’ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ সেখানে লিখেছেন—

“সত্যি ভারী খুশি হয়েছি আপনাদের এই সংখ্যাটি প্রকাশের খবর শুনে।

বাংলাদেশে মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে অনুরূপা দেবীর স্থান আজও সর্বোচ্চ শিখরে একথা অবিসম্বাদী সত্য। বার্ষিক্য এবং অস্বাস্থ্যে তিনি আজ তাঁর কলম গুটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর খোলা কলম বাংলা সাহিত্যে যে প্রচুর সম্পদ দান করে গেছে, তার ঋণ সহজে শোধ হবার নয়। আমরা যদি সে ঋণ যথার্থ ভাবে স্বীকার করতে পারি, তো সে অনুরূপা দেবীর সম্মানবৃদ্ধি নয়, আমাদেরই সম্মানরক্ষা”।^(৯)

আলোচ্য উদ্ধৃতির ভিত্তিতে আমরা মোটামুটি ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ‘অনুরূপা দেবী’র উপন্যাস সম্পর্কে প্রশংসা করতে না পারলেও ব্যঙ্গোক্তি করে তাঁর সৃষ্টির অবমাননা করা উচিত নয়। তাতে করে নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার মতো অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রকৃতরূপে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ‘অনুরূপা দেবী’ বেশী আগ্রহী ছিলেন। তুলনায় তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলি কাহিনীর গভীরতা স্বাভাবিকভাবে কিছুটা লঘু বলা যেতে পারে। মূলত উপন্যাসের চরিত্রের প্রতি সজাগ সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন লেখিকা। তিনি মানব জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব দাম্পত্য জীবনের উপর তেমন ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি। তবে উপন্যাসের বিষয়ের গভীরতায় দাম্পত্য প্রসঙ্গ এসেছে স্বাভাবিক নিয়মে। ‘বাগদত্তা’ উপন্যাসে দৈবের প্রভাব থাকলেও শচিকান্ত ও কমলার জীবন প্রবাহের নানা মোড় সুস্পষ্টভাবে ঔপন্যাসিক চিত্রিত করেছেন। মূলত বিবাহ পরবর্তী প্রেমই উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। শচিকান্ত ও কমলার বিবাহপরবর্তী জীবনচিত্র লেখিকা গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও একইভাবে মানব জীবনের নানা মোড় সুস্পষ্ট ভাবে ঔপন্যাসিক চিত্রিত করেছেন। ‘উত্তরায়ণ’ উপন্যাসে ‘সলিল’ ও ‘আরতির’ প্রেমের পথে কিভাবে একের পর এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে, এবং তা থেকে কিভাবে পরিত্রাণ

পাওয়া সম্ভব হয়েছে, লেখিকা তাই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের অগ্রগতিতে দেখা যায় ‘সলিল’ তার প্রণয় পাত্রীকে ত্যাগ করে মায়ের ইচ্ছায় অন্য একজন কন্যাকে বিবাহ করে। যার পরিণতি হয় ভয়ঙ্কর। ইচ্ছাকৃতভাবে একটা নষ্ট-দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরি করে ‘সলিল’ নিজেই একসময় অবসাদের মধ্যে পড়ে যায়। সে মুক্তির পথ খুঁজে পায় পূর্বের পরিত্যক্তা প্রণয়ীর প্রণয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। লেখিকা একদিকে যেমন সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্কের ছবি তুলে ধরেছেন অন্যদিকে তেমনি নষ্ট-দাম্পত্য বা বিরোধের ছবিও চিত্রিত করেছেন।

আমরা পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারি যে, ‘অনুরূপা দেবী’ মূলত চারটি উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব প্রতিভার নির্যাসকে অনেকটাই তুলে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয়। উপন্যাস চতুষ্টয় হল:— ‘গরীবের মেয়ে’, ‘মন্ত্রশক্তি’, ‘মহানিশা’ ও ‘পথহারা’। ‘মন্ত্রশক্তি’ উপন্যাসে পৌরাণিক চরিত্র ‘বেহুলার’ মতো একজন নারীচরিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। ‘বাণী’ নামে একজন নারী তার স্বামীকে ‘বেহুলার’ মতো পুনর্জীবন দানে সমর্থ হয়। মূলত ভক্তি শ্রদ্ধা ও পুরাণের দেবত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে আলোচ্য উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত তৈরি করেছে। লেখিকার অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও একইভাবে সমগুণে দাম্পত্য সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায়। বিশিষ্ট সমালোচক ‘শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়’ তাই হয়তো ‘অনুরূপা দেবী’র উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন—

“উপন্যাস ক্ষেত্রে বিশেষত মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অনুরূপা দেবীর স্থান সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস সাহিত্য চিরস্মরণীয়তা লাভের উপযুক্ত। তাঁহার রচনার মধ্যে নারী হস্তের স্পর্শ নির্ভুল ভাবে নির্দেশ করা কঠিন—সাধারণত তাঁহার মন্তব্যের প্রাচুর্য ও বিশ্লেষণের

গুরুত্ব পুরুষের পাণ্ডিত্য, পুরুষ আলোচনার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। তথাপি তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে কতকগুলি দৃশ্য রচয়িত্রীর নারী সুলভ কামনীয়তার নিদর্শন। ‘মা’ উপন্যাসে ব্রজরাণীর নিদারুণ অভিমান ও ঈর্ষা; গরীবের মেয়ে’তে নীলিমার বঞ্চিত হৃদয়ের প্রেম বুভুক্ষা; মন্ত্রশক্তি’তে বানীর নিগূঢ় মর্মোৎঘাটন; পথ-হারা’তে উৎপলার অতর্কিত নারীত্ব বিকাশ এই সমস্ত দৃশ্যকে নারীর স্বজাতি সম্বন্ধে সুক্ষদর্শিতা ও সহজ ও সংস্কারলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করা যাইতে পারে”।^(১০)

‘অনুরূপা দেবী’র রচিত উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের উক্তিটি যথার্থ, এ বিষয়ে সংশয় নেই। সেইসঙ্গে উক্ত উক্তিটি পূর্বে আলোচিত দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ক বিশ্লেষণের সমর্থন জোগায়।

‘অনুরূপা দেবী’র সঙ্গে প্রায় একবাক্যে আর একজন ঔপন্যাসিকের নাম উচ্চারণ করা হয়, তিনি হলেন ‘নিরূপমা দেবী’। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস ‘উচ্ছৃঙ্খল’, তেমনভাবে ঘটনার ঘনঘটায় জমে উঠতে পারেনি বলে সমালোচকরা মন্তব্য করেন। অনেক সমালোচক মনে করেন তাঁর প্রথম লেখায় অপরিণত মননের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে লেখা ‘অন্নপূর্ণার মন্দির’ উপন্যাসে লেখিকা স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করেন তাঁর প্রকৃত ঔপন্যাসিক সত্তা নিয়ে। উপন্যাসটির মধ্যে একটি গরীব পরিবারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ‘সতী’ নামের একজন নারীর জীবনের ওঠা নামার বিভিন্ন ঘটনাকে লেখিকা বর্ণনা করেছেন। মূলত চরিত্রটির দৃষ্ট তেজস্বীতা, নীরব সহিষ্ণুতা ও অনমনীয় আত্মসম্মান জ্ঞানের একটা তীব্র জ্বালাময় ভঙ্গীমা প্রকাশ করাই ছিল লেখিকার মূল উদ্দেশ্য। মুখ্যচরিত্রের ও গৌণচরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখিকা প্রেম, বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন বিজ্ঞাপিত করতে চেয়েছেন। উপন্যাসে ‘সতী’ মুখ্যচরিত্র হলেও তুলনায় গৌণচরিত্র ‘সাবিত্রী’ অনেকটাই প্রাঞ্জল। তার

বিবাহের প্রসঙ্গে প্রেমের সার্থকতা তেমনভাবে নেই কিন্তু প্রেমের প্রকাশের অবকাশ আছে। ‘সাবিত্রী’ একসময় দাম্পত্যসম্পর্কে আবিষ্ট হয়ে পড়লেও ‘সতী’র আত্ম-বিসর্জন যেন কালো ছায়া ডেকে আনে তার জীবনে। এক নারীর প্রভাবে আর এক নারীর দাম্পত্য জীবনে কিভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ‘নিরুপমা দেবী’ তা ‘অল্পপূর্ণার মন্দির’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

“নিরুপমা দেবীর উপন্যাস ও ছোটগল্প সংখ্যায় অল্প, তাহাদের মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্যেরও অভাব আছে, কিন্তু সব কয়টিই কলাকৌশলে বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রেমের বিরোধ ও দাম্পত্যজীবনের সংঘর্ষ প্রায় সমস্ত উপন্যাসের বিষয়, এবং ইহা লেখিকার বিশেষ কৃতিত্বের নিদর্শন যে, এই সংঘর্ষের উপাদান আমাদের সাধারণ, বৈচিত্র্যহীন গার্হস্থ্য জীবন হইতেই আহুতি হইয়াছে”।^(১১) অন্যদিকে ‘দিদি’ উপন্যাসটিতে পুরুষের একাধিক বিবাহের ফলে কিরূপ দাম্পত্য-সমস্যার সৃষ্টি হয়, তার বিবরণ আছে। উপন্যাসটি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে ‘অমর’, ‘সুরমা’ ও ‘চারু’ নামে তিনজনের জীবনের আবর্তে দাম্পত্য সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিরূপায়িত হয়েছে। ‘অমর’ প্রথম পত্নী ‘সুরমা’কে অবজ্ঞা করে ‘চারু’র প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে বিয়ে করে। ‘সুরমা’ প্রতিবাদ না করে নিজের অদৃষ্ট বলে মেনে নেয়, এবং নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে রেখে নিঃস্বার্থভাবে ‘অমর’ের সংসারের জন্য উৎসর্গ করে দেয়। সেবা-শুশ্রূষায় কারো প্রতি তার কোনরকম কার্পণ্য নেই। কিন্তু তার বিনিময়ে কোনদিন কারো কাছ থেকে পায়নি নূনতম সৌজন্যতা। একসময় ‘অমর’ নিজেই ভুল বুঝতে পারে, এবং ‘সুরমা’কে আবার প্রণয় বন্ধনে জড়াতে চায়। কিন্তু ততদিনে ‘সুরমা’ তার সতিনকে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে স্নেহশীলা দিদি হয়ে নির্বাসন গ্রহণ করেছে। এবং নিজে মনে-প্রাণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করেছে যে স্বামীর সঙ্গে কোন রকম সংকোচ না দেখিয়ে তাদের পূর্বসম্পর্কের

কোন স্মৃতিকে আর জাগিয়ে রাখবে না। কিন্তু ততদিনে অমরের মনে পরিবর্তন ঘটেছে। সে ‘সুরমা’কে পূর্বের ন্যায় কাছে পেতে চায়। কিন্তু ততদিনে জীবনতরী বহুদূরে চলে গেছে। তবু ‘অমর’ হাল না ছেড়ে অপেক্ষা করে। উপন্যাসের শেষপর্যায়ে দেখা যায় বয়স সায়াহে তিনজনই ভুল বুঝতে পারে। অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় পূর্ব-দাম্পত্য সম্পর্ককে নতুন করে তৈরি করার মাধ্যমে জীবনযাপন করে। দাম্পত্য সম্পর্কের এমন মোড় সেযুগের অন্য কোন উপন্যাসে তেমনভাবে চোখে পড়ে না।

‘আশাপূর্ণা দেবী’র পূর্ববর্তী নারী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ‘শান্তা দেবী’ ও ‘সীতা দেবী’র নাম বেশীরভাগ ক্ষেত্রে একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। দুজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে চরিত্র ও কাহিনীর মিল বহুক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া তাঁরা দুইবোন পিতা ‘রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের’ স্নেহ ও প্রশ্রয়ে সেযুগেও পড়াশুনা ও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। তাঁদের পিতা ‘প্রবাসী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পিতার সহচর্যে ও পরিচর্যায় সমবয়সী দুইবোন মিলিত প্রয়াসে বাংলা উপন্যাস জগতে সেদিনের পটভূমিকায় নব অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। প্রথম জনের জন্ম ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আর ‘সীতা দেবীর’ জন্ম ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে। ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’র মতো তাঁরাও আশৈশব সাহিত্য ও সংস্কৃতির আবহাওয়াতেই বড় হয়ে উঠেছিলেন। শৈশব অবস্থা থেকে দুইবোনেরই প্রচুর পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যের পাঠভ্যাস ছিল। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে দুইবোন যৌথ প্রয়াসে ‘Folk Tales of Hindusthan’ বইটি অনুবাদ করে ‘হিন্দুস্থানী উপকথা’ নামে প্রকাশ করেন। এরপর আবার যুগ্ম প্রয়াসে ‘সংযুক্তা দেবী’ নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসটির নাম ‘উদ্যানলতা’, প্রকাশিত হয় ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটি সম্পর্কে পরবর্তীকালে ‘শান্তা দেবী’ লিখেছেন:—

“সীতা আর আমি তখন সংযুক্তা দেবী নাম নিয়ে

প্রবাসী’তে উদ্যানলতা উপন্যাস লিখেছিলাম। ছাত্রছাত্রী-মহলে উপন্যাসটির বেশ নাম হয়েছিল। ...সংযুক্তা দেবীকে আবিষ্কার করবার জন্য তখনকার অনেক খ্যাতনামা লেখক-লেখিকা নানা সন্ধান করেন। একবার বোধহয় মাঘোৎসবের সময় শারীরিক অসুস্থতার জন্য সুবিখ্যাত লেখিকা নিরুপমা দেবী একটু বিশ্রামের জন্য আমাদের বাড়ি এসে হাজির। আমরা সংযুক্তারা যে বয়স্কা মহিলা নই দেখে তিনি বিস্মিত ও পুলকিত হলেন”।^(১২)

যদিও উক্ত মন্তব্যটি ‘সংযুক্তা দেবী’দের ব্যক্তিসত্তা নিয়ে লেখা, তবু যেন মনে করা যেতে পারে যে প্রচ্ছন্ন ভাবে উপন্যাসটির শ্রেয়র কথাই বেশী করে বলা হয়েছে। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে ‘উদ্যানলতা’ উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তেমন কোন বিশেষ চিত্ররূপ পাওয়া যায় না বলেই মনে হয়। উপন্যাসটিতে বিশেষত আছে নারী-শিক্ষার কথা আর নারীর ব্যক্তিসত্তার শিকড়ের সন্ধানের প্রসঙ্গ। ‘বেথুন স্কুলের’ সিংহদুয়ার দিয়ে বেরিয়ে আসা শিক্ষিত মেয়েদের পূর্বসূরিদের কথাই উপন্যাসটির উপজীব্য বিষয় হিসেবে পর্যবসিত হয়েছে বলে মনে হয়। যাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে গিয়ে নারী একদিন খুঁজে পায় তাঁদের প্রকৃত জীবনের মানে। শুধুমাত্র পুরুষের অধীনস্থ হয়ে না থেকে, একসময় প্রকৃত অর্ধাঙ্গিনী হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতভাবে নারী নিজেই শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর গুরু মুহূর্ত থেকে। ‘শান্তা দেবী’ ও ‘সীতা দেবী’র রচনায় এরকমই বহু নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যতা অঙ্কিত হয়েছে বিচিত্র আঙ্গিকে।

‘শান্তা দেবী’ রচিত ‘জীবন দোলা’ উপন্যাসটি আলোচ্য গবেষণা প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন নারীর গোটা জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনী উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

উপন্যাসটিতে ‘গৌরী’ নামের একজন নারীর জীবনের বিচিত্র সমস্যা উপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটিতে ‘গৌরী’ কেন্দ্রীয় চরিত্র, আর তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে অন্যান্য চরিত্রগুলি। তার দাম্পত্য জীবনের শুরুর মুহূর্তে দু’জন প্রেমিক ‘সঞ্জয়’ আর ‘অপূর্ব’ একইসঙ্গে উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত ভাবে কাহিনীতে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে ‘গৌরী’র বিবাহের পরেই উক্ত প্রেমিক-দ্বয়ের জীবননাট্যের যবনিকাপাত ঘটেছে। তার কাছে প্রেম এবং বিবাহ দুটি বিষয়ই আলাদা আলাদা মাত্রা বহন করে। তার জীবনে প্রেম প্রেরণার জন্য দিয়েছে আর বিবাহ দিয়েছে জগতের জন্য কর্মোদ্ভব উদ্যোগ। ‘সীতা দেবী’ রচিত ‘রজনীগন্ধা’ উপন্যাসটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ‘ক্ষণিকা’, ‘মেনকা’ ও ‘লালু’ নামে তিনজন ভাই-বোনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপন্যাসটির মূল বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। ‘ক্ষণিকা’ তার দরিদ্র পরিবারের হাল ধরতে গিয়ে চাকরির সন্ধান করতে থাকে। আর সেই পর্বেই প্রথম দেখা হয় ‘অনাদিনাথ’র সঙ্গে। ‘অনাদিনাথ’র সঙ্গে ক্ষণিকার প্রেম পর্বের বিস্তৃত বিবরণ উপন্যাসে রোমান্সের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ‘অনাদিনাথ’ ঘটনাক্রমে ‘মনোজা’ নামে একজন মেয়েকে বিবাহ করে, এতে করে ক্ষুব্ধ হয়ে ‘ক্ষণিকা’ তাকে বহুভাবে তিরস্কার করে। কিন্তু কোন মতেই সে আর ‘মনোজার’ সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারে না। নিয়তির অমোঘ নির্দেশে ‘মনোজা’ পরলোক গমন করলে, পরবর্তী সময়ে ‘ক্ষণিকা’ তার বিক্ষুব্ধ-প্রণয় ‘অনাদিনাথ’কে অর্পণ করে নিজের মনের কামনা চরিতার্থ করে। এই উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকদের মত অনুসারে বলা যায় যে একজন নারীর এমন তীব্রতর প্রেমের অপ্রতিরোধ্য মনোভাব বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বিরল। ‘শান্তা দেবী’ ও ‘সীতা দেবী’ দুজনে বহুদিন ধরে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের জগতে একত্রে উচ্চারিত দুটি নাম। তাঁদের উপন্যাসের মধ্যে মূলত নারী জীবনের টানাপোড়েন বেশী করে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তাতে করেও দাম্পত্য

সম্পর্কের ভিন্নতা বহুভাবে চিত্রিত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কখনো তার প্রকাশ ঘটেছে প্রণয় প্রার্থীকে নিয়ে, আবার কখনো অপরিচিত আবাল-বৃদ্ধ কোন কুলীনকে দিয়ে। আসলে তুলনামূলক বিচারে দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র অঙ্কনে ঔপন্যাসিক দুইবোনই একে অপরের দোসর বলে আমরা সহজেই মনে করতে পারি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস রচনায় যে ঔপন্যাসিকরা উনিশ-শতকের উত্তরাধিকার বহন করেও বিশ-শতকের রাজপথে হেঁটেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন ‘বেগমরোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন’। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে এক অভিজাত মুসলমান পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর লেখা একটি মাত্র উপন্যাস ‘পদ্মরাগ’ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নিবেদন অংশে তিনি জানিয়েছেন, উপন্যাসটি প্রকাশের প্রায় ২২ বছর আগে থেকে উপন্যাসটি লেখা শুরু করেছিলেন। সেই দিক থেকে দেখলে ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের’ লেখা ‘চোখের বালি’ উপন্যাসটি প্রকাশের এক বছর আগে ‘পদ্মরাগ’ রচনা করা শুরু হয়েছিল। উপন্যাসটিতে একজন নারী মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে অন্যান্য সমস্ত চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। ‘সিদ্ধিকা’ নামে সেই নারী চরিত্র সেদিনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম প্রতিবাদী প্রতিমা। ‘সিদ্ধিকা’ একসময় উপলব্ধি করে পুরুষতন্ত্র থেকে সমাজকে কোনমতে আর নিষ্কলুষ করা সম্ভব হবে না। এমন কি বিবাহিত স্বামীও সেই প্রথাগত পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি, তখন প্রতিবাদী ‘সিদ্ধিকা’ নিজের দাম্পত্য সম্পর্কের ইতি টেনে দিয়ে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজ সংস্কারের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেয়। তার পূর্বজ ‘দীনতারিণী দেবী’র সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের সমস্ত সম্পত্তি সমাজ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে। ‘দীনতারিণী’র দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাবধান করে দিয়ে ‘সিদ্ধিকা’কে বলেন –“তুমি যে সমাজের সমূহ কল্যাণের নিমিত্ত দাম্পত্য

জীবনের জলাঞ্জলি দিলে, ইহাতেই আমার অধিক দুঃখ হইতেছে। কৃত্য সমাজ তোমার এ অমূল্য দানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবে না। সমাজ সেবা করিতে গেলে আজীবন অভিসম্পাত কুড়াইতে হইবে। এখনও সময় আছে ঘরে ফিরিয়া যাও পদ্মরাগ”।^(১৩) কিন্তু কোন আবদার ‘পদ্মরাগ’কে আর ঘরমুখো করতে পারেনি। যে দাম্পত্যজীবন সে একবার ত্যাগ করে এসেছে তার দিকে কোনদিন ফিরে তাঁকায়নি পরবর্তী জীবনে। উপন্যাসটিতে অসম অসুখী-দাম্পত্য জীবনের কথা আছে, তবে তার প্রেক্ষিত বৃহৎ সমাজে প্রতিষ্ঠিত রূপে ঔপন্যাসিক প্রকাশ করেছেন। তাই আলোচ্য পর্বে উপন্যাসটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে যথাযথ বিশ্লেষণ হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’ সর্বমোট পাঁচটি উপন্যাস রচনা করেছেন। ‘ছায়াপথ’(১৩৪১), ‘বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ’(১৩৫৫), ‘মনের অগোচরে’(১৩৫৯), ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’(১৩৭৪), ‘হরিজন উন্নয়ন কথা’(১৩৯০)। ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি বিশেষত ইতিহাসকে তাঁর উপন্যাস প্রাধান্য দিয়েছেন। অবশ্য সেইসঙ্গে উপন্যাসের চেনা উপাদানগুলিকেও তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর উপন্যাসে প্রেম-বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের কথা যথাযথ ভাবে আছে বলে ধরে নেওয়া যায় খুব স্বাভাবিকভাবে। প্রথম উপন্যাস ‘ছায়াপথ’-এর নায়িকা ‘সুপ্রিয়া’ যেমন উপার্জনশীল তেমনি ব্যক্তিত্বময়ী। স্বাভাবিক ভাবে সে প্রতিবাদ করে পণপ্রথা ও কৌলিণ্যপ্রথার মতো নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। কিন্তু হাজারও প্রতিবাদের পরেও যখন দাদার বন্ধু ‘বিভাস’কে বিবাহ করে, তারপরেও নিজের মতে অটল থেকেছে ‘সুপ্রিয়া’। দূরে প্রবাসে শিক্ষকতার চাকরি করার জন্য দাম্পত্যজীবনে নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। ‘বিভাস’ চায় এই নৈকট্যহীন দাম্পত্যের অবসান ঘটুক, তাই সে ‘সুপ্রিয়া’কে চাকরিতে জবাব দেওয়ার কথা বার বার বলে। কিন্তু ‘সুপ্রিয়া’ তা

কোন মতেই মেনে নেয় না, শেষ পর্যন্ত নিজের শিক্ষার শক্তি প্রমাণ করে দিয়ে পায়ের তলার মাটি দৃঢ়তার সঙ্গে চিনিতে দেয়। এখানেই নব দাম্পত্য সম্পর্কের উন্মোচন ও প্রাধান্য দান করেছেন ঔপন্যাসিক। যা আজকের যুগের প্রায় বেশীরভাগ নারীর পরিচয় রূপে স্বীকৃত পেয়ে থাকে। নারীর যোগ্য সম্মানে চাকরি করার জন্য দাম্পত্য সম্পর্কের তিক্ততা বহুক্ষেত্রে কেটে গেছে। আসলে নারী যে সংসার সুখের একমাত্র কাণ্ডারী, তা সেদিনের যুগে যেমন সত্য ছিল আজকের যুগেও তেমনি সত্য। আলোচ্য উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচক ‘শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়’ লিখেছেন—

“উপন্যাসের আসল সমস্যা হইল সুপ্রিয়ার বিবাহ বিমুখ চিত্তে ধীরে ধীরে প্রণয়ের মোহ সঞ্চর— বিভাসের প্রতি সুপ্রিয়ার নিগূঢ় অভিমানে কোনো উদ্ধত বিদ্রোহ, জ্বালাময় চিত্তদাহ বা উচ্চকণ্ঠ স্বতন্ত্র-ঘোষণা নাই, আছে একদিকে দৃঢ় সংকল্প ও কুণ্ঠিত অনাগ্রহ, অন্যদিকে নারীর অর্ধজড়, পুরুষের তীক্ষ্ণ প্রভাবে অভিভূত, রাহুগ্রস্ত জীবনের স্বাধীন স্ফুরণের সাধনা। তাহার ধূসর মনে প্রেমের শান্ত রশ্মিচ্ছটার বিকিরণ, ও ইহার অপরূপত্বের আবিষ্কার সুন্দরভাবে ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই উপন্যাসের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সমস্যার অবসান হয় নাই— সুপ্রিয়ার স্বাতন্ত্র্যবাদ বিবাহোত্তর জীবনেও সংক্রামিত হইয়া দাম্পত্যজীবনে একটা বিপরীতগামী আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে”।^(১৪)

‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’র অন্যান্য উপন্যাসগুলিতে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনায় ইতিহাস প্রসঙ্গ বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন ‘হরিজন উন্নয়ন কথা’ উপন্যাসে ‘গান্ধীজী’র নেতৃত্বে ‘ভারতবর্ষের’ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের কথা বেশী করে বর্ণনা করা হয়েছে। ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ উপন্যাসেও একই রকম ভাবে ‘ভারতবর্ষের’ স্বাধীনতার প্রসঙ্গ আছে। সার্বিক দিক থেকে ‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’ উপন্যাসের জগতে রাজনৈতিক আন্দোলনের চিত্রপট তৈরি করেও নারী

জীবনের নানা প্রসঙ্গ তার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে এখানেই তাঁর ব্যতিক্রমী সার্থকতা।

‘স্বর্ণকুমারী দেবী’ থেকে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ পর্যন্ত নারী ঔপন্যাসিকদের রচনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ‘ড. ছন্দা রায়’ জানিয়েছেন—

“পুরুষতন্ত্রের দৌরাত্নের বিরুদ্ধে নারীর কলম সরব হতে শুরু করেছিল উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকেই। কিন্তু নারীদের কলমের উপন্যাসে ছিল সমান্তরাল দুটি ধারা। একটি ধারার নারীর স্বর তখনও আনুগত্য কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পুরুষের অভিভাবকীয় আশ্রয়ে অত্যাচার ভেবে জীবন যন্ত্রনার কারণ করে তোলা হচ্ছে নিয়তি অথবা কর্মফলকে। দ্বিতীয় ধারা স্বর প্রতিবাদের। এই ধারাতে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ আলাদা করে চোখে পড়েন। আমাদের বিস্মিত করে তাঁর পরিকল্পনার ব্যাপ্তি। হ্যাঁ, ঘরেই কথাই বলেন তিনি, কিন্তু স্থান-কাল-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে দেড়শো বছরেরও বেশি কাল-পরিক্রমায় প্রাক-উপনিবেশ পর্ব থেকে তিনি পৌঁছে যান উপনিবেশোত্তর পর্বে। তবে ঘটনাবল্ল পট উপন্যাস তিনটিকে ধারণ করে রাখলেও ইতিহাসের কণ্ঠস্বর কোথাও মুখর হয়ে ওঠে না। বহিজীবনের ভাঙাগড়ার চিহ্নগুলো মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে চোরা লণ্ঠনের আলোয়। সময়ের আসল মজিটা আশাপূর্ণা ধরেন সমাজের রীতি-নীতিতে, মানুষের চলনে-বলনে। তাই দিয়েই সেযুগ—এযুগের বিচার”।^(১৫)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস রচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের’ পরবর্তীকালে ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ যোগ্য কাণ্ডারীর মতো হাল ধরেছেন। তাঁর লেখা উপন্যাসে বৈচিত্র্যতার জন্য একদিকে যেমন পুরানো ঐতিহ্য ধরা পড়ে তেমনি নতুন ভাব ও ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

তাঁর উপন্যাস নর-নারীর জীবনকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করার স্বাক্ষর বহন করে। ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার আগে ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ অনেকটা সময় পেয়েছেন নিজেকে সঠিকভাবে তৈরি করে নেওয়ার। তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনা ও বিশ্বসাহিত্যের নানাতর ভাব-ভাবনা পর্যবেক্ষণ করে ঔপন্যাসিক হিসেবে নিজস্ব সত্তা প্রকাশ করার অবকাশ পেয়েছিলেন। আর তার সূত্র ধরে তিনি লিখেছেন ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’, ‘চোখের বালি’, ‘চতুরঙ্গ’, ‘যোগাযোগ’, ‘শেষের কবিতা’ ইত্যাদি বিখ্যাত উপন্যাস। যে পরিমানে তাঁর সৃষ্টি সম্ভার তাতে করে কোন ভাবেই সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে একত্রে কোন বিশেষ পর্যায়ে পর্যালোচনা করা তেমনভাবে সম্ভব হবে না। তবু সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক কতটা ও কিভাবে তাঁর উপন্যাসে চিত্রায়িত আছে তারই অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা যেতে পারে আলোচ্য অংশে।

‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে’র লেখা প্রথম আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস হল ‘চোখের বালি’(১৯০৩)। এই উপন্যাস লেখার বহুপূর্বে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেই উপন্যাসে ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের’ প্রভাব লক্ষ করা যায় বলে মনে করা হয়ে থাকে। আর ‘বঙ্কিমচন্দ্রের’ উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপরেখা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তাই প্রথম দিকের ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’ ও ‘রাজষী’ উপন্যাস দুটিকে বাদ দিয়ে ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্ররূপ নির্যাস রূপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে ‘মহেন্দ্র’ ও ‘আশার’ দাম্পত্য সম্পর্কের সূত্রপাত ও পরিণত অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ ঔপন্যাসিক ছত্রে ছত্রে বর্ণনা করেছেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। উপন্যাসের একেবারে শুরুতে ঔপন্যাসিক ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ যে বাক্য দিয়ে শুরু করেছেন

তাতে করে একটি নব-দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রসঙ্গের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ‘মহেন্দ্রের’ সঙ্গে ‘বিনোদিনী’র বিবাহ প্রস্তাবের প্রসঙ্গে উপন্যাসের প্রথম বাক্যে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা পরবর্তী ঘটনাক্রমের দিকে খুব সহজে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাঠক ক্রমানুসারে জানতে পারেন ‘বিনোদিনী’র অন্যত্র বিবাহের কথা এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে কালানুক্রমিক বৈধব্য নিয়ে পিত্রালয়ে ফিরে আসার কথা। তবে ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ দাম্পত্য জীবন ও দাম্পত্য-সমস্যাকে নিয়ে দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল ঘরে তুলতে চাইছেন তা উপন্যাসের সূচনা-লগ্নেই বোঝা যায়। উপন্যাসের সূচনা অংশটি আলোচ্য প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি করে তুলে ধরা হল –“বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষ্মীর কাছে আসিয়া ধন্য দিয়া পড়িল। দুই জনেই এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যকালে একত্র খেলা করিয়াছেন। রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন, ‘বাবা মহিন, গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো সুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে—তোদের আজকালকার পছন্দের সঙ্গে মিলবে’”।^(১৬) মহেন্দ্র তার মায়ের অনুরোধ রাখেনি, তখন সে পণ করেছিল জীবনে কোনদিন বিবাহ করবে না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার মতিভ্রম কেটে যায় বন্ধু বিহারীর জন্য পাত্রী দেখতে গিয়ে। সে বন্ধুর জীবনের কোনরকম তোয়াক্কা না করে, নিজেই পাত্রী পছন্দ করে বসে। এবং প্রায় অনেকটা জোড় করেই ‘আশা’কে বিবাহ করে। অবশ্য ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন তাদের নব-দাম্পত্য জীবন বেশ সুখের হয়ে উঠেছে; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার মধ্যে দেখা যায় অশনি-সংকেত। কারণ তার মা ‘রাজলক্ষ্মী’ মনস্তাত্ত্বিকতার দ্বন্দ্বে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মাতৃ-ঈর্ষায় নববধুকে শিক্ষা দিতে অস্ত্র হিসেবে ‘বিনোদিনী’কে বাড়িতে নিয়ে আসে। একদিকে মাতৃ-ঈর্ষা অন্যদিকে ‘আশা’র অপরিণত মনোভাব ‘মহেন্দ্র’কে ক্রমশ ‘বিনোদিনী’র কাছাকাছি নিয়ে আসে। ঘটনাক্রমে ‘বিনোদিনী’ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে থাকলেও, তার প্রবল ব্যক্তিত্ব ও মনন

বিহারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ‘বিহারী’ তাকে আমল না দিলে পরবর্তীকালে সে ‘মহেন্দ্রে’র প্রতি অনুরক্ত প্রকাশ করে কার্য সিদ্ধি করতে চায়। কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যায়, যখন ‘মহেন্দ্র’ সম্পূর্ণরূপে ‘বিনোদিনীকে’ অধিকার করতে চায়। সে নিজের দাম্পত্য জীবনকে তুচ্ছ করে দূরে সরিয়ে রেখে ডেকে আনে চরম সর্বনাশ।

‘চোখের বালি’ উপন্যাসের অন্যতম চরিত্রদ্বয় ‘মহেন্দ্র’ ও ‘আশার’ দাম্পত্য সম্পর্কের কথাই নানা দৃষ্টিকোন থেকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। আসলে সংঘাত দিয়েই উপন্যাসটির দাম্পত্য সম্পর্কের সূত্রপাত। যেদিন ‘বিহারীর’ জন্য পাত্রী নির্বাচন করতে গিয়ে ‘আশা’র প্রতি ‘মহেন্দ্রে’র মুগ্ধতা প্রকাশ পায়। এবং ‘বিহারী’কে তুচ্ছ মনে করে ‘আশা’কে বিবাহ করে, সেদিনই সংঘাতের বীজ বপন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ‘বিনোদিনী’র আগমনেও নতুন নানারকম সংঘাতের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই সংঘাতের ফলে ‘মহেন্দ্র’ ও ‘আশা’র দাম্পত্য জীবনে তেমন কোন প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়নি। প্রথম যেদিন ‘বিনোদিনী’কে না দেখেই ‘মহেন্দ্র’ বিবাহে অসম্মতি ব্যক্ত করেছিল, সেদিনেই প্রথম অশান্তির বীজ বপন করা হয়েছিল। ‘বিনোদিনী’র বৈধব্য প্রাপ্তির পর ‘আশা’র সংসারে আসলে, পুরাতন সেই বীজকে মহীরুহে পরিণত করতে তার বেশী সময় লাগেনি। এই উপন্যাসে ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ যেভাবে একটি দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন-পর্বের চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন। তা ঔপন্যাসিক ‘বঙ্কিমচন্দ্রের’ লেখা ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু উপন্যাসের শেষে ঔপন্যাসিক যেভাবে চরিত্রগুলিকে নিজের মনের অন্তর্নিহিত শোভনতাবোধ ও আত্মোপলব্ধির দ্বারা সংশোধিত করেছেন তাতে করে শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য সম্পর্কের মান বজায় থেকেছে বলে মনে করা যেতে পারে। ‘মহেন্দ্র’ শেষপর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল ‘বিহারীর’ সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বাভাবিক ভাবে জয়ী হয়েও পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হয়েছে তাকে। কেবলমাত্র আত্মাভিমান বজায়

রাখতে গিয়ে ‘আশার’ সঙ্গে পুতুল খেলার মতো দাম্পত্য সম্পর্কে জড়িয়েছিল, সেকথা বুঝতে পারে মহেন্দ্র। মরীচিকার বাসনায় সে পত্নীপ্রেম বিসর্জন দিয়ে পরনারীর প্রতি আসক্তি বসত দাম্পত্য জীবনে অশান্তি ডেকে নিয়ে আসে। প্রবল ঈর্ষার কারণে বৈধ-অবৈধ উভয় ক্ষেত্রে তার প্রণয়কে মরুভূমির উটপাখির মতো অসহায় করে তুলেছে। প্রবল ঝড়ে বালিতে নিজের মাথা লুকিয়ে রেখে তার বাঁচার প্রচেষ্টা নাস্যাৎ করে দিয়েছে। একমাত্র বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষাই তার প্রেমের সিংহাসন লাভের সোপান হত, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অন্ধ হয়ে দাম্পত্য জীবনের চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছে ‘মহেন্দ্র’। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ আলোচ্য উপন্যাসটিতে অসুখী-দাম্পত্যের চিত্র রচনা করার মধ্য দিয়ে কিভাবে সুখী-দাম্পত্য জীবনের বীজ বপন করা যায় সেই কথাই ব্যক্ত করেছেন। আলোচ্য প্রসঙ্গে ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের’ একটি কথাকে প্রামাণ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তিনি লিখেছেন –

“যাহাকে ভালোবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সুতা ছোট করিও। বাঙ্কিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে”।^(১৭)

‘চোখের বালি’ উপন্যাসেও অনেক বিষময় ফলের জন্ম হয়েছে, কিন্তু সেগুলি ঔপন্যাসিকের বৌদ্ধিক চিন্তার কারণে বৃক্ষে পরিণত হয়ে উঠতে পারেনি। ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের দাম্পত্য সমস্যা ধীর গতিতে সুখী দাম্পত্য জীবনে পরিণত হয়েছে। ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ শুধু দাম্পত্য সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করেছেন, তুলনায় তাঁর রচনায় সমাধানের পথ তেমনভাবে নেই। কিন্তু ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ শুধু সমস্যাকে তুলে ধরে কলম ছেড়ে দেননি, তিনি সমাধানের পথও চিহ্নিত করে তার ফলাফল বিশ্লেষণ করেছেন। ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ যেখানে মৃত্যু দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ সেখানে মৃত্যুকে নয় জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের’ লেখা ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের সূচনায় ‘বিমলার’ আত্মকথার মধ্য দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের বীজমন্ত্র আমরা শুনতে পাই। ‘বিমলা’ স্মরণ করে তার মায়ের কথা, তার মায়ের গায়েররঙ ছিল শ্যামলা, তার দীপ্তি ছিল পুণ্যের। তার রূপ সৌন্দর্যের গর্বকে লজ্জা দিত। ‘বিমলা’ নিজেও তার মায়ের মতো হতে চেয়েছে। সে দেবতার কাছে বর চাইত, যেন মায়ের মতো সতীর যশ পায়। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে বহিরাগত নারীর প্রণয় দেখিয়েছেন। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে বিবাহিত নারীর সঙ্গে বহিরাগত পুরুষের প্রণয় দেখিয়েছেন। অবশ্য এখানে দ্বিমত আছে ‘বিমলার’ সঙ্গে ‘সন্দীপ’র সম্পর্ককে প্রণয় বলার যৌক্তিকতা নিয়ে। আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি যেহেতু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সেদিনের স্বদেশীকতা ও দেশপ্রেম। তাই স্বাভাবিক ভাবে ব্যক্তিপ্রেম সেখানে অনেকটাই নিষ্প্রভ থাকে বলে মনে করা যায়। কিন্তু চরিত্রের আধুনিকতার খাতিরে ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ নারীর চির-পরিচিত ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনীকে এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করছেন। এর আগে ‘বঙ্কিমচন্দ্রের’ ‘বিষবৃক্ষ’, ও ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ অথবা ‘রবীন্দ্রনাথের’ লেখা ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে যেকথা বলা হয়নি, ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে তাই যেন বলার চেষ্টা করলেন ঔপন্যাসিক। ‘বিমলা’, ‘নিখিলেশ’ ও ‘সন্দীপের’ মধ্য দিয়ে ত্রয়ী চরিত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণের সাহায্যে কাহিনী দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। তবে দাম্পত্য জীবনের অন্তিম দৃশ্যে দেখা যায়, স্বাভাবিক শান্ত সংযত ‘নিখিলেশ’ তার পত্নীকে সমস্ত দিক থেকে স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে দেওয়ার পক্ষপাতী। ‘বিমলাও’ নিরুদ্বিগ্নভাবে স্বামীর সঙ্গে সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছিল, কিন্তু হঠাৎ বাধা পেল স্বদেশীকতার মোহে জড়িয়ে গিয়ে। ‘বিমলাকে’ স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টায় ‘সন্দীপ’ একসময় নিজেই তার

প্রেমে পড়ে যায়। আবেগ উন্মত্ত হয়ে সে দেশ সেবকের ছদ্মবেশে ‘বিমলার’ মনে প্রবেশ করে, তাকে অস্ত্রির করে তোলে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার চাতুরী বজায় থাকেনি। ‘নিখিলেশের’ ধৈর্য ও মহানুভবতায় ‘বিমলা’ নিজেই একসময় ভুল বুঝতে পারে। এবং তৎক্ষণাৎ ঘৃণাভরে নিজের ভুল শুধরে নিয়ে স্বামীর আদর্শকে সামনে রেখে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ আলোচ্য উপন্যাসে ‘বিমলা’ ও ‘সন্দীপ’ চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বাদেশীকতার নামে ভণ্ডামিকে নগ্ন করে প্রকাশ করেছেন। অন্য দিকে দুই পুরুষের প্রতি প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে শেষে ‘বিমলার’ নিজেকে চিনতে পাওয়ার মধ্য দিয়ে সঠিক পরশ পাথর বেছে নেওয়ার কথাই বলেছেন। বহু মানুষকে দেখা ও চেনার পর যখন বিমলা নত মস্তকে ‘নিখিলেশের’ কাছে এসে দাঁড়ায়। এবং তারপর যে দাম্পত্য জীবন, তাতে হয়তো নিয়মানুবর্তীতা থাকে কিন্তু তেমনভাবে মননের কোন প্রাণ থাকে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আজও এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি, যা দিয়ে ‘নিখিলেশ’ ও ‘বিমলার’ মতো মানুষের জীবনে আবার পূর্বের মতো ভালোবাসা ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব। উপন্যাস শেষে দেখা যায় ‘নিখিলেশ’ ও ‘বিমলা’ যেন একেবারে পরিশীলিত অন্যরকম মানুষ। তাদের কাছে ভালোবাসা পূজার সমুদ্রে মিশেছে, মিলিত হয়েছে জীবনের নব-আবিষ্কৃত সাগর-সঙ্গমে। একথা বলা যায় যে ভারতীয় ঐতিহ্যকেই লেখক আলোচ্য উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ যেখানে বিবাহিত পুরুষের অন্যান্যরীর প্রতি মুগ্ধতার কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের সংকটের কথা বলেছেন ‘বিষবৃক্ষ’ ও ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসে, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ সেখানে বিবাহিতা নারীর জীবনে অন্যপুরুষের প্রতি আসক্তির কথা বলেছেন ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে। তিনি দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশকে জীবনের বিচিত্র রহস্যের অনিবার্য উপকরণ হিসেবে যেমন দেখলেন, তেমনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারকে অঙ্গীভূত করালেন। একইভাবে বিষয়টিকে কিছুটা

স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে। এই উপন্যাসে কোন তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নয়, ‘মধুসূদন’ ও ‘কুমুদিনীর’ বিবাহিতজীবনে যে সংকট ঘনিয়ে এলো তার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-তন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের সংঘাতে সামাজিক পরিস্থিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ উনিশ বছরের ‘কুমুর’ সঙ্গে পৌঢ় ‘মধুসূদনের’ বিবাহের ফলে দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। ‘মধুসূদন’ ভালোবাসার ডোরে বেঁধে নয়, বাধ্য করে রাখতে চেয়েছে ‘কুমুদিনী’কে। কিন্তু ‘কুমু’ বাধ্যতায় নয় ভালোবাসায় বন্দী হতে চেয়েছে। নিজেদের মানসিক সংঘাত তৃতীয় ব্যক্তির প্রতীকে তাদের দুজনের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসটির স্বতন্ত্রতা এখানেই যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোন তৃতীয় ব্যক্তি না থাকা সত্ত্বেও অসুখী-দাম্পত্য সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার কারণকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’। তিনি জানতেন কেবল তৃতীয়পক্ষের উপস্থিতি কিংবা সামাজিক কোন চাপ নয়, দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক নৈকট্যই সুখী দাম্পত্যজীবনের মূল কথা। মানসিকতায় যদি কোন রকম জটিলতা থাকে তবে কোন রকম যোগাযোগ গড়ে ওঠে না দম্পতিদের মাঝে। এই সমস্ত কারণে তিনি হয়ত প্রেম ও বিবাহকে আলাদা করে ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী। ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে তাই হয়ত তুলে ধরেছেন ঘড়ায় তোলা জল ও দিঘির জলের প্রসঙ্গ।

‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের’ উপন্যাসে প্রাথমিক ভাবে হিন্দু সনাতন ধর্মের প্রেক্ষিতে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ দেখা যায় বলে মনে হয়। তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে হিন্দু রমণীরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সতীত্বের সংস্কারকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। ‘পল্লীসমাজ’ উপন্যাসে ‘রমা’ একসময় ‘রমেশ’র মুখে ‘রানী’ ডাক শুনেও প্রাণপণ নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে। কারণ সে বিধবা, সমকালীন সমাজের প্রেক্ষিতে তার কোন কিছুই প্রতি

ভালোলাগা বা কারো প্রতি প্রণয় থাকতে নেই। বংশানুক্রমে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে ‘জন্মান্তরবাদ’ ও নর-নারীর বিবাহ কেন্দ্রিক নানারকম কুসংস্কার। যার প্রেক্ষিতে সেকালের মানুষের ধারণা ছিল —‘একবার বিবাহ করলে নর-নারী জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়’। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বেও এই ধারণা থেকে কোন মতে হিন্দু বিধবা নারীরা বেরিয়ে আসতে পারেনি। যার ফলে শতগুণা অত্যাচার সহ্য করে সেযুগের নারীকে স্বামী’সংসার করতে হতো; অথবা বিধবা হয়ে সারা জীবন একাকিত্বে কাঁটিয়ে দিতে হতো। নারীদের জীবনের এরকম ভবিতব্যের কথা বেশী করে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’। তবে তিনি কিছুক্ষেত্রে সমাজ গর্হিত নিষিদ্ধ প্রেমকেই জয়যুক্ত করতে চেয়েছেন বলে মনে করা হয়। তাই বোধ হয় ‘সরোজিনীর’ সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশের আগে ‘সতীশ’ ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ‘সাবিত্রীর’ ভালোবাসাকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিংবা ‘কিরণময়ীর’ যে পরিণতি তা দাম্পত্য-সংকট নয়; কেননা তার স্বামী যতদিন জীবিত ছিলেন, সেই অসুস্থ স্বামীর শুশ্রুষায় তার কোন রকম ত্রুটি ছিল না। পরবর্তীকালে ‘উপেন্দ্রের’ প্রতি তার শ্রদ্ধাঘ্রিত প্রেম প্রতিহত হয়ে একসময় ‘দিবাকর’কে আশ্রয় করেছে। একইভাবে দাম্পত্য জীবনের সংকট তীব্রতর হয় ‘অচলা’ ও ‘মহিমের’ ক্ষেত্রে। যখন ‘সুরেশ’ ও ‘মহিমের’ মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন প্রতিযোগী ‘মহিমের’ সঙ্গে ‘অচলার’ বিবাহকেই ঔপন্যাসিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ বলে মনে করেছেন। কিন্তু দেখা গেছে শুধুমাত্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের নিশ্চিদ্র অবস্থানকে অক্ষত রাখা যায় না। তাই হয়তো একসময় ‘মহিম’ ও ‘অচলার’ দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যায়। ‘অচলা’ খেলারপুতুলের মতো একহাত থেকে আর একহাতে ঘুরতে থাকে দুজন পুরুষের মধ্যে। একসময় ‘সুরেশের’ জালে ধরা দিয়ে সমাজ অস্বীকৃত দাম্পত্য জীবনের দায় বহন করতে বাধ্য হয়। অবশ্য শেষে ‘সুরেশের’ মৃত্যু হলে

যন্ত্রণাময় দাম্পত্য সম্পর্কের হাত থেকে রক্ষা পায় ‘অচলা’। ‘গৃহদাহ’ উপন্যাস যেন দাম্পত্যহীন দুজন পুরুষ আর একজন নারীর বিচিত্র জীবনের কাহিনী। কারণ ‘অচলা’ জীবনের চলার পথে হয়তো কখনো দুজন পুরুষের মধ্যে একজনকেও ‘মনের মানুষ’ হিসেবে মেনে নিতে পারেনি।

‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ রচিত বেশীরভাগ উপন্যাসে বিধবা নারী চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তুলনায় সুখী-দাম্পত্য সম্পর্কের কথা তাঁর উপন্যাসে তেমন নেই বললেই চলে। কারণ অসুখী-দাম্পত্যের ফলে নর-নারীর জীবনের কি ভয়ঙ্কর পরিণতি হয়, তাই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বেশীর ভাগ উপন্যাসে। তিনি পল্লীসমাজের মানুষদেরকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের ভিতর মহলের ঘাত-প্রতিঘাত। তাই হয়তো তাঁর উপন্যাসে সমকালীন সমাজের অবহেলিত নারীদের কথাই বেশী করে প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়। যারা শুধু সমাজকে দিয়েছে বিনিময়ে পায়নি কিছুই, যাদের চোখের জলের হিসেব কেউ রাখেনি কোনদিন, তাদের কথাই তিনি লিখেছেন। অবশ্য তিনি বিশ্বাস করতেন ভালোবাসার ও ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমান হওয়া উচিত। তাই আমরা সহজে একটি কথা বলতে পারি, ‘বাঙালী হিন্দু বিধবা নারীর বহুবিধ যন্ত্রণা শরৎচন্দ্রের মনকে গভীর ভাবে ছুঁয়েছিল’। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের তুলনায় তিনি সুখী-দাম্পত্য সম্পর্কে জড়িত চরিত্রের থেকে বিধবা নারী চরিত্র বেশী করে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে ‘রমা’, ‘সাবিত্রী’, ‘কিরণময়ী’, ‘কমললতা’, ‘অপর্ণা’, ‘নীলিমা’, ‘সুরমা’ প্রমুখ চরিত্ররা যেন বাস্তব সমাজজীবনেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। যাদের মধ্যে অনেকেরই খুব অল্পবয়সে দাম্পত্য জীবনের ইতি টানতে হয়েছে; কোন ক্ষেত্রে সামাজিক কারণে নয়তো কখনো দৈবের ঝকুটিতে। অবশ্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ বা কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহের জন্য অসময়ে

নারীদের বৈধব্য বরণ করতে হয়েছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবে ঐকবাক্যে বলা যায় যে, ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ মূলত অসম-দাম্পত্য সম্পর্কের ফলে সমাজে যে পরিণতি সাধিত হয়, সেই কথাই তিনি বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন বলে মনে করা।

‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ ও ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’-এর পরে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ পূর্ববর্তী আরও কয়েকজন পুরুষ-ঔপন্যাসিকের নাম করা যায়, যাঁরা এই ধারার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ‘বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়’, ‘তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়’, ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’, ‘জগদীশ গুপ্ত’ প্রমুখরা সেসময়ের ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক ছিলেন। ‘বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়’ রচিত উপন্যাসে মূলত ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ে বসবাসকারী নর-নারীদের কথাই বিশেষত বর্ণিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে একটি উপন্যাসের বর্ণিত কাহিনী আলোচনা করা যেতে পারে, যেখানে প্রাসঙ্গিক দাম্পত্য সম্পর্কের কথা কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসটির নাম ‘অথৈ জল’, উপন্যাসটির মূল চরিত্র ‘শশাঙ্ক ডাক্তার’। যিনি গ্রামের পৈতৃক সম্পত্তি ও ডাক্তারী পেশার জন্য সুনাম ও পদমর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রামের প্রত্যেকটি সমস্যা ও ছোট-খাটো বিষয়ে দায়িত্ব নিয়ে সমাধান করতে তার তুলনা দ্বিতীয় কেউ নেই। অন্যান্য সব গ্রামের মানুষের মতো এখানেও সবাই নানা সংস্কার-কুসংস্কারের মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে একে-অপরের সঙ্গে নানারকম বিরোধপূর্ণ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। গ্রামে বসবাসকারী ‘রামপ্রসাদ’ ও ‘শান্তির’ অবৈধ সম্পর্কের জন্য দারোগাকে ডেকে এনে সমাধান করে দেন ‘শশাঙ্ক ডাক্তার’। অন্যদিকে ‘হরিদাসের স্ত্রী’র সঙ্গে ‘নিতাইয়ের’ অবৈধ সম্পর্কের জেড়ে উত্তম-মধ্যম দিতেও ডাক্তার পিছপা হননি। আর তাই নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তার মধুর দাম্পত্য

সম্পর্ক বজায় রেখে দিনযাপন করছিলেন। কিন্তু এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ‘শশাঙ্ক ডাক্তারের’ও একদিন পদস্বলন ঘটে, ষোল-সতেরো বছর বয়সের ‘পান্না’ নামে এক কিশোরী বাঈজীর প্রতি মোহের কারণে। যার মোহে পড়ে ডাক্তার নিজের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে দিয়ে, নতুন প্রেমাস্পদকে নিয়ে পালিয়ে যায় কোলকাতায়। বাঈজী ‘পান্না’কে নিয়ে ডাক্তার জীবনের অথৈ জলে সাঁতার কাটার স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজের ডাক্তার হয়ে ওঠা সমাজকেই ভুলে যায়। কিন্তু সমাজের নিয়মের জালে বন্দী হয়ে পড়ে তার স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়। পুলিশ এসে নাবালিকা ‘পান্না’কে তুলে নিয়ে গেলে ডাক্তার জীবনের দুকূল হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। উপন্যাসের শেষ এখানেই, অথৈ জলে ভাসার বাসনায় ডুবে মরা ছাড়া ডাক্তারের আর কোন পথ খোলা ছিল না। পতিতা বৃত্তি, নিষিদ্ধ প্রেম ও লোভ লালসার ছবি ‘বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়’-এর বেশ কয়েকটি উপন্যাসে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি বিবাহিত জীবনের সমান্তরালে একটি রোমান্সের পরিবেশ তৈরি করে শুধুমাত্র ‘অথৈ জল’ উপন্যাসটি লিখেছেন বলে মনে করা হয়।

‘দ্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়’-এর মধ্যে একেবারে ভিন্ন প্রেক্ষিতে কলম ধরেছেন ‘তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়’। তিনি মূলত উপন্যাসে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যন্ত্রসভ্যতা ও কৃষিসভ্যতার মধ্যে বিরোধ তথা গ্রামীণ ও শিল্পাঞ্চলীয় নাগরিক সমাজের বিরোধ। অন্যদিকে জমিদার ও সাধারণ মানুষের সংস্কার ও মূল্যবোধ তিনি যথেষ্টভাবে তাঁর উপন্যাসের পাতায় তুলে ধরেছেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় অর্ধ-শতকেরও বেশী, স্বাভাবিক ভাবে সমস্ত উপন্যাসের বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তাই বহু আলোচিত ‘ধাত্রীদেবতা’ উপন্যাসের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ করে একটা সামগ্রিক রেখাচিত্র অঙ্কন করা যেতে পারে। উপন্যাসের মূল বিষয় হল ‘শিবনাথ’ ও ‘গৌরীর’

দাম্পত্য সম্পর্কের সূচনা ও দীর্ঘ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক পরিণতির লাভ করা। উপন্যাসের শুরুতেই বাল্যকালেই ‘গৌরীর’ বিবাহ হয় ‘শিবনাথের’ সঙ্গে। ‘শিবনাথের’ বড় হওয়ার প্রসঙ্গে যতটা সময় উপন্যাস এগিয়ে গেছে ততক্ষণ ‘গৌরী’ প্রায় নিষ্প্রভ। কালক্রমে ঘটনার ধারাবাহিকতায় ‘গৌরী’ একসময় শিবনাথের বাড়িতে আসে দাম্পত্য জীবন যাপন করার জন্য। দুজনের মধ্যে দিনের আলোর মতো মধুর সম্পর্কের মাত্রা বাড়তে থাকে। কিন্তু এই মধুর সম্পর্কের মাঝেও একসময় অসতর্কতায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ‘শিবনাথের’ জীবনের আদর্শ। সে যেভাবে দেশ ও দেশের মাটিকে জেনেছে বুঝেছে, ‘গৌরীর’ পক্ষে তা কখনো সম্ভব হয়নি। ফলে তাদের মাঝে একসময় দাম্পত্য জীবন যাপনের পদ্ধতির কারণে দূরত্ব তৈরি হয়, এবং শেষটায় ভুল বোঝাবুঝি পর্যন্ত এগিয়ে যায়। কিন্তু উপন্যাসের শেষে দেখা যায় তাদের ভালোবাসার মাঝে শিশুপুত্রকে কেন্দ্র করে সমস্ত বাক-বিতণ্ডার অবসান হয়েছে। এভাবে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিন্নতার মধ্য দিয়ে বহু উপন্যাসে ‘তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়’ প্রমাণ করেছেন— মতানৈক্য মানেই সম্পর্কের শেষ করে ফেলা নয়, মতের সাযুজ্য নিয়ে এসে সমাধান করাই মানবিকতার আসল কথা’। তবে একটি বিষয় তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রে লক্ষ করার মতো, হয়তো তিনিই প্রথম নিম্নবর্ণিত সমাজের মানুষদের দাম্পত্য জীবনের বিশ্লেষণ করেছেন, যা অন্য উপন্যাসিকরা তেমনভাবে উল্লেখ করতে পারেনি বলে মনে করা হয়। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ আলোচ্য প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“বাস্তবিকই উদাসীন গ্রামবাংলার নিরক্ষর মানুষদের মধ্যেও যে সহজাত গভীর জীবনদর্শন, যা বাংলার হাটে মাঠে গঞ্জে চাষাভুষো বাউল বোষ্টম ভিখারী ফকিরের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ছন্দে ধ্বনিত, সেই জীবনদর্শনের ছাপ তারাশঙ্করের রচনায় সর্বত্র প্রতিফলিত। আতরবৌ, পদ্মবৌ, গাঁয়ের বোন স্বর্ণ, ঝুমুর দলের মেয়ে বসন, রীনা ব্রাউন। তারিনী মাঝি, বংশী ডোম, কবিরাল

নিতাইচরণ— এই সব চরিত্রেরা পাঠকের চেনা জগতের না হলেও লেখকের চেনা জগতের। সেই জগৎ থেকে আহরণ করে তিনি তাদের একটি একটি করে ধরে দিয়েছেন পাঠকের সামনে। তারশঙ্করের সাহিত্যে এমনি বহুবিচিত্র চরিত্রের মিছিল”^(১৮)।

আসলে হয়তো ঔপন্যাসিক ‘তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়’ প্রথম ‘কাহার’, ‘ডোম’, ‘সাওতাল’, ‘মালো’ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন যাত্রার চিত্রাঙ্কন করেছেন বলে মনে হয়। আজীবন তিনি যে ‘রাঢ় অঞ্চলে’ বিচরণ করেছেন সেখানকার মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় কাহিনী সুনিপুন ভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, এখানেই ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর সার্থকতা।

‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’ রচিত উপন্যাসে অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের তুলনায় দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল মনস্তত্ত্বের কথা বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসে কোথাও যেন চরিত্রগুলি কোন অদৃশ্য হাতের সুতোর টানে অভিনয় করে মাটির রঙ্গমঞ্চে সৃষ্টি করে ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’, আবার কোথাও নারী পুরুষের ভালোবাসার জটিল পাঠ্যক্রমে তৈরি করে ‘দিবা-রাত্রির কাব্য’। ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে ‘কুসুম’ ও ‘মতির’ নীড়হারা প্রেম ও যাযাবর জীবনের দাম্পত্যের চিত্র অন্যতম অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। ‘কুসুমের’ দাম্পত্য জীবনের সেরকম বিশেষ কোন চিত্র উপন্যাসে তেমনভাবে নেই। কিন্তু পাঠক বুঝে নিতে পারেন বিবাহিত ‘কুসুম’ কিসের আকর্ষণে ‘শশীর’ কাছে এসে দাঁড়ায়। ‘কুসুম’ নিজেকে উজাড় করে দিতে চেয়েছে ‘শশীর’ কাছে। ‘শশী’ সাহস করে সেই ভালোবাসা গ্রহণ করতে না পেরে নিজেকে বঞ্চিত করেছে। আর নিজের কাছেই জবাব দিতে ‘কুসুম’কে বলেছে “তোমার মন নেই কুসুম?”^(১৯)

কেতুপুরের ‘কুবের’ মাঝির মতো গাওদিয়ার ‘শশী’ সাহস দেখাতে পারেনি। আর তাই উপন্যাস শেষে ভুল বুঝে প্রণয় প্রার্থনা করলেও তাকে তিরস্কার করে চলে গেছে প্রণয়ী ‘কুসুম’। সে কোনদিন সেভাবে দাম্পত্য জীবনের সুখ পায়নি, কিন্তু তার চারপাশের অনেক দাম্পত্য জীবনকে সে দেখেছে এবং উপলব্ধি করেছে। হয়তো সেই জন্যই সে শেষপর্যন্ত চিরযুবা হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের’ উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশের মধ্য দিয়ে মানুষের সম্পর্কের নতুন একটা অভিমুখ দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের মতো তিনি তৃতীয় কোন চরিত্রের মৃত্যু ঘটিয়ে অথবা তীর্থবাসী করে পরিণতি সাধন করেননি, অথবা পরিচিত কোন সামাজিক ছকে বেঁধে দেননি। তাঁর মতে কুলষিত সমাজের বাইরে অন্য কোথাও পুরুষ অথবা নারী পাবে তার কাঙ্ক্ষিত নারী অথবা পুরুষকে। তাই হয়তো খুব স্পষ্ট করে তিনি উল্লেখ করেন –“একা কুবের পাড়ি দিতে পারবে না ময়নাদ্বীপে, কপিলাও তার সঙ্গে যাবে”।^(২০) এইরকম দাম্পত্য সম্পর্ক সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক হিসেবে ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের’ বিশেষ সার্থকতা লক্ষ করা যায়।

‘আশাপূর্ণা দেবী’র পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে যেরকম দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্ররূপ পাওয়া যায়, তার বিশ্লেষণে মোটামুটি ভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সমস্ত স্তরের ঔপন্যাসিকরা সমাজ কাঠামোকে গুরুত্ব দিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। কখনো সামাজিক বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সাহস দেখাননি। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত রীতিকেও স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করেছেন। বহুক্ষেত্রে বিধবাবিবাহ দেওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু ঔপন্যাসিকরা কৌশলে তা এড়িয়ে গেছেন। অবশ্য ঔপন্যাসিকরা দাম্পত্য জীবনের নানা সঙ্কটকে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন উপন্যাসে। এখানেই তাঁদের ঔপন্যাসিক সত্তার জয় ঘোষণা করা যায়।

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

তথ্যসূত্র

- ১) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৭
- ২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, সপ্তম সংস্করণ ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৩৪০,
- ৩) ৬ মে তারিখে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র ভবনে সংরক্ষিত।
- ৪) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৯
- ৫) মা, অনুরূপা দেবী, (১৯২০), কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৩
- ৬) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৪
- ৭) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৭
- ৮) নারীর লেখা, অনিলা দেবী, (ছদ্মনাম), যমুনা (ফাল্গুন সংখ্যা) ১৩১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৫
- ৯) একটি পুরনো দিনের কাহিনী, আশাপূর্ণা দেবী, কথাসাহিত্য (১৯৫৭), পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪১
- ১০) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭৫
- ১১) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬২.
- ১২) মেয়েদের কথা মেয়েদের কলমে, সুদক্ষিণা ঘোষ, মৌহারি, কলকাতা-৩২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫
- ১৩) পদ্মরাগ, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ, পৃষ্ঠা-৫৮

- ১৪) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী
প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮১
- ১৫) আশাপূর্ণা দেবী জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা-আশাপূর্ণা দেবী মেমোরিয়াল
কমিটি, আশাপূর্ণার কলমে পুরুষ : নারীর ত্রিবার্ষিক অভিযাত্রা- ড. ছন্দা রায়,
মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৯৩.
- ১৬) চোখের বালি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিকাশ, গ্রন্থভবন, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫
- ১৭) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিষবৃক্ষ, বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র),
বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-২৮৪
- ১৮) শিলীক্ল - আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পাদক- কমল মুখোপাধ্যায়,
ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৩৩.
- ১৯) পুতুল নাচের ইতিকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং,
কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৩.
- ২০) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৭.

<<<<<>>>>>

চতুর্থ অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ

উপন্যাস রচনার জগতে ‘আশাপূর্ণা দেবী’কে সর্বদাই নারী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মধ্যমণি হিসেবে একবাক্যে স্বীকার করে নেওয়া হয়। বলা হয় একবিংশ শতাব্দীতে যেসমস্ত ঔপন্যাসিকরা নারীর সামাজিক স্বাধীনতা ও প্রগতিকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেছেন, তার সূত্রপাত একশত বৎসর পূর্বে শুরু করেছিলেন ‘আশাপূর্ণা দেবী’। আর তাই সহজেই তাঁকে অন্তঃপুরের ভাষ্যকারদের মধ্যে পূর্বজ হিসেবে অভিহিত করতে হয়। শুধুমাত্র নারীকে নিয়েই নয় পুরুষ চরিত্রকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে শক্তির প্রাচুর্য দিয়ে। আর তা থেকেই তিনি সমাজের রুঢ় বাস্তবতাকে সমান তালে সাহিত্যে স্থান দিয়ে নারী পুরুষের বিচিত্র জীবনযাপনকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। তিনি যেসময় লেখালিখি শুরু করেছেন তখনকার দিনের নারীরা জন্ম থেকেই পুরুষের জন্য আত্মবিসর্জিত। এই মর্মে ও সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ। সময়টা তখন উনিশ শতক, গৌরীদানের পুন্য লাভের আশায়, সমাজের মাতব্বরেরা নয়-দশ বছরের কন্যা সন্তানের সঙ্গে বৃদ্ধ কুলীনের বিবাহ দিত। ফলে স্বাভাবিক ভাবে সমাজের বেশীরভাগ ক্ষেত্রে হামেশাই অসুখী বা নষ্ট-দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরি হতে দেখা যেত। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ এই পটভূমি থেকেই সাহিত্য রচনার যাত্রা শুরু করেছিলেন, শেষপর্যন্ত

যেভাবে সংস্কারপন্থী নতুন যুগের মানুষের মনোভাবকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়েছেন, তা তাঁর উপন্যাসের পাতায় একটু চোখ রাখলেই বোঝা যায়।

‘আশাপূর্ণা দেবী’ রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম ‘প্রেম ও প্রয়োজন’। এই উপন্যাসের নামকরণ থেকেই স্বাভাবিক ভাবে বিষয় সম্পর্কে কিছুটা হলেও অনুমান করে নেওয়া যায়। উপন্যাসটির শুরুতেই একদল আড্ডাবাজ যুবকের কথোপকথনের মাধ্যমে একটি চিত্রপট লেখিকা তুলে ধরেছেন, যাদের আড্ডার বিষয় হল, মানুষের জীবনে প্রেম, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন প্রসঙ্গ। আসলে প্রেম না প্রয়োজন কোনটাকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া উচিত, এই প্রসঙ্গেই তারা একে অপরের সঙ্গে মত বিনিময় করছে। আড্ডাবাজদের মধ্যে ‘প্রবীর’ একটু অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান, অন্যদের অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণ মানের। ‘সমর’, ‘অমরেশ’, ‘বিজয় মল্লিক’, ‘কালো গৌরাঙ্গ’ সকলে একদিকে থেকে ‘প্রবীরের’ মতকে খণ্ডন করতে চায়। ‘সমর’ প্রতিনিধিত্ব করে বলে —“তোমার কথা বাদ দাও না, সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছ, দুনিয়ার হালচাল তো কিছু জানলে না; তোমাদের মতো নাড়ুগোপালদেরই বিয়ে করা মানায়। ...আমরা যারা লোহা পিটব, কুলি খাটব, রিকশা টানব, তাদের জন্য বিয়ে নয়”^(১)। খুব সহজেই বোঝা যায় লেখিকা কোন প্রসঙ্গ অবতরণ করার জন্য সূচনাতেই এরকম সংলাপ দিয়েছেন চরিত্রের মুখে। তাঁর উদ্দেশ্য যে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তি ভূমিতে প্রবেশ করা তা বোঝা যায়। কারণ এই বন্ধুদের তর্কসভা থেকে ধীরে অথচ প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে ‘অমরেশ’র বৌদির সংসারে কথা। কারণ অমরেশ’দের বাড়ির রোয়াকে বসেই আড্ডাটা হচ্ছিল, আর হঠাৎ চায়ের প্রসঙ্গে বৌদি ‘আরতির’ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। ‘অমরেশের’ দাদা ‘অখিলেশ’ দীর্ঘদিন অফিসের চাকরি করে সংসারের ঘানি টানছেন। উপন্যাসের শুরুতে

দেখা যায় ‘আরতি’ আর ‘অখিলেশের’ দাম্পত্য জীবনে যেন কোনরকম প্রাণ নেই, যেটুকু সম্পর্ক ও মায়ামমতা আছে তা শুধুমাত্র নিয়মানুবর্তিতার কারণে। একটি শিশুপুত্রকে ঘিরেই ‘আরতির’ বর্তমান জীবনের উদ্দেশ্য ও সমস্ত সখ আহ্লাদ। কারণ ‘অখিলেশ’ ক্রমশ সংসার ত্যাগী উদাসীন সন্ন্যাসী হওয়ার দ্রুত নিজেকে উৎসর্গ করেছে। তাই ‘অখিলেশ’ ও ‘আরতির’ সুস্থ-দাম্পত্য সম্পর্কে ধীর হলেও ফাটল তৈরি হয়ে ক্রমশ তা অসুস্থ-দাম্পত্য সম্পর্কে পরিণত হয়। কারণ কিছুদিন আগে পর্যন্ত ‘অখিলেশ’ যা উপার্জন করত তার সিংহভাগ গুরু প্রণামী দিয়েও সংসার খরচ চালানো যেত। কিন্তু বর্তমানে গুরুর আদেশে সংসারে মোহ ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে গুরুর আদেশে আত্মবিসর্জন করেছে। তার মতে – ‘সংসারে আবদ্ধ থাকলে কখনোই ভালো সাধনা করা হবে না, তাই চাকরি সংসার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে সাধনায় নিমগ্ন হতে হয়’। গুরুর আদেশ পালন করে সে সংসার থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হয়ে সাধনায় নিয়োজিত হয়। তারফলে ‘আরতি’ একমাত্র শিশু সন্তানকে নিয়ে বাকি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরোনে ফাপড়ে পড়ে যায়। কিছু করে ওঠার আগেই তার সন্তানকে অকালে হাঁড়াতে হয় নিয়তির নির্মম পরিহাসে। তার সমস্ত স্বপ্নের বাধা ভেঙে দিয়ে করুণাময় ঈশ্বর করুণা করে শিশুটিকে অকালে নিয়ে যান। ‘আরতির’ জন্য সংসারের বন্ধন থেকে খুলে দেন বিশ্ব নিখিলের দরজা। এবার ‘আরতি’ যেখানে খুশি যেতে পারবে। তার সংসারে টিকে থাকার জন্য শেষ যে বন্ধন, তার একমাত্র সন্তান সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসটিতে ‘আরতি’ আর ‘অখিলেশের’ দাম্পত্য সম্পর্ক বর্ণনার মধ্য দিয়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ দেখিয়েছেন কিভাবে একটি পরিবার ধীরে অথচ নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে প্রবেশ করে সবকিছু তছনছ হয়ে যায়। তাই একমাত্র সন্তান মারা যাওয়ার পর ‘আরতির’ পক্ষে ‘অখিলেশের’ সঙ্গে আর থাকা সম্ভব ছিল না। সে পৃথিবীর বিপদগামী পথে দূরে কোথাও বেরিয়ে পরে হারিয়ে যেতে চায়। লেখিকা খুব সহজেই

‘আরতি’কে একা নিঃসঙ্গ করে বাইরের পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের চাহিদাকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেওয়া। তিনি আসলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন প্রেম থেকে প্রয়োজনের তাগিদে নয় প্রয়োজন থেকে প্রেমের দিকে মানুষের জীবনের আসল যাত্রা। আর তাই তিনি ‘আরতি’কে দীর্ঘদিনের স্বামীর সংসার থেকে বাইরের পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্য প্রতিবেশী ‘প্রবীর’কে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেন। প্রবীর আসে সহানুভূতি দেখাতে, কিন্তু ‘আরতি’ তার কাছে প্রার্থনা করে এই নগ্ন-সংসার থেকে মুক্তির পথে বহুদূরে কোথাও তাকে পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য। অত্যন্ত মানবিক চরিত্র ‘প্রবীর’ দীর্ঘদিন থেকেই ‘আরতির’ কষ্টে-দুঃখে সমব্যথী, তাই পথের সঙ্গী হয়ে একসময় অনুভব করে জীবন সঙ্গীর। তারা দুজনেই বুঝতে পারে প্রয়োজনের তাগিদেই তাদের একসঙ্গে থাকা উচিত। আর তার ফলেই ধীরে অথচ স্পষ্ট করে দুজনের মধ্যে প্রেমের জন্ম হয় এবং সুখী দাম্পত্য জীবনের সূত্রপাত ঘটে। এখানেই কলম থামিয়ে দিয়ে উপন্যাসটি শেষ করেছেন ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’। ‘ড. সঙ্গীতা সাহা’ আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন –

“প্রবীর-আরতির মধ্যে সাধারণ সৌজন্য ও হৃদয়তা থাকলেও প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপেই তাদের জীবনে প্রেম এসেছে। বলা যায় প্রয়োজনের তাগিদেই এই প্রেম। কারণ প্রবীর সহানুভূতির উষ্ণ মানবিক স্পর্শ না পেলে স্বামীর কাছে প্রত্যাখ্যাতা সন্তানশোকে পাথর, পিসিমার বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে গৃহ ত্যাগ করতে পারত না আরতি। অনির্দিষ্টের পথে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে বেরিয়ে পড়ার পরেই মানবিকতার স্পর্শে তাদের জীবনে প্রেম এসেছে। তাই তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন থেকে প্রেমে উত্তরণ ঘটেছে। এযুগের যন্ত্রনাদাক্ষ নারীর জটিল মনস্তত্ত্ব লেখিকা তাঁর কলম গুণে বাস্তবায়িত করেছেন এই উপন্যাসে”।^(২)

উক্ত মন্তব্য আলোচ্য বিষয়ের পরিপন্থী হিসেবে গ্রহণীয়।

অন্যদিকে উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ আর একটি প্রণয়সম্পর্কের কথা আড়াআড়ি ভাবে বলার চেষ্টা করেছেন। ‘মন্দিরা’ ও ‘অমরেশের’ ফল্গুস্রোতের মতো ধীরে সঞ্চারিত প্রেমের পরিণতি হিসেবে দাম্পত্য জীবনের সূত্রপাত উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে ঘটে। কিন্তু প্রথম থেকে উপন্যাসের গতি লাভ করেছে ‘অমরেশের’ দাদা ‘অখিলেশের’ সঙ্গে ‘আরতির’ দাম্পত্য সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। তাই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলির তুলনায় ‘অমরেশ’ ও ‘মন্দিরা’কে কিছুটা নিষ্পত্ত দেখা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে চকিত আলোর উপস্থিতির মতো চরিত্র দুটি যথেষ্ট প্রয়োজনীয়, তার প্রমাণ লেখিকা উপন্যাসের শেষে চমক দিয়ে পাঠককে বুঝিয়ে দেন। যখন দেখা যায় অনেক খোঁজ-খবর করার পর ‘মন্দিরা’ পলাতক ‘অমরেশ’কে শেষপর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে, এবং দীর্ঘদিনের একটা অস্পষ্ট সম্পর্ককে সমাজে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বরমাল্য দিয়ে একে-অপরকে বেঁধে নিয়েছে। তখন হয়তো পাঠক স্মৃতিমহ্ন করে বুঝে নিতে পারবেন ‘অমরেশ’ আর ‘মন্দিরার’ সুপ্ত-প্রণয় সম্পর্কের কথা। কেউ তেমনভাবে না জানলেও ভিতর ভিতর তাদের দুজনের মধ্যে প্রণয়ের গভীরতা ছিল আকর্ষণীয়। কিন্তু পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ‘অমরেশের’ পক্ষে ‘মন্দিরা’কে গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা ও সাহস কোনটাই ছিল না। কারণ ‘মন্দিরা’ পরের ঘরে পালিতা কন্যা, তার নিজস্বতা থাকতে পারে না, এই ছিল ‘অমরেশের’ ভাবনা। সে যখন এই ক্ষুদ্র পরিমণ্ডল থেকে বৃহৎ সমাজে মুক্তির খোঁজে বেরিয়েছিল, তখন মন্দিরাও তার আশ্রিত পিতা-মাতাকে ছেড়ে জন্মদাতা পিতার বাড়ি চলে যায়। খুব অল্পদিনের মধ্যেই ‘মন্দিরা’ বুঝতে পারে তার জীবন ‘অমরেশ’ ছাড়া অসম্পূর্ণ। তাই আবার তাদের দুজনের দেখা হয়, এবং একে-অপরের সঙ্গে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আসলে তাদের মধ্যে যেভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তা হল প্রেম থেকে

প্রয়োজনের দিকে উত্তরণ। এই প্রসঙ্গে সমালোচক ‘অরুণ কুমার বসু’ ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’ তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন—

“‘প্রেম ও প্রয়োজন’ উপন্যাসের এই নাম কি লেখার আগেই ভেবেছিলেন আশাপূর্ণা দেবী? উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই পড়া যায়, পাড়ার রকে বসে প্রবীর, সমর, অমরেশ প্রভৃতি বন্ধুদের আড্ডার বিষয়বস্তু, প্রেম না প্রয়োজন, বিয়ের অনিবার্যতা কার চরম পরিণাম? স্ত্রীকে বিবাহ করে এনে দাসী বানাবার যুগ কি আছে? ...উপন্যাস শেষে লেখিকা দেখিয়ে দিলেন, মন্দিরা ও অমরেশের প্রেম কত নিঃশব্দে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে নীরবে নিজেদের প্রস্তুত করেছে, চাওয়ামাত্রই আকাজ্জক পাত্র হাতে এসে পড়েনি। আর প্রবীর কোনদিন অমরেশের বৌদির সঙ্গে কোন হৃদয় দুর্বলতার কণামাত্রও ঘটার সুযোগ পায়নি বা দেয়নি। কিন্তু যখনই প্রবীর এই নিঃসম্বল সংসার নির্যাতিতা নারীর অজানিত সত্তার বেদনা অনুভব করেছে, তখনই মনে মনে সংকল্প করেছে সুযোগ পেলে তাকে স্বাধীন সুস্থ জীবনযাপনে সাহায্য করবে। ...মন্দিরা-অমরেশের গল্প প্রেম থেকে প্রয়োজনে উত্তরণ, প্রবীর-আরতির গল্প প্রয়োজন থেকে প্রেমে উত্তরণের”।^(৩)

সমালোচক একদিকে যেমন প্রেম থেকে প্রয়োজনের দিকে উত্তরণের প্রসঙ্গে ‘মন্দিরা’ ও ‘অমরেশের’ কথা বলেছেন। অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন থেকে প্রেমের দিকে উত্তরণের জন্য ‘আরতি’ ও ‘প্রবীরের’ কথা বলেছেন। সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়, কারণ ঔপন্যাসিক সচেতন ভাবে চরিত্রগুলিকে উক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে নির্মাণ করেছেন। উপন্যাসের নামকরণের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চরিত্র নির্মাণ করার জন্য ঔপন্যাসিকের কৃতিত্বকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়।

এছাড়াও আর একটি ভিন্নধর্মী দাম্পত্য সম্পর্কের কথা আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। ‘প্রবীরের’ মা-বাবা ‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’ ও ‘যতীন মুখুজ্জের’ মধ্যে যে দাম্পত্য জীবন তুলনায় তা উপন্যাসের অন্যান্যদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি মনোযোগে ও কর্তব্যবোধে ‘জ্যোতির্ময়ী দেবীর’ কোন ত্রুটি ছিল না। সময়ে-অসময়ে তার স্বামীর সঙ্গে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় কোথাও খামতি থাকেনি। বিভিন্ন ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে যতদিন স্বামী জীবিত ছিলেন সুখে-শান্তিতে দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছেন। ‘যতীন মুখুজ্জের’ সঙ্গে তার কথপকথনের একটু অংশ তুলে ধরলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ খুব সচেতন ভাবে চরিত্রদুটিকে সৃষ্টি করেছেন, সংলাপের ক্ষেত্রে সেই সচেতনতাই লক্ষ্যণীয় –

“যতীন মুখুজ্জে বাঁধানো দাঁতে হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—সে কথা একশোবার, ওই তো চোখে জল এসে গেছে। ছি ছি, আচ্ছা পাগল তো! এস এস, কাছে এস।

- কেন, বেশ আছি।
- না বেশ নেই, এস। কেন বুড়ো মানুষকে ওঠাবে?
- কে বলেছে উঠতে।
- বলেছে? বলেছে ওই দুটি ছল ছল চাউনি, ওই রাঙা রাঙা মুখটি।
- হয়েছে, বুড়ো বয়সে আর বাজে বোকো না বেশী।
- বুড়ো আর হতে দিলে কই ছোটরানী! তোমায় দেখলেই তো আমার পঁচিশ বছর বয়স কমে যায়।
- দেখো যেন বার বার দেখ না, কমতে কমতে শেষে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে”^(৪)।

‘জ্যোতির্ময়ী’ হলেন ‘যতীন মুখুজ্জের’ দ্বিতীয় স্ত্রী, তাই তিনি তাকে ছোটবউ বলে ডাকেন। তার প্রথম স্ত্রী ‘অরুণপ্রভা’ বাড়িতে সর্বক্ষণই প্রায় দস্তের সঙ্গে থাকেন। স্বামীর পরিচয়টুকুই শুধুমাত্র নিজের জীবনাচরণের জন্য রেখেছেন, মানসীকতার দিক থেকে তিনি একক ও সাবলীল, শুধু প্রয়োজনের তাগিদে একটা ভালোবাসা শূন্য দ্বিধাহীন সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছেন সামাজিকতার অদৃশ্য বন্ধনে। কোন একসময় কর্তব্যের তাগিদে ‘জ্যোতির্ময়ী’ এই সংসারে আসেন, আর নিজের অজান্তেই একসময় নিজেকে সম্পর্কের বন্ধনে জড়িয়ে ফেলেন। আর সেই থেকে ধীরে ধীরে সংসারের চারপাশে সমস্ত কাজে লিপ্ত হয়ে, নিজেকে বাড়ির পাশে থাকা নিমগ্নাচ্ছন্ন মতো ক্রমশ শিকড় ছড়িয়ে গড়ে তুলেছেন। তার সঙ্গে ‘যতীন মুখুজ্জের’ সম্পর্ক নিয়ে কোনরকম কালির দাগ বসানো যায় না, এককথায় বলতে হয় সুখী-দাম্পত্য জীবন। আজীবন সেই রাশ টেনে টেনে নিজেকে সংসারে নিয়োজিত রেখেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে এই চরিত্রদুটি সৃষ্টি করে ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ একদিকে যেমন মানব চরিত্র বিশ্লেষণে ভিন্নতার পরিচয় দিয়েছেন; অন্যদিকে দাম্পত্য সম্পর্কের নবরূপায়ন করেছেন পুরনো আঙ্গিককে সামনে রেখে।

ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ‘প্রেম ও প্রয়োজন’ উপন্যাসের দাম্পত্য সম্পর্কগুলি ভিন্ন আঙ্গিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আলোচ্য উপন্যাসে নর-নারীর মধ্যে যেভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া ও নতুন করে গড়ে তোলার কথা বলেছেন, তাতে করে মানব জীবনের একটা বিশেষ পর্যায়ের জীবনযাপন প্রসঙ্গে শিক্ষা নেওয়ার প্রসঙ্গ থেকে যায়। ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ এই উপন্যাস রচনা শুরু থেকেই স্বাভাবিক মর্যাদার অধিকারী। কারণ প্রথম উপন্যাসেই লেখিকা মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অল্প-মধুর সময়ের বিভিন্ন আঙ্গিকগুলি চিত্রপটে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে অবশ্যই মানবজীবনের সবথেকে জটিল

সময়কে লেখিকা প্রথম উপন্যাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে স্পর্ধার প্রকাশ দেখিয়েছেন। পূর্ববর্তী উপন্যাসিকরা যেভাবে দাম্পত্য সম্পর্কের বিবরণ ও কাহিনী চিত্রায়িত করার মাধ্যমে সমাধান করেছেন, সেই পথে হেঁটেও উপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ বিশ্লেষণধর্মী নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি একদিকে যেমন দাম্পত্য জীবনে প্রেমের কথা ভালোলাগার প্রসঙ্গ দায়-দায়িত্বের কথা বলেন, তেমনি অন্যদিকে সুখী-দাম্পত্য সম্পর্ক কিভাবে দীর্ঘদিন টিকে থাকবে সেই পথের সন্ধান দেখিয়ে দেন। এখানেই অন্য উপন্যাসিকদের থেকে তিনি স্বতন্ত্র, এবং তাঁর লেখনীর জোড়েই তিনি নিজস্ব সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

দাম্পত্য সম্পর্ক বিশ্লেষণে উপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ রচিত ‘মিতির বাড়ি’ উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একান্নবর্তী পরিবার নিয়ে তাঁর প্রথম ভাবনা চিন্তার প্রকাশ ‘মিতির বাড়ি’ উপন্যাসটির মধ্যে দেখা যায়। পরবর্তীকালে উক্ত বিষয় নিয়ে তিনি প্রচুর উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু রচনাকালের দিক থেকে আলোচ্য উপন্যাসটি প্রথম একান্নবর্তী পরিবারের সঙ্কট ও সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত। উপন্যাসিক নিজেই আলোচ্য বিষয়ের সূত্র উল্লেখ করে উপন্যাসের শুরুতে লিখেছেন —“নানা বয়সের নানা সম্পর্কের মানুষে বাড়ি ঠাসা। প্রত্যহ একবেলাতেই তিন হাঁড়ি ভাত রাঁধা হয়। তিন ঠাঁই নয়—একই হেঁসেলে। পাড়ার আত্মীয় বর্গের বন্ধু আর কুটুম্বগণের আদর্শ দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার”^(৫)। এরকম বহুচরিত্র কেন্দ্রিক একটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে পাঠকের সামনে পরিচয় করিয়ে দিতে উপন্যাসিককে বেশ কয়েকটি অধ্যায় বর্ণনা করতে হয়। যতক্ষণ পাঠক মূল কাহিনীর অন্তরে প্রবেশ করেন ততক্ষণ হয়তো তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাশক্তি কিছুটা হলেও কমে আসবে। কিন্তু কাহিনীর বয়ান দৃঢ় থাকার জন্য একঘেয়ে মনে হয় না।

পাশাপাশি মিত্তির আর ঘোষাল দুটি পরিবারের মানুষগুলির এক —একজন করে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ঘটিয়ে পরিচয় করাতে কিছুটা সময় লাগে। আর তাতে করেই ঘটনার ঘনঘটা ক্রমে ঘনীভূত হয়ে নবরূপে মানব জীবনের একটি ভিন্ন আঙ্গিক ঔপন্যাসিকের কলমে রূপ লাভ করে। ‘মিত্তির বাড়ি’ উপন্যাসের মূল ভিত্তি বাড়ির প্রতিটি সদস্যের নানারকম উত্থান-পতনের কথাকে বিশেষ ভাবে তুলে ধরা। আর তাতে করে স্বাভাবিক ভাবে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলির কথোপকথন ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর তাই মিত্তির বাড়ির সঙ্গে ঘোষাল বাড়ির কথাও ঔপন্যাসিককে তুলে ধরতে হয়, যাতে করে কাহিনীর গতি কোথাও রুদ্ধ হয়ে না যায়।

‘মিত্তির বাড়ি’ উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য দম্পতিদের মধ্যে ‘অরুনেন্দু’ ও ‘অলকা’কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে চিহ্নিত করতে হয়। মিত্তির বাড়ির অন্যতম সদস্য ‘অরুনেন্দু’ একজন ডাক্তার হিসেবে পরিবার ও পাড়ায় একটা আলাদা সম্মান পেয়ে থাকে, কিন্তু সেটাই তার শেষ পরিচয় নয়, মনে প্রাণে সে একজন মনোবিজ্ঞানের গবেষক। ডাক্তারীর কাজ-কর্মের সঙ্গে সে মানুষের মনের বিকারগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে, তার নিজের স্ত্রীও এই গবেষণার একজন অন্যতম পাত্রী। তার স্ত্রীর উপর মনোবিজ্ঞানের বিশেষ পদ্ধতি আরোপ করে গবেষণা করা নিত্য দিনের কাজ। সে দাম্পত্য জীবন বলতে শুধু যৌনজীবন ও সন্তান ধারণ ও প্রতিপালন করাকে মনে করে না। তার কাছে দাম্পত্য জীবন হল নিয়মের বন্ধনে জড়িয়ে থেকে শুধুমাত্র সাংসারিক কাজ-কর্মে সহযোগিতা করা। কিন্তু তার স্ত্রী অলকা তাকে চায় সম্পূর্ণ রক্ত মাংস সহ মানবিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে। তাই ডাক্তার স্বামীকে বেশী সময় ধরে কাছে রাখার ফন্দি করে নিজেই তৈরি করে শরীরের নানা রকম ব্যাধি। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের গবেষক ‘অরুনেন্দু’ নিজের গবেষণার ফলের আশায় অপেক্ষা করে, তাই স্ত্রীকে ঔষধ দিয়ে অজ্ঞান করে রেখে নিজে দূরে থাকার চেষ্টা করে।

সে দেখতে চায় একজন সুস্থ স্বাভাবিক নারীর অনুরূপ একজন পুরুষকে স্বামী হিসেবে কাছে পেয়ে একসঙ্গে থেকে দাম্পত্যের অন্যতম অংশ যৌনতা ও সন্তান সুখ না পেয়ে কিরকম মনোবিকারে আসক্ত হয়। আলোচ্য প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ উল্লেখ করেছেন—“অরুণেন্দু রিসার্চ করিতেছে মনোবিজ্ঞানের। ...সুস্থ সক্ষম যুবতী নারীকে নারীত্ব আর মাতৃত্বের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিলে কি কি প্রতিক্রিয়া হয় তাই লইয়া গবেষণা। ...বৈধব্যের নিরুপায় সংযম নয়, স্বাস্থ্যবান স্বামীর নিকটসান্নিধ্যের মাঝখানে তপ্তশয্যার একাংশে পড়িয়া অর্থহীন উপবাস।...অরুণেন্দু অবশ্য বুঝ দিয়াছে হিতোপদেশের ছদ্মবেশ। ...বলিয়াছে ‘মাতৃত্বের আনন্দ পাইতে গিয়া মিথ্যা কতকগুলো দায়িত্ব বাড়াইয়া লাভ কি—দাম্পত্য সুখের মাঝখানে কষ্টক সৃষ্টি করিতে কে চায়’?”^(৬)

‘অরুণেন্দুর’ নিজের কথার মধ্য দিয়ে, আসলে সে নিজেকেই আড়াল করার চেষ্টা করে। সে চায় না তার স্ত্রী তাকে সম্পূর্ণ রূপে জেনে-বুঝে জীবন যাপন করে চলুক। মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে, সে কিছুস্থানে অমানবিক কর্মে লিপ্ত হয়েছে। সাত পাকে বাঁধা নিজের স্ত্রীর যথার্থ মর্যাদা না দিয়ে, শেষপর্যন্ত একজন মানসিক রোগিতে পরিণত করেছে। অন্যদিকে নিজে বিবাহিত থাকা সত্ত্বেও ‘মীনা’ নামে আর একজন নারীর সঙ্গে নতুন করে প্রণয় সম্পর্কের বন্ধনে জড়িয়ে পরে। ‘মীনার’ সঙ্গে তার সেই সম্পর্কের কোন নাম দেওয়ার পক্ষপাতী সে নয়। তাই ‘মীনা’কে সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করে এককভাবে ফ্লাটবাড়িতে রেখে নারীর মনস্তত্ত্বের আর একটি দিক গবেষণা করেছে। ‘মীনা’ও শুধুমাত্র ভালোলাগার কারণে নিজের চারপাশের পরিজনকে ছেড়ে, স্কুল শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে কিসের নেশায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে পরে। কিন্তু এতকিছুর বিনিময়ে যেটুকু ভালোবাসা সে কামনা করেছিল ‘অরুণেন্দুর’ কাছ থেকে, তার কনট্রাক্টও কোনদিন পাওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ ‘মীনা’ও এমন একজন নারী যে ‘অলকার’ মতো ‘অরুণেন্দু’র গবেষণার একটি অংশ মাত্র।

নিজের দাম্পত্য জীবন যাপনে যেমন ‘অরুণেন্দু’ ব্যর্থ, তেমনি প্রণয়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যর্থতা লক্ষণীয়। আজীবন সে যেরকম বিপরীত স্বভাব চরিত্রের মানুষ খুঁজে বেরিয়েছে, কোন ভাবেই সেই মানুষ আর পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। উপন্যাসে এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মানুষের মনের বিকারগ্রস্ততা ও সমাজের পাংশু বাস্তবতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

‘মিতির বাড়ি’ উপন্যাসের আর একটি দাম্পত্য জীবনের সন্ধান পাই ‘সুরেখা’ ও ‘মনোজের’ মধ্যে। ‘হেমলতা দেবী’কে সামনে রেখে সমস্ত চরিত্রগুলির সম্বন্ধ তৈরি করেছেন ঔপন্যাসিক, সেই হিসেবে ‘হেমলতা দেবীর’ মেয়ের ঘরের নাতি ও নাতবৌ রূপে তারা পরিচিত। মিতির বাড়ির সমস্তরকম সংস্কার ও বিশ্বাসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই দম্পতি নিজেদের জন্য নানাভাবে অবসর সময় বের করে নেয়। শিক্ষার আলোয় উদ্দীপ্ত ‘সুরেখা’ আরো একটু বেশী স্বাধীনতা চায়, তাই বাড়ির বড়দের শাসনের তোয়াক্কা না করে কুসংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে দিনের বেলা স্বামীর সঙ্গে দেখা করে। আরো এক পা এগিয়ে কাউকে না জানিয়ে স্বামীকে রাজি করিয়ে পার্কে যায় লেকচার শুনতে। মেয়েমানুষের বাড়ির বাইরে পা রাখা সেকালের সমাজপতিদের নিয়ম বিরুদ্ধ, তবু সাহসে ভর করে ‘সুরেখা’ স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে নতুন যুগের সূচনা করতে চায়। অবশ্য স্পর্ধা ও নিয়ম ভাঙার খেসারদ তাকে দিতে হয়। সকলের নিন্দা ও তিরস্কার সহ্য করেও সে অন্যায়টাকে মাথাপেতে মেনে নেয়নি, সকলের অনুরোধে সত্ত্বেও কারো কাছে ক্ষমা চায়নি। তার সাহসিকতা যেন যুক্তি ও কর্মের জন্য ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে দেখিয়েছেন। ঔপন্যাসিকের ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসে ‘সত্যবতীর’ মতো প্রতিবাদী চরিত্র তৈরি করার পরিকল্পনা আলোচ্য উপন্যাস লেখা গুরু দিকেই ছিল, কিন্তু সমসাময়িক সামাজিক পরিস্থিতি ও ঔপন্যাসিক-সত্তার কারণে হয়তো তিনি ‘সুরেখা’কে জয়ী

করতে পারেননি। ঔপন্যাসিককে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ লেখার বহু আগে ‘মিতির বাড়ি’ উপন্যাসের ‘সুরেখা’ চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাই ‘সত্যবতীর’ মতো প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কাজ করতে হয়েছে। ‘সুরেখা’ যেভাবে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন একান্নবর্তী পরিবারের মানুষগুলোর চোখের ঠুলি খুলে দিতে চেয়েছে, তা সমকালীন সমাজ পরিস্থিতিতে অবশ্যই স্পর্ধার প্রকাশ ছিল। শেষপর্যন্ত প্রতিবাদী হলে হয়তো ঔপন্যাসিককে অনেক কৈফিয়ত দিতে হত, তাই তিনি কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দেন। যেদিন ‘সুরেখা’ বাড়ির বাইরে লেকচার শুনতে যায়, তার কয়েকদিন পরে মাতৃবিয়োগের কারণে তাকে বাপের বাড়ি চলে যেতে হয়। এবং উপন্যাসের কাহিনী এগিয়ে গেলে ‘অরুণেন্দু’ ও অন্যান্য চরিত্রগুলি দখল করে নেয় রঙ্গমঞ্চ। ‘সুরেখা’কে আর তেমনভাবে গোটা উপন্যাসে কোথাও চোখে পরে না। ঔপন্যাসিক যেন খুব সচেতন ভাবে চরিত্রটিকে বাপের বাড়ির ছলে কাহিনী বৃত্তের বাইরে নিয়ে যান। এবং পাঠকরা স্বাভাবিক ভাবে উপলব্ধি করবেন যে, প্রদীপের মতো দপ করে জ্বলে নিভে যাওয়ার ঘটনার সামঞ্জস্যপূর্ণ ‘সুরেখা’ চরিত্রের প্রতিবাদ, যার পরিণাম উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে প্রথম দিকের উপন্যাস হিসেবে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ অনেক বেশী সাবলীলতা চোখে পরে।

‘অগ্নিপরীক্ষা’ উপন্যাসে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ দাম্পত্য সম্পর্কের আর একটি ভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটিতে ‘তাপসী’ ও ‘বুলু’ নামে দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে দাম্পত্য সম্পর্কের এক ভিন্ন মাত্রা। উপন্যাসের শুরুতেই ‘তাপসীর’ জীবনে হঠাৎ করে নেমে আসে বিপর্যয়। সে তার ঠাকুমা ‘হেমপ্রভা দেবীর’ সঙ্গে কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসে, আর দৈবক্রমে জমিদার ‘কান্তি মুখুজ্জের’ দৌহিত্র ‘বুলুর’ সঙ্গে হঠাৎ পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ঠাকুমা ‘হেমপ্রভা’ তার মা-বাবার কাছে

বিয়ের খবর পাঠানোর কোনও সুযোগই পায়নি। আর সেই কারণে তার মা ‘চিত্রলেখা’ কোন মতে এই বিয়ে মেনে নিতে পারেন না। তিনি শাশুড়ির উপর ভীষণ চটে গিয়ে পুতুলখেলার মতো বিয়েকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেন। অনেক অশান্তি বাক-বিতণ্ডার পরে ‘তাপসীর’ ঠাকুমাও অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে নিজের ভুল মেনে নেয়। এবং সেইসঙ্গে পুত্র-পুত্রবধু, নাতি-নাতনী সকলের সঙ্গে সম্পর্কের ছেদ ঘটিয়ে; পরাজিত সৈনিকের মতো কাশী চলে যান। ‘তাপসী’কে তার মা-বাবা কলকাতা শহরে নিয়ে এসে, সকল প্রকার চেষ্টা করতে থাকে পুতুলখেলার মতো বিয়েকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আধুনিক শহরের চিত্ত-চঞ্চলতার মধ্যে থেকেও ‘তাপসী’ কোনমতে ভুলতে পারে না তার বাল্যবিবাহের কথা, ‘বুলুর’ প্রতিস্মৃতি কোনমতে সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। অন্যদিকে ‘তাপসীর’ মা ‘চিত্রলেখা’ আগ্রাণ চেষ্টা করে চলেন—কলকাতার পরিচিত সমাজে তার মেয়ের বাল্যবিবাহের কথা গোপন রাখতে, এবং তিনি সেই প্রচেষ্টায় সফল হয়ে ওঠেন। এরপর বিলেত ফেরত শিক্ষিত যুবক ‘কিরিটি মুখার্জী’কে নানা অজুহাতে মেয়ের জীবনে নিয়ে আসেন। আলাপ পরিচয় বন্ধুত্ব ও মায়ের চাপে পড়ে ‘তাপসী’ একসময় ‘কিরিটি মুখার্জী’কে বিয়ে করতে রাজি হয়। কিন্তু সব ঠিকঠাক ভাবে চললেও বাগদানের দিন ‘তাপসী’ বুঝতে পারে ‘বুলু’কে ছাড়া আর কাউকে সে জীবনে কোনদিন স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারবে না। তাই কাউকে না বলে পালিয়ে যায় ঠাকুমা ‘হেমপ্রভা দেবীর’ কাছে, মনে প্রাণে সে ‘বুলুর’ সন্ধান করতে থাকে অতীতজীবনের স্মৃতিকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখার জন্য। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা টানটান উত্তেজনায় কাহিনীর মোড় ঘুরে যায়, যখন ‘তাপসী’ জানতে পারে ‘কিরিটি মুখার্জী’ই হল তার বাল্যবিবাহের ‘বুলু’। ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ এখানেই উপন্যাসের কাহিনীর পরিসমাপ্তি সাধন করেছেন। তিনি উপন্যাসটিতে মিলনের প্রতি জোড় দিয়ে নব-দাম্পত্য জীবনের একটি ভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পূর্বে আলোচিত ‘প্রেম

ও প্রয়োজন’ উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও তিনি নামকরণের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাহিনী নির্মাণ করেছেন। অগ্নিসাক্ষী রেখে ‘তাপসী’ ও ‘বুলুর’ বাল্যবিবাহকে তিনি মিথ্যে হয়ে যেতে দেয়নি। শিল্পের সার্থকতাকে মেনে নিয়েও উপন্যাসের মধ্যে দুটি জীবনের সুসামঞ্জস্য পরিণতি দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। যদিও ঘটনাক্রমের বিলম্বিত সময় পাঠককে কিছুটা বিচলিত করে, কিন্তু মানব জীবনের অন্যতম পর্যায় দাম্পত্য সম্পর্কের সুগম সূচনা দেখার জন্য কখনোই পাঠকের ধৈর্যচূতি ঘটে না। দাম্পত্য জীবনের একেবারে ভিন্নধর্মী চিত্র অঙ্কনে ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসে অন্যতম নজীর স্থাপন করেছেন।

‘আশাপূর্ণা দেবী’ ‘অগ্নিপরীক্ষা’ উপন্যাসটিতে একদিকে যেমন প্রাচীন হিন্দু বিবাহ রীতির মর্যাদা রেখেছেন, অন্যদিকে প্রেমিক ও প্রেমিকার প্রকৃত ভালোবাসার কথাও সদর্পে ঘোষণা করেছেন। তিনি ‘রামায়ণের’ অন্যতম নারী চরিত্র ‘সীতার’ মতো করে ‘তাপসী’ চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন। শত বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও সমস্ত রকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, প্রতিষ্কার সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছরের অবসান ঘটিয়ে ‘বুলুর’ সঙ্গে ‘তাপসীর’ মিলন সম্ভব হয়েছে। ঔপন্যাসিক ‘রামায়ণের’ ‘সীতার’ মতোই অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে ‘তাপসী’কে শুদ্ধরূপে প্রতিকায়িত করেছেন। তিনি মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন। ঔপন্যাসিকের সময়কালের যৌথ বাঙালী পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা থাকলেও তার বাহ্যিক প্রকাশ তেমনভাবে ছিল না। পুরুষের ক্ষেত্র ছিল বাইরের জগৎ আর নারীর জগৎ ছিল পরিবারের অন্তঃপুর। কিন্তু নারীর আসল আশ্রয়স্থল চিরন্তন নিয়ম মেনেই ছিল তার স্বামী। ভালোবাসার সঙ্গে নিরাপত্তার মেলবন্ধনে নারী সবচেয়ে বেশী স্বামীর বুকের কাছে আশ্রয় আশা করে। স্বামীও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে স্ত্রীর কাছেই আশ্রয় খুঁজে পায়। নারী-পুরুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য

মেনেই তাঁরা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি পাঠক উপন্যাসের কাহিনীর মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবনকে মিলিয়ে নিয়ে সমান্তরাল ভাবে চলেন। আর তাই হয়তো স্বাভাবিক ভাবে চরিত্রের চরাই উতরাই-এর সঙ্গে বাস্তব জীবনের তত্ত্বের অনুসন্ধানে বেশী ব্রতী হয়ে পড়েন। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচক ‘তপোধীর ভট্টাচার্য’ উক্ত বিষয়ে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—

“প্রতিটি সার্থক পাঠকৃতির

সঙ্গে প্রত্যেক গ্রহিতা পাঠকের যে নিরন্তর দিরালাপ চলছে, তা অনন্য ও অপুনরাবর্তনীয়। কেননা প্রত্যেক পাঠকেই তাঁর নিজস্ব আস্তিত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রত্যয়-লালিত অবস্থান থেকে তাৎপর্যের সন্ধান করেন। তাই তাঁর সন্ধানের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি যুগপৎ অদ্বিতীয় ও নিত্য আপেক্ষিক; চূড়ান্তহীন যাত্রায় তাঁর কেবলই এক সূচনাবিন্দু থেকে অন্য সূচনাবিন্দুতে সরে যাওয়া। স্বভাবত আপাতভাবে উপন্যাসের বয়ান স্থির ও সুনির্দিষ্ট হলেও তার অন্তঃশায়ী নিষ্কর্ষ ও বার্তা চলিষ্ণু ও অনিশ্চিত। এমনকি তাকে অন্তহীন বলেও ভাবা যেতে পারে। কাহিনীর প্রতীয়মান সংরূপে যে-অর্থ বোধগম্য, তা নিতান্তই নির্মোহ হতে পারে। অভিযাত্রী পাঠকেরই দায়িত্ব সেই নির্মোহে প্রতারিত না হওয়া এবং বয়ানের স্তরে স্তরে প্রচ্ছন্ন দ্যোতনার আলোছায়া অনুসরণ করে পাঠকৃতির বহুস্বরিকতার নির্যাস নিঙড়ে নেওয়া। বয়ানের সমস্ত উপকরণেই প্রতীকিতা প্রচ্ছন্ন থাকে, এমন নয়; বাহির ও ভিতরের টানাপোড়েন কখন কীভাবে দ্বিবাচনিকতায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, তা বুঝে নিতে হয় পাঠকেই”^(৭)।

তাই হয়তো ‘অগ্নিপরীক্ষা’ উপন্যাসটি পাঠ করার পর সচেতন পাঠক অনুভব করেন ‘তাপসী’ চরিত্রটির জীবনের দ্বিবাচনিকতাকে। একদিকে তার প্রেমাস্পদ ও অন্যদিকে বাল্যবিবাহের স্বামীর অনুসন্ধান তাকে শেষ পর্যন্ত ঘরছাড়া করে। উপন্যাসিক অবশ্য শেষপর্যন্ত অগ্নিসাক্ষী বিবাহের মান রেখে অগ্নিপরীক্ষায় ‘তাপসী’কে জয়ী করেছেন। উপন্যাসটির সার্থকতার সঙ্গেই একটি সুষ্ঠু-দাম্পত্য

সম্পর্কের সূচনার কথাই ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে উপন্যাসটিতে ‘তাপসীর’ বাবা-মায়ের দাম্পত্য জীবনের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে করে নারীর প্রাধান্যতাই প্রকাশ পেয়েছে। ‘তাপসীর’ মা যত বেশী প্রভাবশালী ও দাপুটে ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে তার বাবা। তাই দাম্পত্য সম্পর্কের চকিত আলোকে ভিন্নতা থাকলেও প্রাধান্যতা তেমন বেশী দেখাননি ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের গোটা বৃত্ত জুড়েই ছিল ‘তাপসী’ ও তার বাল্যবিবাহের সঙ্গী ‘বুলু’। উপন্যাসটিতে তেমনভাবে প্রকৃত দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা নেই, কিন্তু সেই সম্পর্ক ঘনীভূত করে তোলার জন্য যে আবহের প্রয়োজন তার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক। তাই বিবরণে নয় পরিস্থিতির নির্মাণে ‘অগ্নিপরীক্ষা’ উপন্যাসটির কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

‘জীবনস্বাদ’ উপন্যাসটি ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ উৎসর্গ করেছেন শ্রী ‘অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়’কে। উপন্যাসটি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘গ্রন্থভবন’ থেকে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি ঔপন্যাসিকের ছকভাঙা ফর্মে রচিত। যারা ঔপন্যাসিককে রান্না ঘরের লেখিকা বলেন, তাদের যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্যই উক্ত উপন্যাসটি রচনা করেছেন। উপন্যাসটিতে প্রকৃতভাবে জীবনের বিভিন্ন পর্বে ঘটতে থাকা ঘটনার ভিন্নতার সমাহার। কোন মানুষেই তার ফেলে আসা জীবনকে কোন রকমভাবে ভুলে যেতে পারে না। উপন্যাসটিতে পারিবারিক সমস্যা বা নানাতর সামাজিক সংস্কারের কোন বন্ধন নেই। গোটা উপন্যাস জুড়ে একটি ভিন্ন মাত্রার কাহিনী স্থান পেয়েছে। উপন্যাসের নায়ক ‘প্রভাত গোস্বামী’ বদলির চাকরীতে পাঞ্জাবের পাণ্ডববর্জিত এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। সেখানে পরিচিত হয় বাঙালী চাটুজ্জবাবুর সঙ্গে। চাটুজ্জবাবু ও তার ভাঙ্গি ‘মল্লিকা’ একটি কটেজে তার কাতির আপ্যায়ন করে। কিছুদিনের মধ্যে ‘প্রভাত গোস্বামী’ বুঝতে পারে স্থানটি অপরাধের ঘাঁটি।

‘মল্লিকা’কে দিয়েই নানারকম দুশ্চর্যের ফাঁদ পাতা হয়। এরপর মানবিকতার কারণে কিছুদিনের মধ্যে ‘প্রভাত গোস্বামী’ ‘মল্লিকা’কে উদ্ধার করে কোলকাতায় নিয়ে আসে। এবং ঘটনাচক্রে বিবাহের মাধ্যমে তাদের মধ্যে নব দাম্পত্য সম্পর্কের সূচনা হয়। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের প্রথম পর্যায়ে সবকিছুই প্রায় ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ‘মল্লিকার’ মনে হয় একঘেয়ে বিরক্তিকর দাম্পত্য জীবন। সে প্রাণপনে চেষ্টা করে নিজেকে সংযত রাখা, এবং সংস্কার করার। কিন্তু পূর্বের জীবনের স্মৃতি সে কোন ভাবেই ভুলে যেতে পারে না, নানারকম অনুসঙ্গে বারবার সেসব স্মৃতি ফিরে আসে। ঔপন্যাসিক উক্ত প্রসঙ্গে উপন্যাসে উদ্ধৃত করে লিখেছেন –“গভীররাত্রে যখন প্রভাত পড়েছে ঘুমিয়ে, আর প্রভাতদের এই পাড়াটা নিঃস্বপ্ন নিঃসাড় হয়ে যেন ছায়া দৈত্যের মতো ঘাপটি মেরে পড়ে আছে, তখন মল্লিকা বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। জানালার ঠিক নীচটাতাই খানিকটা ঝোপ, তা থেকে কেমন বুনো বুনো গন্ধ আসছে। মল্লিকার মনে হল এ গন্ধ যেন জোলো ভাবপ্রবণতার, সস্তা উচ্ছ্বাসের। আগে, অনেকদিন আগে এমনি করে মাঝরাত্রে উঠে জানালার ধারে কি দাঁড়াত না মল্লিকা? দাঁড়াত বৈকি, দাঁড়াত। কিন্তু সে জানালা খুলতেই এক ঝলক বাতাসের সঙ্গে যে গন্ধ এসে দ্রাণেন্দ্রিয়কে ধাক্কা দিত, সে গন্ধ বনকচু আর আশশ্যাওড়ার নয়। সে গন্ধ যেন অদূরে বিচরণশীল বাঘের গন্ধ। যার মধ্যে ভয়ঙ্কর এক ভয়ের রোমাঞ্চ, উগ্র এক মদের স্বাদ”^(৮)। বনের পাখি যতই পোষ মানাও তার চোখ থাকে ঠিক বনের দিকে। আলোচিত উপন্যাসে মল্লিকার অবস্থাও তাই। তার সুখ দাম্পত্য জীবন ছিল, কিন্তু তার চাইতে তাকে বেশী আকর্ষণ করেছে শৈশবের রঙ করা অবৈধ কাজ। জীবনের ঘটনাবর্তে যে খুব ছোটবেলা মামার হাত ধরে অবৈধ কাজ করতে শিখেছে; তাকে কি দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনে আগলে রাখা যায় ? প্রশ্নের সমাধান করার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’। ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ যেমন করে

‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে কাপালিকের কাছে বড়ো হওয়া ‘কপালকুণ্ডলার’ কথা বলেছেন। ‘কপালকুণ্ডলার’ বড়ো হওয়া, ‘মৃন্ময়ী’ হয়ে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করা। এসব নানাতর ঘটনাবর্তেও ‘কপালকুণ্ডলা’ পরিতৃপ্ত হতে পারেনি। আদিম অরন্য জীবন তাকে ‘নবকুমারের’ শয়ন কক্ষ থেকে বাইরের অন্ধকারে নিয়ে গেছে। ‘জীবন স্বাদ’ উপন্যাসেও প্রতিহিংসা পরায়ণ চাটুজ্জবাবুর দৌলতে ‘মল্লিকা’ পুনঃরায় তার অন্ধকার জীবনে পালিয়ে গেছে। অবশ্য তার জন্য তাকে করতে হয়েছে দীর্ঘ পরিকল্পনা। ‘প্রভাত গোস্বামী’ বুঝতে পারে যে, তার স্ত্রী নিজেই দাম্পত্য নামক বন্ধন মুক্তির জন্য পালিয়ে গেছে। তাই অপহরণের পরে কোনো তদন্ত বা পুলিশি ডাইরী করে না। কারণ জোর করে মানুষের শরীরকে আটকে রাখা যায়; কিন্তু মানুষের মন কে তো কোনভাবেই বন্ধনে রাখা যায় না। তাই মুক্তির মধ্য দিয়েই সমাধান টানার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসটিতে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি মৌলিক চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

‘বৃত্তপথ’ উপন্যাসটি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় ‘আনন্দধারা প্রকাশন’ থেকে। উপন্যাসটির নায়িকা ‘বরুণা’র সঙ্গে ‘জীবনস্বাদ’ উপন্যাসের নায়িকা ‘মল্লিকার’ কিছুটা চারিত্রিক মিল দেখা যায়। ‘জিতু লাহিড়ীর’ স্ত্রী ‘বরুণা’ নিজের স্বৈচ্ছাচারিতা, দান্তিকতা, অর্থের প্রতীকি অহংকারে নিমজ্জিত। কিন্তু দিল্লীর স্বাচ্ছন্দ অভিজাত্য জীবনে ‘জিতু লাহিড়ী’ নিজের স্ত্রীকে বুঝে উঠতে পারেনি। যখন দিল্লী ছেড়ে তেঁতুলগোড়া গ্রামে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করতে আসে, তখন তার স্ত্রীর আসল রূপ প্রকাশিত হয়। পদমর্যাদা ও অর্থের অহংকারের জন্য যে নারী তাকে গ্রহণ করেছে, তাকে নিয়েই প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাকে অনুসরণ করে গ্রামে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু ‘বরুণা’ তেতুলগোড়ায় এসে হাঁপিয়ে ওঠে। ক্রমে স্বামীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে

তার মনটা বিষিয়ে যায়। গ্রামের জীবনাচারণ তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের ভিতকে টলিয়ে দেয়। এরই মাঝে লাহিড়ী বংশের বিধবা মেয়ে ‘সরযু’ লাহিড়ী দাম্পতির সম্পর্কের মাঝে জটিলতার সৃষ্টি করে। তার বাস্তব বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতায় ‘জিতু’ মুগ্ধ হয়। স্বামীর এই অন্য নারীর প্রতি মুগ্ধতা ‘বরুণার’ মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। গ্রামের প্রায় সবাই লাহিড়ী-দম্পতির এই অবস্থায় বিদ্বেষভাব পোষণ করে। শেষপর্যন্ত ‘সরযুর’ পরামর্শে ‘জিতু’ বুঝতে পারে, নিজেকে দরিদ্র মনে করে গ্রামের মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে দারিদ্র্য ভাগাভাগি করে নেওয়া মুখ্যমাত্র। তার চেয়ে দারিদ্র্য মোচনের জন্য রাস্তাঘাট সংস্কার, হাসপাতাল তৈরি ও মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা ও বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান করলে বেশী কাজ হবে। তাতে গ্রামের মানুষের শ্রদ্ধা পাওয়া যাবে ও তাদের সঙ্গে একটা হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কিন্তু এসব থেকে যোজন দূরে থেকে ‘বরুণা’ আত্মহননের মধ্য দিয়ে এই জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু এরই মাঝে একটা দুর্ঘটনা সবার ভিত টলিয়ে দেয়। ‘জিতু’ আর ‘বরুনার’ ছোটোমেয়ে স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তেঁতুলগোড়ায় চলে আসে। আর একটি কন্যাসন্তান জন্ম দিয়ে মারা যায়। দৌহিত্রীকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন আবার নতুন করে শুরু হয়। উপন্যাসটির কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে এইভাবে। এখানে ঔপন্যাসিক একটিমাত্র দাম্পত্য সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে নিয়ে এসেছেন অনন্য প্রসঙ্গ। প্রতিটি উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের এই ভিন্নতা ঔপন্যাসিকের চিন্তা-চেতনাকে পাঠকের কাছে নতুন করে বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

‘অতিক্রান্ত’ উপন্যাসে নারী মনস্তত্ত্বের জহরী ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ত্রিকোণ প্রেমের উল্লেখ করেছেন। শকুন্তলার স্বামী সন্তোষ ও বন্ধু পরাশরের মধ্যে সম্পর্কের বিস্তার। দুইজন পুরুষের সংস্পর্শে এসে শকুন্তলার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে। সন্তোষ ও পরাশরের সহজ সরল বন্ধুত্বের সম্পর্কে

জটিলতা দেখা দেয়। সন্তোষ তার পত্নীর একনিষ্ঠ প্রেমে নিশ্চিত ছিল। কিন্তু ক্রমে তার চোখের সামনে ঘটেছে পত্নীর মানসিক বিবর্তন। পরাশরের প্রেমে উন্মত্তা হয়ে শকুন্তলা সন্তোষের প্রতি বিদ্রুপ করে। পরাশরের মনে দ্বৈত অবস্থান; একদিকে বন্ধুত্বের মান অন্যদিকে প্রিয়তমা শকুন্তলার আহ্বান। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব পড়ে তার শুভবুদ্ধিরই জয় হয়েছে। শকুন্তলাকে ফিরিয়ে দিয়েছে স্বামীর কাছে। দাম্পত্য সম্পর্কের গড়নে কোথাও ঔপন্যাসিক দুর্বলতা দেখাননি। তিনি পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের মতো ত্রিকোণ সম্পর্ক সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য জীবনের সুখকেই বড় করে দেখিয়েছেন।

‘আশাপূর্ণা দেবী’র ‘ছাড়পত্র’ উপন্যাসটি দাম্পত্য সম্পর্কের অন্যতম আখ্যান। একটি সহজ সরল প্রেমের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলিকে সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসের কাহিনীতে নারী-পুরুষের ভালোবাসার গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। নায়ক-নায়িকার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলেও ভালোবাসার বন্ধনের ছাড়পত্র হয়নি। ডিভোর্সের ফলে সাময়িক বিচ্ছেদের কারণে একে-অপরের অপরিহার্যতার কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। তাই দেখা যায় আবার নতুন করে তার ঘর বেঁধেছে ভালোবাসার বন্ধনে। সৌরেশ ও সুচেতার এই মর্মবিদারক কাহিনী বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার দাবি রাখে। কারণ দাম্পত্য জীবন নিয়ে এই বিশ্লেষণ ও মনোভঙ্গি চিরকাল গ্রহণীয়।

প্রায় সমধর্মী কাহিনীর উপন্যাস ‘সমুদ্র নীল আকাশ নীল’। সদ্যবিবাহিত শ্রাবণীর স্বামী বিশ্বমোহন হঠাৎ মারা গেলে শ্বশুর বিধবা বৌমার পুনর্বিবাহের সংকল্প করে। শ্রাবণী এই অবস্থার বিরোধীতা ও স্বীকার কোনটাই করতে পারে না। প্রথম দিকে চন্দ্রাপীড় নামে এক পুরুষ তারপর ডা. নির্জন সোম তার জীবনে আসে। প্রথমজন ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হলেও পরের জন প্রেমিক

হিসেবে বিবেচিত হয়। আর উপন্যাসের কাহিনীর পরিণতিতে নিকষিত হেমের মতো প্রেমকে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক। কাহিনী স্বতন্ত্রতায় ঔপন্যাসিকের এই কৃতিত্ব মেনে নিতেই হয়।

‘নেপথ্য নায়িকা’ উপন্যাসেও একই ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনকে গুরুত্ব দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের নায়িকা চরিত্র মাধবীর বিবাহ বিচ্ছেদের দীর্ঘ বেদনার প্রকাশ লক্ষণীয়। স্নেহের ছোটবোন রুবির গভীর প্রেম তার একাকীত্ব জীবনে আবার দাম্পত্য জীবনের সুখ পেতে আগ্রহী করেছে। আর কাহিনীর অগ্রগতির মাধ্যমে তার দীর্ঘ বিড়ম্বিত বিচ্ছিন্ন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সে জীবনযুদ্ধ থেকে পালিয়ে না গিয়ে স্বামীর মতের পক্ষে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায়। এরকম দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা ‘আশাপূর্ণা দেবী’র পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকরা তেমন করতে পারেননি। তাঁদের রচিত উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের অসম্পূর্ণতা যেন অনেকটাই লেখিকা পূর্ণ করেছেন। রবীন্দ্র পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ দাম্পত্য সম্পর্কের সুষ্ঠু রূপায়ণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি নিজেই যেমন কতী তেমনি দ্রষ্টার কাছেও সেই ভার অর্পণ করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণঃ

‘আশাপূর্ণা দেবীর’ রচিত সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে উপন্যাস ত্রয়ী হিসেবে বিখ্যাত ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘সুবর্ণলতা’ ও ‘বকুলকথা’। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই উপন্যাস ত্রয়ী আলাদা করে স্থান দখল করেছে। উপন্যাস ত্রয়ীর কাহিনী, চরিত্র ও প্লট সমস্ত দিক থেকে যেকোন জনপ্রিয় উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ উল্লেখ্য ত্রয়ী উপন্যাসের মধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্কের নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে

নিজস্ব উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেছেন। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, পরবর্তী সময় ‘সুবর্ণলতা’ ও ‘বকুলকথা’ উপন্যাসে তা সমাধান করেছেন। বিশেষত সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে তিনি ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনীর বুনট তৈরি করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই মন্তব্য করেছেন—

“আপত দৃষ্টিতে ‘সুবর্ণলতা’ একটি জীবন কাহিনী, কিন্তু সেইটুকু এই গ্রন্থের শেষ কথা নয়। ‘সুবর্ণলতা’ একটি বিশেষ কালের আলেখ্য। যে কাল সদ্যবিগত, যে কাল হয়তো বা আজও সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে। ‘সুবর্ণলতা’ সেই বন্ধন জর্জরিতকালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক।...আমার ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ গ্রন্থের সঙ্গে এর একটি যোগসূত্র আছে। যে যোগসূত্র কাহিনীর প্রয়োজনে নয়, একটি ভাবকে পরবর্তীকালের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে। সমাজ বিজ্ঞানীরা লিখে রাখেন সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস, আমি একটি কাহিনীর মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কনের চেষ্টা করেছি মাত্র”।^(৯)

‘আশাপূর্ণা দেবীর’ এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ত্রয়ী উপন্যাসের মধ্যে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের কথা জানতে পাই। অন্যদিকে ‘ট্রিলজি’ উপন্যাস নিয়ে বিখ্যাত সমালোচক ‘অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়’ প্রায় নির্দিষ্ট সময়কে ধরার জন্য সন-তারিখ উল্লেখ করে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ ত্রয়ী উপন্যাসের ঐতিহাসিক সত্যতার কথা বলেছেন। তিনি ‘বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি’ গ্রন্থে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ ‘ত্রয়ী উপন্যাস’ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আলোচ্য প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“এই তিনটি উপন্যাসের কালপরিধি বিস্তারিত। এই পরিধির একটা হিসেব করা যেতে পারে। প্রথম উপন্যাসের সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিন্দু অতিক্রান্ত সময়। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতির’ নায়িকা সত্যবতী যখন কোলকাতায় এলো

তখন কোলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হয়ে গেছে। কোলকাতায় আসার পূর্বেই তার দুটি সন্তানের জন্ম হয়। কোলকাতায় আসার পর জন্ম হয় তৃতীয় সন্তানের। তখনকার দিনে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিবাহ হয়ে যেত। দুই সন্তানের জননী সত্যবতী যখন কোলকাতায় আসে তখন তার বয়স কুড়ির নীচে। কোলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলতে শুরু করে ১৮৮০ সালে। তাহলে সত্যবতীর জন্ম অন্তত ১৮৬০ সালে”।^(১০)

কথাসাহিত্যের সমালোচকরা মনে করেন উপন্যাসের চরিত্ররা মূলত ঔপন্যাসিকের কল্পনায় সৃষ্টি ও বিকশিত হয়। তাই ‘সত্যবতীর’ জন্ম কোন সময়ে, তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি না করে, কোন সময়কালের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচনা করা হয়েছে, তাই বিবেচনা করা উচিত। মোটকথা ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝপর্বের বিশেষ সময়কালের প্রেক্ষিতে ‘ত্রয়ী উপন্যাস’ রচনা করেছেন, সেকথা পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে প্রমাণিত। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের শুরুতেই ‘সত্যবতীর’ যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে করে বোঝা যায় যে তার দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছে মাত্র সাত বছর বয়সে। অবশ্য বিবাহের পরেও কিছুদিন তাকে পিতৃগৃহে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন তার পিতা। তার পরিচয় দিতে গিয়ে উপন্যাসের প্রথমপর্বে ঔপন্যাসিক লিখেছেন – “নাকে নোলক, কানে সারা মাকড়ি, পায়ে ঝাঁঝা মল, বৃন্দাবনী ছাপের আট হাতি শাড়ি পড়া আট বছরের সত্যবতী। বিয়ে হয়ে গেছে বছরখানেক আগে। এখনও ঘরবসত হয়নি। সত্যবতী তার বাবা রামকালী চাটুয্যের প্রথম সন্তান”।^(১১)

‘সত্যবতীর’ বাবা ‘রামকালী’ সেইযুগের নিয়মের কাছে মাথা নত করে একমাত্র কন্যাকে গৌরীদানের জাঁতাকলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। আর যতই নিজের কাছে কন্যাকে রাখতে চান না কেন, শ্বশুরবাড়ির চাপে ‘সত্যবতী’কে নয়বছর বয়সেই শ্বশুরালয়ে পাঠাতে হয়। আর সেই কারণে ‘সত্যবতীর’ জীবন হয়ে পড়ে জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়ার অবস্থার মতো। কারণ চিরকাল নিজের পিতার কাছে সে

যেভাবে অবাধ স্বাধীনতা ও প্রশ্রয় পেয়েছে, যেভাবে সে চারপাশের উন্মুক্ত সমাজে মানুষ হয়ে উঠছে, তুলনায় তার স্বামী ‘নবকুমার’ ও শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ অনেকটাই নিষ্প্রভ। ‘ড. অনন্যা বড়ুয়া’ এই প্রসঙ্গে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি বিশ্লেষণ’ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—“সংসার জীবনে স্বামী নবকুমারকে নিয়ে সত্যবতীর কোন ক্ষোভ ছিল না”^(১২)। উক্ত মন্তব্যকে আমরা যথাযথ বলে মেনে নিতে পারি না। সত্যবতীর মনে হয়েছে ‘নবকুমার’ যেভাবে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, তা যেমন আদর্শ স্বামীর কাজ নয়। আসলে সে চায় সমস্তক্ষেত্রে নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করে জয়ী হতে, আর সেই কাজে একমাত্র সঙ্গী হোক তার স্বামী। কিন্তু আদতে তা কোন দিন হয়নি। আমরা দেখি তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম থেকেই ‘সত্যবতী’কে একটি প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে। সাংসারিক কুসংস্কার ও শোষণের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ, ভাবীযুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে যেমন সে গড়ে তুলেছে, তেমনি নিজের পরবর্তী প্রজন্মকেও গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুস্থানে তাকে বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে নানাভাবে। কেননা ‘নবকুমার’ জীবন-যাপনের সমস্তক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে তাকে ঠিক ঠিক বুঝতেই পরতো না। ‘নবকুমার’ যখন স্ত্রীর উপর তার মায়ের অকথ্য অত্যাচার দেখে শ্বশুর মশাইকে চিঠি লিখে জানায়, তখন তার এই কাজের জন্য ‘সত্যবতী’ তাকে ধিক্কার দিয়ে সংসার ধর্ম কাকে বলে তা শিখিয়ে দিতে চায়। কারণ তার পিতার কাছে খবর পাঠানোর জন্য একদিকে যেমন শ্বশুরবাড়ির লোকজন বিরক্ত হয়েছে; অন্যদিকে তার পিতার দুশ্চিন্তা বেড়েছে এবং অহেতুক পরিশ্রম করে মেয়েকে দেখতে এসেছেন। সঠিকভাবে দাম্পত্য জীবন-যাপন করাটাই তার কাছে একটা সংগ্রাম, আর সেই সংগ্রামে সে জয়ী হতে চায়। সে তার বাবাকে বুঝিয়ে দেয় সবকিছু মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তার আছে। “পিতল কাসার ঘটিটা-বাটিটা একত্রে রাখলে মধ্যে মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগে বাবা, আর এতো জলজ্যান্ত মানুষ। একেবারে টোকাঠুকি লাগে না, লাগবে না, একথা কি

জোর করে বলা যায় ? তবে একটু বিশেষ মেয়ের প্রতি রেখো বাবা, কোন অন্যায় সে করবেও না, সহিবেও না^(১৩)।’’ এই বলে সে তার নিজের এবং শাশুড়ির সম্পর্ককে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। এবং সেইসঙ্গে এই বলে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি এমন কোন কাজ করবেন না যাতে করে তার পিতার মানসম্মান মাটিতে মিশে যায়। তাই হয়তো শাশুড়ির শত অত্যাচারের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত না হয়ে মৃদু প্রতিবাদের মাধ্যমে ও নিজস্ব প্রতিভায় সবকিছুকে আয়ত্তে নিয়ে আসে। তারপরে অবশ্য সে একসময় অনুভব করে বারুইপুরে শ্বশুরবাড়িতে যতই কাজ করুক না কেন; তার মনের কোন মুক্তি ঘটবে না কোনদিন। তাই নিশ্চিত মুক্তির আশায় নিজের পরিবার নিয়ে কোলকাতায় পাড়ি দেয়। সমালোচক ‘অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়’ জানিয়েছেন—

“মুক্তি ঘটল যখন সে কলকাতায় গেল, স্বামী নবকুমার (ইংরেজী জানা যুবক) কলকাতায় চাকরি করতে এলো। শ্বশুর-শাশুড়ির সমস্ত বাধা ঠেলে সে চলে এলো। দুই ছেলে আর স্বামীকে নিয়ে সে এতদিনে আত্মনির্ভর হল। প্রতি-পদে অধীনতা থেকে মুক্তি পেল। এমনকি স্বামীর মাস্টারমশায় ভবতোষবাবুর সঙ্গে সামনাসামনি কথাবলার অধিকার অর্জন করল”।^(১৪)

সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ‘সত্যবতী’ নিজেই কিছুটা এগিয়ে চলতো। যেসময় মেয়েদের গণ্ডীবদ্ধ জীবনে নানা কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হত, দাম্পত্য জীবনে স্বামীর সেবাদাসী হয়ে থাকতে হত, সেইসময় ঔপন্যাসিক নিজের প্রচেষ্টায় মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার কথা বলেছেন। আসলে নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে সেইসময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ অবদান অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের থেকে এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয়। সমালোচক ও প্রাবন্ধিক ‘শর্বাণী বিশ্বাস রায়চৌধুরী’ মন্তব্য করেছেন—

“উনবিংশ শতকের নারীমুক্তি আন্দোলনের যে-টেউ শিক্ষিত মানসে দানা বেঁধেছিল, তার প্রতিফলন যদি পুরুষ-লেখকের লেখায় লক্ষ করা যায় তা

হলে দেখা যাবে শিক্ষিত পুরুষ তাঁর সৃষ্ট নারী-চরিত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করেছিল শিক্ষিত সঙ্গিনীর। ‘মধুসূদনের’ সৃষ্ট নারী-চরিত্র থেকে বঙ্কিম হয়ে ‘রবীন্দ্রনাথের’ নারী-চরিত্ররা আপন পরিসর সম্পর্কে সচেতন ছিল। যেমন ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের চিত্রাঙ্গদার রাবণের উদ্দেশ্যে সেই অমোঘ বাক্য, ‘হায় নাথ, নিজ কর্মফলে মজালে রাক্ষসকূলে, মজিলা আপনি’ থেকে শুরু করে ‘কপালকুণ্ডলার’ নির্দিষ্ট পরিসর সন্ধান ‘যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসিত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না’। আবার ‘রবীন্দ্র’ উপন্যাসে, ‘কুমুদিনীর’ আত্মোপলব্ধি, ‘এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোয়ানো যায় না’। এই আত্মানুসন্ধান ছিল অকপটতার দর্পণে নারী-পরিসর আবিষ্কারের দুর্মর চেষ্টা। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ‘সত্যবতী’ চরিত্রের মধ্যে তুলে ধরেছেন নারীর নিজেকে বারবার ভাঙচুর করে নিজস্ব পরিসর অনুসন্ধান করার মধ্য দিয়ে। এবং সেই পরিসরকে বিনির্মাণ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে ‘সত্যবতীর সময়ের সঙ্গে নিজেকে তুলে ধরেছেন প্রতিস্পর্শী চরিত্র হিসেবে। সামাজিক বিধি-বিন্যাস-কে প্রশ্নে প্রশ্নে বিদ্ধ করে তুলে ধরেছে মুখোশের অন্তরালের মুখশ্রীকে’।^(১৫)

‘সত্যবতী’ নিজে যেমন অবকাশ খুঁজে নিয়েছে নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের জন্য, তেমনি স্বামীকেও সেই অবকাশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ‘নবকুমার’ সেই অবকাশের সঠিক ব্যবহার করতে পারেনি। ‘সত্যবতীর’ সঙ্গে একসাথে পথচলা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, পিছুটান ও যুগযন্ত্রণা তাকে আড়ষ্ট করে রেখেছে। তাই সন্তানের পিতা হলেও সন্তানের জীবনের মান সঠিক ভাবে বজায় রাখতে পারেনি। ‘সত্যবতী’ যা কিছু মনে-প্রাণে চেয়েছিল, তারমধ্যে নিজের জীবনের সমস্ত স্বপ্ন আশা-আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতাকে নিজের সন্তানের মাধ্যমে পূর্ণ করার ইচ্ছা’, তা একমাত্র তার অপদার্থ স্বামীর জন্য সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার জন্য ‘সত্যবতী’ ক্ষোভের থেকে দুঃখ পেয়েছে বেশী। তাই হয়তো তার শেষ খেদোক্তি—“মানুষ হওয়ার মালমশলা দিয়ে জন্ম নিলে সুবর্ণ ঠিকই মানুষ

হবে’^(১৬)। অবশ্য আমরা ‘সত্যবতী’ ও ‘নবকুমারের’ দাম্পত্য সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে স্বাভাবিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনের আড়ালে সর্বদাই বর্ষার কালো মেঘের মতো ঘনীভূত হয়ে উঠতো মনোমালিন্যের বিদেহ। আর তাই সুস্থ সুখী দাম্পত্য সম্পর্ক না বলে অন্য কিছু বললে হয়তো অত্যাুক্তি করা হবে না।

‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শুধুমাত্র ‘সত্যবতী’ ও ‘নবকুমারের’ দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা শুধু নয়, আরো কয়েকটি ভিন্ন প্রকৃতির দাম্পত্য জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের সমস্ত দম্পতিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিম্ন লিখিত ভাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

এক নং দাম্পত্য জীবন

দম্পতির নাম	দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃতি
সত্যবতী ও নবকুমার	নিজরদের মধ্যে ঠুনকো বিশ্বাস ও অসামঞ্জস্য পূর্ণ মতাবিরোধের কারণে অসুখী ও মানিয়ে নিয়ে চলা দাম্পত্য জীবন।

দুই নং দাম্পত্য জীবন

দম্পতির নাম	দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃতি
ভুবনেশ্বরী ও রামকালী	দুজনে একে অপরের পরিপূরক ও সুখী, কিন্তু চিরকাল সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হত। স্বাভাবিক হলেও ‘রামকালীর’ হঠকারী সিদ্ধান্ত, দম্ভের কারণে কিছুটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হতো ‘ভুবনেশ্বরী’কে। তাই স্বাভাবিক ভাবে বলা যায় তাদের দুজনের মধ্যে দূরত্ব থাকা নিয়মমাফিক দাম্পত্য জীবন।

তিন নং দাম্পত্য জীবন

দম্পতির নাম	দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃতি
এলোকেশী ও নিলাম্বর	নিজেদের মধ্যে বিবেক বোধ বিসর্জন দিয়ে অস্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করেছে। তাদের মধ্যে মেনে নেওয়ার রীতি ছিল, কোনরকম শ্রদ্ধা-ভালোবাসা তেমন ভাবে ছিল না।

চার নং দাম্পত্য জীবন

দম্পতির নাম	দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃতি
সুহাসিনী ও ভবতোষ	মর্যাদাসম্পন্ন শ্রদ্ধা-ভক্তিবৃত্ত সুখী-দাম্পত্য জীবন। তাদের দুজনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ও পড়াশুনা করার শিক্ষা নিজে থেকেই শ্রদ্ধা ভালোবাসার জন্ম দিয়েছে।

পাঁচ নং দাম্পত্য জীবন

দম্পতির নাম	দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃতি
ভাবিনী ও নিতাই	সুখী সামঞ্জস্যপূর্ণ বিরোধহীন দাম্পত্য জীবন। তাদের দুজনের মধ্যে তেমন কোন বিরোধ নেই, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা মানানসই জীবনযাপন।

ছয় নং দাম্পত্য জীবন

দম্পতির নাম	দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃতি
জটা ও জটার বৌ	অসুখী কলহপূর্ণ দাম্পত্য জীবন। সবচেয়ে বড় কথা তাদের দুজনের মধ্যে কোনরকম মতের মিল ছিল না।

সাত নং দাম্পত্য জীবন

দম্পতির নাম	দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃতি
সারদা ও রাসু	সমাজের স্রোতে নিয়মমাফিক চলা, সামাজিক কুসংস্কারে আবদ্ধ দাম্পত্য জীবন।

ঔপন্যাসিক প্রত্যেকটি দাম্পত্য জীবন ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা দিয়ে তৈরি করেছেন। ‘সত্যবতী’ ও ‘নবকুমারের’ দাম্পত্য জীবনে নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ থেকেও সংস্কার সাধনে নিরলস প্রচেষ্টার পরেও, শেষপর্যন্ত কোনরকম মনের বন্ধন তৈরি হয়নি। ‘সত্যবতীর’ পিতা-মাতার ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন রকম পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়, ‘ভুবনেশ্বরী’ দেবীর সঙ্গে কোনদিন কোন ব্যাপারে বিরোধ ছিল না ‘রামকালী চাটুয্যের’। কিন্তু ‘ভুবনেশ্বরী দেবীর’ স্বামীর প্রতি যেমন ছিল শ্রদ্ধা তেমনি ছিল ভয়, তাই সংসারচক্রে আবদ্ধ রামকালীর কোনদিন তেমন ভাবে স্ত্রীর চাওয়া-পাওয়ার দিকে নজর দেওয়া সম্ভব ছিল না। ‘ভুবনেশ্বরী’ও সংসারের নানা রকম কুসংস্কারের মোড়কে আবদ্ধ থেকে সর্বদা নিজেকে স্বামীর কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে রেখেছে। মনের মিল হয়তো ছিল, কিন্তু সেই মনের মিলনের অবকাশ তেমন ভাবে ছিল না। তাই হয়তো ‘ভুবনেশ্বরী’ পরলোক গমন করার পরে ঔপন্যাসিক আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নির্যাস তুলে ধরে লিখেছেন —“সেই ছোটোখাটো মানুষটা, যাকে রামকালী কোনদিন পুরো একটা মানুষ বলে গণ্য করেনি, সে যে দৃঢ় কঠিন রামকালীর ভিতরের এতটা শক্তি হরণ করে ফেলবে, এ রামকালীর ধারণার মধ্যে ছিল না। ...ভুবনেশ্বরী সম্পর্কে যেন তাঁর একটা বাৎসল্যমিশ্রিত প্রীতি ছিল, জীবনের কোন আদর্শে, কোন চিন্তায়, কোন সুখ-দুঃখে তাকে ডাক দেননি। আজ মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ বিচার করেননি রামকালী স্ত্রীর উপর। চিরদিন যাকে ছোট ভেবে এসেছেন, সে হয়তো সামান্য নয়। রামকালী যদি

তাকে স্নেহের সঙ্গে কিছু শ্রদ্ধা দিয়ে হৃদয়ের সহধর্মিণী করে তুলতে পারতেন, হয়তো সারাটা জীবন এতখানি নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতেন না”^(১৭)। ঔপন্যাসিকের উক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই আমরা আলোচ্য দম্পতিদ্বয়ের দাম্পত্য জীবনের একটা সম্পূর্ণ রেখাচিত্র অঙ্কন করতে পারি। সেখানে সুখ আছে, শান্তি আছে, স্বীকৃতি আছে, নিরাপত্তা আছে, কিছুটা ভালোবাসা আছে, কিন্তু সম্মান, শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নেই। অন্যদিকে ‘নবকুমারের’ মা ‘এলোকেশী দেবী’ ও ‘নিলাম্বর বাডুয়ের’ দাম্পত্য সম্পর্ক তুলনায় একেবারে ভিন্ন মাত্রার। আমরা খুব সচেতন ভাবে লক্ষ্য করি, যে নারী নিজের ছেলের বৌয়ের ঘারে খুব সহজে কিল চর মারতে পারে, স্বভাবে রণরঙ্গিনী। তিনিই আবার খুব সহজে মানিয়ে নিয়ে চলেন স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতা। মেনে নেন পুত্রের বিবাহের পরেও রোজরাতে স্বামী ‘নিলাম্বর বাডুয়ের’ উল্লাস বাগদিনীর কাছে যাওয়া। আসলে ‘এলোকেশী’ সত্যের জায়গায়, আদর্শের জায়গায় কোনদিন প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু নরম মনের ভেবে ‘সত্যবতীর’ উপর যথেষ্ট ভাবে অত্যাচার করেছে। উপন্যাসের এই দম্পতিদ্বয়কে কুপথে রেখে ঔপন্যাসিক সুপথের সন্ধান দিয়েছেন। তাই হয়তো উপন্যাসের অন্যান্য দাম্পত্য সম্পর্কগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তেমন ভাবে উল্লেখ করার দাবি রাখে না। ‘সুহাসিনী’ ও ‘ভবতোষ মাষ্টারের’ সুখী-দাম্পত্য জীবন উপন্যাসে উজ্জ্বল পালক সংযোজন করে তাতে কোন দ্বিমত নেই। বয়সে পিতার সমবয়সী হলেও জীবনের মোড়ে ‘সত্যবতীর’ পালিতাকন্যা ‘সুহাসিনীর’ বিবাহ করতে হয় ‘ভবতোষ মাষ্টার’কে। অবশ্য বয়সের কারণে দাম্পত্য জীবনের কোন অসামঞ্জস্যতা ঔপন্যাসিক তুলে ধরেননি। আসলে ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য জীবনের বৈচিত্র্যকে একত্রে সঞ্জীবিত করে পাঠকের সামনে তুলে ধরা। আর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমস্তরকম দাম্পত্য জীবনের চিত্র তুলে ধরে আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে নিজস্ব অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পেয়েছেন বলে মনে হয়।

‘সুবর্ণলতা’ উপন্যাসে অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘সুবর্ণলতা’। তার ঠাকুমা ‘এলোকেশী’ ও বাবার নির্মম খেলালে তার দাম্পত্য জীবনের গুভারস্ত্র বাল্যকালেই। মাত্র আটবছর বয়সে ‘প্রবোধের’ সঙ্গে তার অশুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর থেকেই তার মা ‘সত্যবতীর’ সম্পর্কে তাকে খোঁটা দেওয়া হত। ঔপন্যাসিক বিপরীত চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন —“যার মা স্বামী পরিত্যাগিনী, সে কি হবে’? ...‘স্বামী পরিত্যাগিনী তো বটে। সে মেয়ে মানুষের আর রইল কি?’”(১৮) ‘সুবর্ণলতা’ এই দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করে। কুল না পেয়ে তার মায়ের সম্পর্কে জানতে চায়, বুঝতে পারে তার মা কোন ভুল করেনি। যদিও সে জানে আমাদের হিন্দু সমাজে বিবাহের একটা স্বতন্ত্র স্থান আছে। আনুষ্ঠানিক হিন্দু বিবাহে যে সব বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাতে সর্বদাই উচ্চ আদর্শই ধ্বনিত হয়। সেখানে বলা হয় —‘তোমার এই যে হৃদয় তা আমার হোক, আমার হৃদয় তোমার হোক’। অথবা ‘আমার প্রাণের সঙ্গে তোমার প্রাণ, অস্থির সঙ্গে অস্থি, মাংসের সঙ্গে মাংস, চর্মের সঙ্গে চর্ম যুক্ত করছি’। সন্তান উৎপাদনের কথা সেখানে প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু ‘সুবর্ণলতা’ সারাটাজীবন ধরে দেখলো স্বামী ‘প্রবোধ’ তাকে একটা সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া কিছুই ভাবেনি। সে অনুভব করে — “দুই পরম শত্রু বছরের পর বছর —একই ঘরে কাটিয়েছি, এক শয়্যায় শুয়েছি, এক ডিবের পান খেয়েছি, কথা কয়েছি, গল্প করেছি, হেসেছি”(১৯)। অথচ তারা কেউ কাউকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেনি। ইচ্ছে না থাকলেও বার বার ‘সুবর্ণলতা’কে আতুরঘরে যেতে হয়েছে, জন্ম দিতে হয়েছে একের পর এক সন্তানের। ‘প্রবোধ’ তারপরেও ‘সুবর্ণ’কে মেরে, গালিগালাজ করে বলে —“যে স্ত্রী লোক আতুর ঘরে যেতে ভয় পায়, সে স্ত্রী লোক অসতী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না”(২০)। ‘প্রবোধ’ স্বামী হিসেবে সমকালীন সমাজের পিতৃতন্ত্রের যোগ্য প্রতিনিধি। তার মা ‘মুক্তকেশী’কে খুশি করতে যেমন বেদম প্রহার করে স্ত্রীর উপর। কিন্তু তারপরেও ‘সুবর্ণলতা’ কিসের আশায় দাঁত কামড়ে

সংসারের চক্রে পরে থাকে তা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে সমালোচক ‘আশিস সান্যাল’ লিখেছেন—

“সুবর্ণলতার মধ্যে জেগে ওঠে বিদ্রোহ। আবার স্তিমিত হয়ে যায় সেই বিদ্রোহ। কী করবে সে? ‘নেবো না বলবে দাঁড়াবে কোথায়? সত্যবতী স্বামীর কাছে চেয়েছিল সত্যিকারের পরাজয়ের স্বাদ। সুবর্ণলতার চাওয়াটাও প্রায় অনুরূপ। নাকি ও চায় অপমানের অঙ্কুশে আহত হয়ে একবার অন্তত জ্বলে উঠুক প্রবোধ? পুরুষের মতো জ্বলে উঠুক, বজ্রের মতো জ্বলে উঠুক। মা ভাইয়ের কাছে মুখ রাখতে শাসনের প্রহসন নয়, সত্যিকারের শাসন করুক। সুবর্ণকে তাড়িয়ে দিক, মেরে ফেলুক। সেই মরণের সময়েও জেনে মরে সুবর্ণ, যে প্রাণীটার সঙ্গে ঘর করেছিল সেই মানুষ”।^(২১)

‘সুবর্ণলতার’ সেই ইচ্ছা কোনদিন পূর্ণ হয়নি। সে নিজেকে ক্ষয় করে শেষ করেছে, কিন্তু বিনিময়ে তার মায়ের মতো প্রতিবাদে গর্জে ওঠেনি। বিখ্যাত সমালোচক ‘তপোধীর ভট্টাচার্য’ ‘সুবর্ণলতা : নারী সত্তার নির্মান-প্রকল্প’ প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—

“ধারালো তরোয়াল হাতে নিয়ে আসেনি সুবর্ণ, ভোঁতা বল্লম নিয়ে সে দুর্ভেদ্য অচলায়তনের একটি পাথরও খসাতে পারেনি। তার মা সত্যবতী খড়ির গাণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল তীব্র ঘৃণায় বেদনায়, কিন্তু সুবর্ণের জন্য কূপই নেতিবাচক অর্থে হয়ে উঠল অকূল সমুদ্র। তবু তার আপাত ব্যর্থতার গ্লানির মধ্যেই সঞ্চিত ছিল পরবর্তীকালে তার মেয়ে বকুলের অনামিকা দেবী হয়ে ওঠার ইতিহাস। এ কেবল রাতের সমস্ত তারার দিনের আলোর গভীরে থাকার কথা নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। এ হল জীবনের প্রগতির ধীর মন্তর দ্বিবাচনিকতা। পশ্চিম দিগন্তকে অন্ধকার করে যখন সূর্য অস্ত যায়, পূর্ব দিগন্তকে আলোয় ভরিয়ে দিয়ে সূর্য উদিত হয় তখন। উপন্যাসের প্রতিবেদন শুরু হয়েছিল ছায়াছবির ফ্লাশব্যাক-এর ভঙ্গিতে। সুবর্ণলতা মৃত্যুর তাৎপর্য দিয়ে। তার মা সত্যবতী তবু দাপটের সঙ্গে জীবনের

একটা বড় অংশ কাটাতে পেরেছিল, যথা প্রাপ্ত পিঞ্জরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিফল জীবনের সন্ধানে কলকাতা পাড়ি দিয়েছিল”।^(২২)

‘সত্যবতীর’ যেমন শেষ রক্ষা হয়নি, শত চেষ্টা করেও সে তার স্বামীর ভালোবাসা পায়নি, সারাজীবন শুধু নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকেছে। ‘সুবর্ণলতা’ও ঠিক তেমনি করে কোনদিন ‘প্রবোধের’ ভালোবাসা পায়নি, নিজেও কোনদিন পারেনি স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে ভালোবাসতে। দাম্পত্য জীবনের সুখ তার অধরাই ছিল, শুধু অসুখী-দাম্পত্য জীবনের বোঝা বয়ে জন্ম দিয়েছে সন্তানদের, আর তাই হয়তো স্বামী সম্পর্কে তার খেদোক্তি—“ও আমায় বিশ্বাস করে না, আমিও ওকে বিশ্বাস করি না। ও নাকি আমায় ভালোবাসে, তাই সবসময় বলে। আমি ওকে ভালোবাসি না। ওকে ভালোবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব”^(২৩)। অসম্ভবতার নানাবিধ কারণ ঔপন্যাসিক চরিত্রটি নির্মাণে তুলে ধরেছেন। ‘সুবর্ণলতা’কে তিনি তৈরি করেছেন ‘সত্যবতীর’ দোসর রূপে। ‘সত্যবতীর’ গোটাজীবন যে প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে ব্যর্থ, সেই একই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে ‘সুবর্ণলতা’ও জীবন অতিবাহিত করে। ‘সুদক্ষিণা ঘোষ’ তাঁর ‘সুখের সাথে দুখ মিলিয়ে কাঁদে...:আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাসে দাম্পত্য ছবি’ প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—

“সংসারের বন্ধন ছিঁড়ে গিয়ে যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল সত্যবতী, সেই প্রশ্নের উত্তরের জন্যই সারাজীবন লড়াই করতে হয়েছে সুবর্ণলতাকেও—সংসারের নিষ্ঠুর দহনের মধ্যেই বাস করেই চলেছে তার অবিরাম অন্বেষণ। কোন সুদূর শৈশব থেকে শুরু হয়েছিল তার এক অসম লড়াই, তার একলার লড়াই, বিবাহিত জীবনের মানে তাঁকে খুঁজে চলতে হয়েছিল সারা জীবনের যন্ত্রনা দিয়ে। বেখুন স্কুলের ঘাগরা খুলে রাতারাতি জরির কঙ্কাদার লাল জ্যাকেট আর বেগুনী বেনারসীতে জড়িয়ে যে অসহায় মেয়েটাকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল অচ্ছেদ্য এক গাঁটছড়ায়, তার সঙ্গে কোনদিন বিবাহের সংজ্ঞা মেলেনি তার আজীবনের সঙ্গী তার স্বামীর। পুতুল খেলার ঘর ভেঙে দিয়ে এসে বাপের বাড়ির সমস্ত সংস্পর্শ

ভুলে কিশোরী হয়ে উঠতে উঠতে সেই মেয়েটা শুধু জেনেছিল, তার ‘দীর্ঘ বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যে ভরপুর দেহটাই লক্ষ বাহু মেলে আকর্ষণ করে তার স্বামী প্রবোধ চন্দ্রকে। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কেরও এই একটাই মানে বোঝে প্রবোধ চন্দ্র, তাই দক্ষিণের বারান্দার লোভ দেখিয়ে রাতের পর রাত স্ত্রীকে ঠকিয়ে ভোগ করতে এতটুকু সঙ্কোচও হয় না তার কোনদিন; সমাজের শিক্ষা, পারিবারিক বিশ্বাস তাকে চিরদিন জানিয়ে এসেছে ভোক্তা আর ভোগ্য্যার আবহমান এই সম্পর্কই নারী-পুরুষের চিরন্তন সম্পর্ক। সহজাত বোধ, শৈশবে আহত মূল্যবোধে জীবনের যে অর্থ, যে তাৎপর্য ছিল সুবর্ণলতার জীবনে, কোনদিন তা বোঝবার কোন চেষ্টাই করেনি প্রবোধ চন্দ্র, চেষ্টা করার প্রয়োজন যে আছে, তাই কখনো মনে হয়নি তার; তাই সারাজীবন ধরে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে একটু শালীনতা, একটু সৌন্দর্য, একটু রুচির স্পর্শ খুঁজেছে সুবর্ণলতা, নিষ্ফল প্রয়াসে শ্বশুরবাড়ির নিষ্ঠুর দেওয়ালে মাথা কুটে শুধু খুঁজেই চলেছে’^(২৪)।

তুলনায় ‘সুবর্ণলতার’ জীবন ‘সত্যবতীর’ থেকেও ভয়াবহ ছিল। কারণ ‘সত্যবতীর’ সঙ্গে তার স্বামী ‘নবকুমারের’ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মতবিরোধ থাকলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ভালোবাসার ঘাটতি তেমন ছিল না। ‘নবকুমার’ একটু স্থূল, নরম মনের ও মোটাবুদ্ধির মানুষ হলেও রুচির সীমানা কখনো অতিক্রম করেনি। তার তুলনায় ‘সুবর্ণলতার’ স্বামী ‘প্রবোধচন্দ্রের’ মানসিকতা অনেকটাই নিচুস্তরের। জীবনের চলার পথে শুধুই আঘাত পেয়েছে ‘সুবর্ণলতা’, ভালোবাসার শত চেষ্টা করেও স্বামীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করতে পারেনি। সে চেয়েছিল প্রকৃত একজন মানুষ, যাকে ভালোবেসে মরে যেতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তার ভাগ্যে তা জোটেনি, সন্দেহপ্রবণ হীনমানসিকতা সম্পন্ন একটি স্থূলকায় মানুষ তার সমস্ত স্বপ্নকে নষ্ট করে দিয়েছে। তাই সারা জীবনের অস্বেষণেও স্বামীকে প্রাণভরে ভালোবাসার মতো কোন গুণ সে খুঁজে পায়নি। লেখিকা ‘আশাপূর্ণা দেবী’ এই অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে

‘সুবর্ণলতা’ উপন্যাসে বলেছেন—

“সত্যবতীর স্বামী অসার অপদার্থ ছিল, কিন্তু অসভ্য, অশ্লীল ছিল না। সত্যবতীর অযোগ্য হতে পারে, তবে সে অত্যাচারী নয়। কিন্তু সুবর্ণলতার ভাগ্যে মাত্র ওই দ্বিতীয় বিশ্লেষণ গুলোই। আজীবন সুবর্ণকে একটা অসভ্য, অশ্লীল আর অত্যাচারীর ঘর করতে হচ্ছে”^(২৫)।

‘সত্যবতীর’ সঙ্গে তার কন্যা ‘সুবর্ণলতার’ জীবন যেন চাঁদের এপিঠ-ওপিঠ পার্থক্য। দুটি জীবনকে পাশাপাশি রাখলে দেখা যায় ‘সত্যবতীর’ থেকে ‘সুবর্ণলতার’ সংগ্রাম অনেক বেশী কঠিন। তুলনায় ‘সুবর্ণলতা’ অনেক বেশী কন্টকাকীর্ণ পথে চলেছে, মেয়েমানুষ থেকে মানুষ হয়ে ওঠার সাধনায় তার মায়ের থেকে অনেক বেশী কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে। কারণ ‘সত্যবতীর’ মাথার ওপর সারা জীবনব্যাপী প্রেরণাদাতা হিসেবে তার পিতা ‘রামকালী’ ছিলেন। তুলনায় ‘সুবর্ণের’ কাজে সমর্থন করার মতো কেউ ছিল না, উল্টে তার কাজের প্রতিবাদ করেছে স্বামী-সন্তানরা। তার আজীবনের সঞ্চিত স্মৃতিকথা যখন ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে, সকলের তিরস্কারে কারণে আত্মদংশনে নিজেই সমস্ত ছাপানো বই পুড়িয়ে ফেলেছে। এই প্রসঙ্গে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাস নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ‘রামী চক্রবর্তী’ মন্তব্য করেছেন—

“আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ যদি হয় খাঁচা ভেঙে ফেলার দুঃসাহসিক অভিযান, তবে ‘সুবর্ণলতা’-কে বদ্ধ খাঁচার অব্যক্ত যন্ত্রণার মুক্তিকামী বাসনার প্রকাশ বলা যেতে পারে। ‘সুবর্ণলতা’র মনোযোগী পাঠক প্রথমেই যে ভাবনার মুখোমুখি হন, তা হচ্ছে সত্যবতীর এক প্রজন্মের পরের হয়েও সুবর্ণলতাকে ঘিরে রেখেছে দাসত্বের ধাতব বলয়, যে বলয়কে ভেঙে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস করেছে সুবর্ণলতা বিবাহোদ্বর্দ পঞ্চাশ বছর ধরে। তবুও একে ভাঙতে না-পারার দীর্ঘ ব্যর্থতার মধ্যেও সুবর্ণের আত্মসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার সামান্য সফল প্রয়াস হচ্ছে ঔপন্যাসিক অবস্থাকে শনাক্ত করে এরই বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ গড়ে তোলা”।^(২৬)

আসলে ‘সুবর্ণলতার’ মূল প্রতিবাদ ছিল ভাবনার গভীরে বিশ্বাসঘাতকতায়, স্নায়ু পীড়িত হয়েছিল অভ্যাসের কুশ্রীতায় আর আত্মজীর্ণ হয়ে উঠেছিল প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের গ্লানীময়তায়। সুবর্ণলতা চেয়েছিল প্রেমের আহ্বানে জীবনের সাদা পৃষ্ঠাগুলিকে রঙিন করে তুলতে। সে তার স্বামীকে মনে প্রাণে ভালোবাসতে চেয়েছিল। সে চেয়েছিল অভিমান ও অপমানের আঘাতে স্বামীর অভ্যাসের নিশ্চেষ্টতাকে ভেঙে দিয়ে, তার যথার্থ পৌরুষকে জাগিয়ে তুলতে। ‘সুবর্ণলতা’ তার জীবনযুদ্ধে সর্বার্থেই চেয়েছিল এক সহযোদ্ধাকে, ভালোবাসার মানুষকে। কিন্তু সন্দেহপ্রবণ ‘প্রবোধের’ কাছে স্ত্রী মানেই তো ‘মেয়েমানুষ’, স্ত্রীকে একজন মানুষ হিসেবে ভাবতে তার বাধে। আর তাই অবাধ্য স্ত্রীকে পোষ মানাতেই প্রতিরাতে ভোগের চাবুকের আঘাতে পরাজিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। প্রেমের সৌরভে তাকে কোনদিন জিতে নেওয়ার প্রচেষ্টা করেনি। এখানে সমালোচক ‘সুতপা ভট্টাচার্যের’ একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি ‘মেয়েলি সংলাপ’ গ্রন্থে ‘বিবাহের বিরুদ্ধে’ প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে লিখেছেন—

“সম্বন্ধ যেখানে ভিতর থেকে সত্য, সেখানে বিবাহ না থাকলেও সম্বন্ধ ভাঙে না ; সম্বন্ধ যেখানে ভিতর থেকে মিথ্যে, সেখানে বিবাহ থাকলেও সম্বন্ধ থাকে না”।^(২৭)

‘সুবর্ণলতার’ ক্ষেত্রে সম্পর্ক সম্পূর্ণ রূপে ছিল ভিতর থেকে মিথ্যে। অবশ্য সেজন্য সমকালীন সমাজ ও পারিবারিক বংশানুক্রমে প্রচলিত কুসংস্কার দায়ী ছিল কিছু পরিমানে। তাই ‘সত্যবতীর কাল’ থেকে ‘সুবর্ণলতার কাল’ কিছুদিন পরে হলেও তুলনায় প্রতিকূল পরিবেশ বেশী পরিমাণে মোকাবিল করতে হয়েছে ‘সুবর্ণ’কে। ঘোমটার বহর হয়তো একটু খাটো হয়েছিল ‘সুবর্ণের কালে’, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মেয়েদের মুক্তি ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার ছিল অধরাই।

নারীমুক্তি ও ব্যক্তি-স্বাভাব্যতার অন্বেষণের জন্য ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্কে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে। ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথমপর্বে ঔপন্যাসিক বিবাহ প্রতিষ্ঠান ঘিরেই নানারকম প্রশ্নের সৃষ্টি করেছেন ‘সত্যবতী’ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ‘সত্যবতী’ গভীরভাবে খুঁজেছে বিবাহের মানে, বুঝে নিতে চেষ্টা করেছে বিবাহ প্রথার মাধ্যমে নারী পুরুষের অধিকারের স্বাভাব্যতা। আর সেই অন্বেষণ তার শুরু হয়েছে বালিকা বয়সেই, সারাজীবন ধরে সে বিভিন্নক্ষেত্রে প্রতিবাদ করলেও, সমাজিক-শাসনের বলয়ে শেষপর্যন্ত দাম্পত্য সম্পর্কটিকে রাখার জন্য পারিবারিক সমস্তরকম অন্যায়-অবিচার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তাকে দিনের পর দিন ঘর করে চলতে হয়েছিল অযোগ্য স্বামীর সঙ্গে। রাতের অন্ধকারে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে বলতে হয়েছিল –“বাবা, বাবা গো, দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্র মেয়ে আমি তোমার, না দেখে শুনে তাকেও এমন ঘরে দিয়েছিলে ? এত তুমি বিচক্ষণ, আর এই তোমার বিচার”^(২৮)! কিন্তু মানুষের জীবনের আঘাত যখন গভীর হয়ে আসে, পিছিয়ে যাওয়ার আর জায়গা থাকে না, খাদের ধারে দাঁড়িয়ে তখন আর কোন কিছুই সঙ্গে আপোষ করা চলে না। জীবনের শেষমুহুর্তে ‘সত্যবতী’ তাই কোনরকম আপোষ করেনি। একইভাবে ‘সুবর্ণলতা’ উপন্যাসেও নায়িকা ‘সুবর্ণ’র স্বপ্ন যখন ভেঙে গেছে, নির্মমভাবে প্রতিক্ষেত্রে তার আপনজনরাই তিরস্কার করেছে, তখন সে তার মায়ের মতো করে সংসার থেকে দাম্পত্য জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেনি। বিনিময়ে সে বেছে নিয়েছে নীরব প্রতিবাদের ভাষা, ইচ্ছাকৃত নিশ্চিত মৃত্যু। ‘সুবর্ণলতা’ যেভাবে জীবনের গ্লানি বহন করেছে, তাতে করে একজন নারীর নীরব প্রতিবাদের ভাষা প্রকাশ পেয়েছে। তুলনায় তার মায়ের অবস্থা ছিল অনেক বেশী অনুকূল। ‘নবকুমার’ শেষজীবনে যতই ভুল করুক, দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিকের ‘সত্যবতীর’ সঙ্গে কিছু মিলনের মাধুর্যমাখা স্মৃতি, তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের ভিন্ন বার্তা বহন করে।

কিন্তু ‘সুবর্ণলতার’ গোটাজীবন জুড়ে জমেছে বিতৃষ্ণার পারদ। আর সেই অশান্ত অসুখী-দাম্পত্য জীবনের প্রতীকী রাতের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন— “দীর্ঘশ্বাস মর্মরিত ঘর ক্রমশ স্থির হয়ে আসে, সারাদিনের পরিশ্রান্ত মেয়েটার চোখে ঘুম নেমে আসে, সঙ্কুচিত হয়ে ঘুমন্ত মানুষটার ছোঁওয়া বাঁচিয়ে শুয়ে পড়ে সে। লোকটার ওই পরিতৃপ্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে ঘৃণা আসে, অপবিত্র লাগে লোকটাকে। এই কিছুক্ষণ আগেই যে ওর আদরের দাপটে হিমশিম খেতে হয়েছে, তা ভেবে বুকটা কেমন করে ওঠে”^(২৯)। সুবর্ণলতার’ এই মনের সন্ধান দিয়ে ঔপন্যাসিক বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন ‘সত্যবতীর’ সঙ্গে আসলে কতটা পার্থক্য। আসলে যুগের পর যুগ ধরে এই একইভাবে আহত অপমানিত হয়েছে ‘সত্যবতী’ ও তার উত্তর-প্রজন্মের দাম্পত্য জীবন।

অবশ্য শুধু চরিত্রের মুখে সংলাপ দিয়ে নয়, ঔপন্যাসিক পরিকল্পিত ভাবে ‘বকুলকথা’ উপন্যাসে বন্ধনমুক্ত স্বাধীন চেতনা সম্পন্ন নারীকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ‘বকুলকথা’ উপন্যাসে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ ও ‘সুবর্ণলতা’ উপন্যাসের পরবর্তীকালের আধুনিক জীবনের চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন। আধুনিক দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন কোণে আলো ফেলে ঔপন্যাসিক বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন —‘একালের স্বাধিকার প্রমত্ত দাম্পত্যের স্বরূপ’। তিনি একদিকে নতুন প্রজন্মের দাম্পত্য জীবনের ভিন্নতা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে নতুন ও পুরাতনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধান করেছেন। ‘পুরানো মানে সব ভালো, আর নতুন মানে যাচ্ছে-তাই’ এরকম ধারণায় ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি পুরানো ও নতুন উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্বের সঠিক বিশ্লেষণ ও অন্বেষণ করেছেন। আর তাতে করে একদিকে যেমন ‘সত্যবতী’, ‘সুবর্ণলতা’ ‘পারুল’, ‘বকুলের’ কথা এসেছে, অন্যদিকে তেমনি নতুনদের কথায় এসেছে ‘শম্পা’, ‘রেখা’, ‘শোভন’,

‘অপূর্ব’দের দাম্পত্য সম্পর্কের কথা। ‘পারুলের’ ছোটছেলে ‘শোভন’ ও তার স্ত্রী ‘রেখার’ দাম্পত্য সম্পর্ক নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করেছে ‘বকুলকথা’ উপন্যাসে। প্রথম দিকের নির্বিবাদ দশবছরের দাম্পত্য জীবনে হঠাৎ নেমে আসে বিপর্যয়। সুখী দাম্পত্যের মুখোশ ছিঁড়ে তাদের মধ্যে নেমে আসে বিচ্ছেদের ভাঙনপর্ব। দুটো ফুটুফুটে শিশুর বন্ধনও টিকিয়ে রাখতে পারেনি তাদের ভালোবাসাকে। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক তথা বিবাহিত জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচক ‘বিশ্বজিৎ চৌধুরী’ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি ‘বকুলকথা : আধুনিকতার সমালোচনা-প্রকল্প’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন —“পারুলের ছোট ছেলে শোভনের বউ রেখা দশ বছরের বিবাহিত জীবন কাটানোর পর আবিষ্কার করল তাদের দাম্পত্য জীবনে ফাঁকির বহর বেড়েই চলছে। সুতরাং বাঁদরের পিঠে ভাগাভাগির মতো করে ছেলে বুড়োকে তার বাবা শোভনের কাছে রেখে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে সে আলাদা হয়ে যায়। আইনি জটিলতার জন্য যদিও তারা বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আদালতে যায়নি, তবু কয়েক বছর আলাদা থাকলে আইনগত বিচ্ছেদের পথটা সুগম হবে বলে তারা আলাদা হয়ে গেছে। পরে শোভনের অসুস্থ অবস্থায় যদিও রেখা এসে সেবাযত্ন করে গেছে, তবু পাকাপাকিভাবে একসঙ্গে আর তারা থাকেনি। রেখা চলে যায়। শোভনের আমলাতান্ত্রিক অহমিকা ও জেদ, অন্যের বৌয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, সংকীর্ণচিত্ততা, গ্রাম্যতা ও ভগবানে বিশ্বাসই নাকি রেখার সঙ্গে তার দূরত্বের কারণ। রেখা উদার, আধুনিক ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। দুজনের মূল্যবোধই আলাদা, অথবা কোন মূল্যবোধই নেই। মানবিক সম্পর্কের ভাঙনই তো তথাকথিত আধুনিকতার গোত্রলক্ষণ। যে-আধুনিকতা সব কিছুকে টুকরো করে দেয়, সে-আধুনিকতা কি সত্যিকার আধুনিকতা সে-প্রশ্ন অমোঘ হয়ে ওঠে”^(৩০)। সমালোচকের উক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসে তথ্য সন্ধানে ব্রতী হলে দেখা যায়, ‘পারুল’ নিজের ছেলের দাম্পত্য জীবনের এই পরিণতির জন্য যেসব কারণ, তা ‘বকুল’কে

চিঠি লিখে জানায়। তার মতে যেসব কারণে তার ছেলের দাম্পত্য জীবন ভেঙে গেল ভালো করে দেখলে মনে হবে ঠাট্টা-ইয়ার্কি। একজন চেয়েছে পাশ্চাত্য-ধর্মী জীবনযাপন করতে, অন্যজন চেয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলেমিশে থাক জীবনের অন্তরঙ্গ হয়ে। প্রথমজন সাহেবিয়ানা পছন্দ করেন আর অন্যজন বাঙালি হয়ে থাকতে চান। একজন ধর্মভীরু তো অন্যজন নাস্তিক। এইসব দ্বন্দ্বের কারণেই ‘বকুলকথা’ উপন্যাসের ‘শোভন’ আর ‘রেখা’র দাম্পত্য জীবনের ইতি হয়ে যায়। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদ তারা করেনি শুধুমাত্র মানসিক বিচ্ছেদের কারণে আলাদা আলাদা থেকে জীবনযাপন। শেষদিন পর্যন্ত অবশ্য একে-অপরের সবরকম খবর রেখেছে। কারণ হয়তো বাবার কাছে ছেলে আর মায়ের কাছে মেয়ে থেকে যাওয়া। কিন্তু নিজের ছেলের সুখী দাম্পত্য জীবন দেখে একসময় খেয়াল বসেই ‘পারুল’ হয়তো বলেছে –“ভাবতাম অন্যদিকে যা হয় হোক, এই হচ্ছে প্রকৃত বিয়ে। একটা ভালোবাসার বিয়ের সুখময় দাম্পত্য জীবনের দর্শক হয়েছি আমি, এ ভেবে আনন্দ বোধ হত। ...দেখেছি আমাদের মায়ের জীবন, দেখেছি নিজেদের আর সমসাময়িকদের। কেউ ফাঁকিটা মেনে নিতে না পেরে যন্ত্রণায় ছটফটিয়েছে, কেউ ফাঁকির সঙ্গেই আপোষ করে ঠাট বজায় রেখে চালিয়েছে”^(৩১)। কিন্তু তার ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তা উপন্যাসের ঘটনার পর্যায়েক্রমে আমার জানতে পারি।

‘আশাপূর্ণা দেবী’ আদতে ত্রয়ী উপন্যাসের চারটি প্রজন্মের মধ্য দিয়ে বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের অনেক প্রশ্নের সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। ‘সত্যবতীর’ মধ্য দিয়ে বিবাহ কেন্দ্রিক যে প্রশ্নের অন্বেষণ শুরু করেছেন তার উত্তর সন্ধান সক্ষম হয়েছেন ‘বকুল’, ‘পারুল’দের সময়ে। ‘পারুলের’ মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তীনী মাতা ও মাতামহীর দাম্পত্য জীবনের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। তিনি পারুলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন আধুনিক কালের অবক্ষয়তার কথা। তারসঙ্গে পুরাতনদের (মাতা/মাতামহী)

যন্ত্রণামখিত দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে নতুনদের দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ তাঁর ভাবনা ‘পারুলের’ মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন—“কিন্তু আজকের এই সভ্য সমাজের ‘ভালোবাসার বিয়ে’! এরই বা পুতুল খেলার সঙ্গে তফাৎ কোথায়? খেলতে খেলতে পুরনো হয়ে গেলে, বৈচিত্র হারালে, আবার অন্য পুতুল নিয়ে খেলা শুরু, এই তো! আর যদি নতুন করে শুরু নাও করো, খেলাটাই ত্যাগ করলে। খেলাটা ভাঙলে, পুতুলটা আছড়ে ফেলে দিলে। আমাদের বিদ্রোহিনী মাতামহী কি এই চেয়েছিলেন? তিনি কি আজ শোভনের এই মুক্তি দেখে উল্লসিত হতেন? বলতেন, ‘যে বিয়ে মিথ্যে, যে বিয়ে অর্থহীন, তার বোঝা বয়ে চলা মূঢ়তা মাত্র? শোভন ঠিক করেছে?’ কিন্তু তাহলে সত্যি বিয়ে কোনটা? আজ যা সত্য, আগামী কালই তো তা মিথ্যে হয়ে দাঁড়াতে পারে”^(৩২)। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ নারীদের জীবনের বিবর্তনের ইতিহাস তাঁর উপন্যাসের পাতায় তুলে ধরেছেন। আলোচ্য বিষয়ের উপর পূর্বেই বহুভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। তবু আলোচ্য বিষয়ের সমর্থনে ‘অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের’ একটি মন্তব্যের অংশ তুলে ধরে বলা যায়—

“যখন

আমাদের সমাজে অন্তঃপুর ছিল অবহেলিত, যখন সেখানকার প্রাণীরা পুরোপুরি আস্ত মানুষের সম্মান কখনো পেত না, তখন সামান্য ক’টি মেয়ে এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করে, সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত পৃথিবীর আলো এনে দেবার সূযোগ করে দেয় অন্তঃপুরে। সত্যবতী ছিল সেই সামান্য ক’জন মেয়ের অন্যতম। সত্যবতীর মেয়ে সুবর্ণলতা মায়ের মতো তেজ না পেলেও নীরবে সেই নারী মুক্তিরই আকাঙ্ক্ষাকে লালিত করে গেছে। সেই আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হয়েছে সুবর্ণলতার মেয়ে বকুলের জীবনে, যে যশস্বী লেখিকা হয়েছে অনামিকা দেবী নামে। কিন্তু বকুল তথা অনামিকা কি তার সমাজের নতুন রূপে মা ও দিদিমার সাধনার সাফল্য দেখতে পাচ্ছে? না, দেখেছে শেকল ছেঁড়ার এক ভয়াবহ

উন্মাদনায় নারী প্রগতির নামে চলছে স্বৈচ্ছাচার। এই জিজ্ঞাসাই বকুল বা অনামিকা দেবীকে বারেবারেই উন্মাদ করে তুলেছে। আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজির এই শেষ খণ্ডে এই প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে—স্বাধীনতা ও স্বৈচ্ছাচার এই দুইটির সীমারেখা কোথায়? সে সীমারেখার অন্বেষণই ‘বকুলকথা’ উপন্যাসের মূল উপজীব্য”^(৩৩)। সমালোচক এখানে তাঁর ‘বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি’ গ্রন্থে উক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে নারীর জীবন তথা মানুষের দাম্পত্য জীবন প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ক্রমকে তুলে ধরেছেন। যা দাম্পত্য সম্পর্ক কেন্দ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ।

<<<<<>>>>>

তথ্যসূত্র

- ১) ‘প্রেম ও প্রয়োজন’, আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী, (তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদনা-
অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭.
- ২) ‘জননী ভাবনা’(আশাপূর্ণা দেবী ও মহাশ্বেতা দেবী), ড. সঙ্গীতা সাহা, পাণ্ডুলিপি,
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭.
- ৩) ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’, (তৃতীয় খণ্ড - ভূমিকা অংশ), সম্পাদনা-
অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-০২.
- ৪) ‘প্রেম ও প্রয়োজন’, আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী, (তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদনা-
অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৮৪.
- ৫) ‘মিষ্টির বাড়ি’, আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী, (তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদনা-
অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩১৭.
- ৬) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫৩.
- ৭) ‘উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব’, সম্পাদনা- অঞ্জন সেন ও উদয়নারায়ণ সিংহ,
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৪.
- ৮) জীবন স্বাদ, আশাপূর্ণা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক- শ্রী
সুশান্তকুমার গুপ্ত, ভূমিকা- অরুণকুমার বসু, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৬২.
- ৯) ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’, (নবম খণ্ড - ভূমিকা অংশ), সম্পাদনা- শ্রী
সুশান্ত কুমার গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৩৫.
- ১০) ‘বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি’, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, দে’জ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৫.
- ১১) ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’, (নবম খণ্ড), সম্পাদনা- শ্রী
সুশান্ত কুমার গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৭৩.
- ১২) ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি বিশ্লেষণ’, অনন্যা বড়ুয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪.

- ১৩) ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’, (নবম খণ্ড), সম্পাদনা- শ্রী সুশান্ত কুমার গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৭৯.
- ১৪) ‘বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি’, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, দে’জ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৩.
- ১৫) ‘আশাপূর্ণা নারী পরিসর’, সম্পাদক-তপোধীর ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪৯-১৫০
- ১৬) ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী, (নবম খণ্ড), সম্পাদনা- শ্রী সুশান্ত কুমার গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৩২.
- ১৭) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৯৪.
- ১৮) ‘সুবর্ণলতা’, আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী, (অষ্টম খণ্ড), সম্পাদনা- শ্রী সুশান্ত কুমার গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৮৪.
- ১৯) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৮২.
- ২০) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৮৫.
- ২১) ‘আশাপূর্ণা দেবী নারী সত্তার বিনির্মাণ ও শিল্পরূপ’, সংকলন ও সম্পাদনা- বিপ্লব মাজী, অঞ্জলি পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৯.
- ২২) ‘আশাপূর্ণা দেবী নারী পরিসর’, সম্পাদক- তপোধীর ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২০১.
- ২৩) ‘সুবর্ণলতা’, আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী, (অষ্টম খণ্ড), সম্পাদনা- শ্রী সুশান্ত কুমার গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫১৭.
- ২৪) ‘শুভশ্রী’ পত্রিকা (নষ্ট দাম্পত্য বাংলা কথাসাহিত্য), সম্পাদক- পুলক কুমার সরকার, বিয়াল্লিশ বর্ষ-২০০৩-০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৭.
- ২৫) ‘সুবর্ণলতা’, আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী, (অষ্টম খণ্ড), সম্পাদনা- শ্রী সুশান্ত কুমার গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৭৪.

- ২৬) ‘আশাপূর্ণা দেবী নারী পরিসর’, সম্পাদক- তপোধীর ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৭-৪৮.
- ২৭) ‘মেয়েলি সংলাপ’, সুতপা ভট্টাচার্য, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮.
- ২৮) ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী, (নবম খণ্ড) সম্পাদনা- শ্রী সুশান্ত কুমার গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৭৩.
- ২৯) ‘সুবর্ণলতা’, আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী, (অষ্টম খণ্ড), সম্পাদনা- শ্রী সুশান্ত কুমার গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৭৫.
- ৩০) ‘বকুলকথা : আধুনিকতার সমালোচনা-প্রকল্প’, বিশ্বজিৎ চৌধুরি, ‘আশাপূর্ণা নারী পরিসর’, সম্পাদক –তপোধীর ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪৪.
- ৩১) ‘বকুলকথা’, আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী, (সপ্তম খণ্ড), সম্পাদনা- শ্রী সুশান্ত কুমার গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪২.
- ৩২) ‘বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি’, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কোলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০০.

<<<<<>>>>>

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে নারীর সামাজিক অবস্থান

উপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ রচনার বৈচিত্র্যতায় নারীজীবনের বিভিন্ন দিক প্রস্ফুটিত হয়েছে। সমাজ বাস্তবতার নিরিখে মানব জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘাত-প্রতিঘাতকে তিনি নিপুণভাবে সাহিত্যের প্রতিটি পর্বে ব্যক্ত করেছেন। আর তাতে করেই উঠে এসেছে মানব-মানবীর বাস্তবিক জীবনের সম্পর্ক। বহুরকম প্রেক্ষাপটে চিরায়ত ভঙ্গীতেই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগের মাধ্যমে, স্পষ্টতর করে তুলেছেন মানবিকতার সংজ্ঞা। তিনি পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে ঋণগ্রহণ করে স্বীকার করেছেন ‘নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, জীবনের নানাবিধ কর্মে ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে’। এই বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে বেশী গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লক্ষ করা যায়। সবচেয়ে বেশী উপন্যাস রচনাতেই তিনি সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতিকে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে তুলতে পেরেছেন। আর তাই উপন্যাসের মধ্যেই তাঁর নারী কেন্দ্রিক সমস্ত গবেষণার নির্যাসকে প্রতি-রূপায়িত করেছেন। তিনি বাঙালী জীবনের অন্তঃপুরকে যেভাবে রূপায়িত করেছেন, ঠিক সেভাবে আর কেউ পেরেছেন কিনা; খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কেবলমাত্র পুরুষ-তান্ত্রিক সমাজে নারীর দুর্গতির কথাই শুধু তিনি লেখেননি, নারী মননের উদার-প্রাঞ্জলতা, অনুদারতা, ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা সমস্তকিছুকে সমানভাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি লেখার প্রেক্ষিত হিসেবে বেছে নিয়েছেন ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর সামাজিক প্রেক্ষাপট। বেশীরভাগ উপন্যাসে তিনি উক্ত

সময়সীমার সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সেই সময়ের নারীর সামাজিক অবস্থানগত তথ্যকেই কাহিনী ও জীবনরসে জারিত করে উপস্থাপিত করেছেন। নারী জীবনের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র রচনা প্রসঙ্গে বলা যায়—

“মজ্জায় মিশে যাওয়া বহুকালের সংস্কারের অভ্যাস! পুরুষ পূজিত, নারী পূজক। পুরুষ ভোক্তা, নারী ভোগ্য এবং ভোগের আয়োজক। পুরুষ নিয়ামক, নারী নিয়মের আঙুবাহক। নারী-পুরুষের জৈব বিভেদকে অধিকার বিভাজনের ভিত্তিতে রেখে তৈরি হয়েছিল পিতৃতন্ত্রের কৌশলী বিন্যাস। একদিকে পুরুষ নিজের দম্ভের মূর্তিকে ক্রমশ স্ফীতকায় করেছে, অন্যদিকে নারীর অজ্ঞতা, অক্ষমতা, অযোগ্যতা প্রমাণের হাজারো আছিলায় তাকে কঠিন মুঠিতে অধিগত করেছে। সুরক্ষা দেওয়ার নামে তার চারপাশে গড়েছে অবরোধ। নারীর মনের জমিন পতিত থেকেছে। তাতে আবাদ করলে সোনা ফলত কিনা, তা পরখ করার সুযোগ কোথায়? বর্ষণের সুযোগ নিয়ে কর্ষণে মেতেছে পুরুষ। ফসল পেয়েচে তারাই। তবে বর্ষণের সহিষ্ণুতায় একদিন তো টান পড়েই”।^(১)

‘আশাপূর্ণা দেবী’ উপন্যাস লেখার কালপর্ব প্রায় গোটা বিংশ শতাব্দী। আর এই শতকেই বাঙালী সমাজ-সংস্কৃতিতে ঘটে গেছে আমূল পরিবর্তন। এইসময় নারীদের জীবন কেন্দ্রিক নানারকম কুসংস্কারের মোড়ক ভেঙে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বিধবা হলেই সতী হতে হবে, লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়ে যাবে, এরকমের বহুরকম প্রতিবন্ধকতা থেকে নারীদের শৃঙ্খল মুক্তি ঘটে এই পর্বে। আমরা জানি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে সাহিত্যিকরা ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর বাস্তব তথ্যসূত্র অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করেন। এই সৃষ্টির জগতে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ও ব্যতিক্রমী নন। তিনি তাঁর সমকাল ও পূর্ববর্তীকালের সমাজ পরিবেশকে যথাসাধ্য ভাবে চিত্রিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে,

নারীরা প্রাচীনকাল থেকেই সকল কর্মে পুরুষের সঙ্গে সমান অংশীদারের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু ক্রমে নারীকে বন্ধনে জড়াতে জড়াতে পুরুষ তার গৃহ নামক কারাগারে বন্দী করে রেখেছে। ‘শিবনাথ শাস্ত্রী’ মহাশয় ‘গৃহধর্ম’ নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—

“নারীর জন্যই গৃহ জনপদের সৃষ্টি। গৃহ মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান তাহার। পুরুষ গৃহের রক্ষক ও গৃহকর্মে মন্ত্রী; কদাচ গৃহের রাজা নহেন। অবরোধ প্রথা— পারিবারিক সুখ ও পারিবারিক সমূহের পবিত্রতা উভয়ের শত্রু। উন্নত সমাজে পুরুষ ও নারী মুক্ত ভাবে অথচ সংযত ও পবিত্র ভাবে পরস্পরের সহিত মিশেন। নারীর ধৈর্য, লজ্জা, প্রেম। নারীর জন্য নিরুদ্বেগ ও শান্তিময় স্থান প্রয়োজন। নারীর স্নেহ দয়া কেবল পরিবার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের পক্ষে বিবাহই সাধারণ নিয়ম;”^(২)

আমরা তাই সাধারণ ভাবে একটি কথা বলতে পারি। একেবারে প্রাক-প্রাথমিক বর্বরতার যুগে নারী-পুরুষ একই সঙ্গে খাদ্যাশ্বেষনের জন্য একবৃক্ষ থেকে আর একবৃক্ষে বন্যপ্রাণের সঙ্গে সমান তালে সংগ্রাম করতো। তারপর ধীরে ধীরে গৃহের অশ্বেষণ ও তারমধ্যে জীবনযাপনে স্বাভাবিকভাবে শারীরিক কারণে ও গর্ভধারণ প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য নারীদের প্রয়োজন হল আবরণ ও আগল। আর তাকে সমস্তরকম বিপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিলেন পুরুষ। প্রাণের রক্ষা করার তাগিদেই একদিন নারী হয়ে উঠলো শক্তির আধার, আর পুরুষ হয়ে গেল শক্তির ধারক ও পূজারী। পুরুষের পেশীশক্তির জোড়ের কারণে নারী নিজেকে ক্রমে নিরাপদ মনে করে পুরুষের বাহুবন্ধনে। জীবনযাপনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পণ করে নিজেই বেছে নিলেন গৃহের অন্ধকার। অবশ্য সেখানে থেকেও পুরুষের সহমর্মী ও সহকর্মী হয়ে নারীরা সঙ্গ দিতেন। আর তার ফলেই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় অনবরত ক্রমাশ্বেষণের মধ্য দিয়ে সংযোজিত হয়েছে নতুন থেকে নতুনতর ধারা। নারীরাই প্রথম জীবনের

প্রয়োজনে খিদের তাগিদে সৃষ্টি করে কৃষির প্রক্রিয়া। তাদেরই জানা ছিল ফসল ফলানোর বীজমন্ত্র। কিন্তু যখন ফসলের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক স্থাপিত হল সেই মুহূর্ত থেকে পুরুষ সমস্ত কৃষি প্রক্রিয়াকে নিজেদের করায়ত্ত করে নিয়েছে। একইভাবে সমস্তরকম সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র-শিল্প প্রক্রিয়ার মূল উদ্ভাবক নারীরা সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত নিজেদের পায়ে নিচের জমি ছেড়ে দিয়ে পুরুষের পিছনে থেকেছে।

বাংলাসাহিত্যের পরিমণ্ডলে আমরা প্রথম ‘চর্যাগীতিতে’ দেখি নারী চরিত্ররা নানাভাবে জীবিকা উপার্জন করতেন। সেখানে ‘ডোমনীদের’ কথা আছে, তাঁরা তাত বিক্রি করে, বিক্রির জন্য চাঙারি তৈরি করে। কখনো কখনো তাঁরা উদরের স্বার্থে গণিকাবৃত্তির কাজও করতেন। ‘বড়ু চণ্ডীদাসের’ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যেও নারীর জীবিকা প্রসঙ্গ আছে। ‘রাধা’ রোজ পসরা নিয়ে সঙ্গিনীদের সঙ্গে করে হাটে দহি দুগ্ধ বিক্রি করতে যায়। আবার তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে ‘বড়ায়ি’কে। সেসব কাব্যে রক্ষক ও পরিচায়িকা বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। অন্যদিকে ‘মনসাবিজয়ে’ ‘হাসান হুসেনের’ সাতবাঁদী ও ‘সনকার’ সাহসী দাসীর কথাও উল্লেখ করা যায়। ঐ একই কাব্যে আমরা ‘পুষ্প, দুগ্ধ ও দহি’ বিক্রেতা যুবতী নারীর উল্লেখ পাই। ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যেও দেখি আধুনিকা নারীর প্রতিচ্ছবি। ‘ফুল্লরা’ সমস্ত রকম গৃহকর্ম সম্পন্ন করার পরেও হাটে গিয়ে মাংস বিক্রি করে। ঐ কাব্যের আর এক চরিত্র ‘খুল্লনা’ সতিনের চক্রান্তে ছাগল চড়িয়ে জীবিকা নির্বাহে বাধ্য হয়। ‘ভারতচন্দ্রের’ ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যেও ‘ঈশ্বরী পাটনী’কে যদি আমরা নারী হিসেবে ধরে থাকি, তাহলে আর একজন জীবিকা সন্ধানী নারীর সন্ধান আমরা মঙ্গলকাব্যে পেয়ে থাকবো। যে নারী নৌকা পারাপার করে শুধুমাত্র নিজের সন্তানকে দুধে-ভাতে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। ‘ভারতচন্দ্র’ সৃষ্ট অন্যতম চরিত্র ‘হীরা

মালিনী’ নায়ক-নায়িকার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে আরকান রাজসভার কবি ‘দৌলত কাজী’ রচিত ‘সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী’ কাব্যেও নারীর বিভিন্ন চারিত্রিক রূপের বিবর্তন চোখে পড়ার মতো।

কালেক্রমে বাংলাসাহিত্য মধ্যযুগের সময় পেরিয়ে প্রজাপতির মতো গুটি কেটে গদ্যসাহিত্য প্রকাশ হতে থাকলে, নানারকম সামাজিক অবস্থার বর্ণনার মধ্য দিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। আর গদ্য সাহিত্যের ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়ে উপন্যাসের জন্ম সেকথা বিস্তারিত আলোচনা করার অপেক্ষা রাখে না। সূচনা মুহূর্তের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ থেকে আজকেরদিন পর্যন্ত যার ধারা প্রবহমান। মধ্যযুগের কাব্যে নারীকে যেভাবে প্রকাশ করা হত তার থেকে পরিবর্তিত রূপে নারীর বিচিত্র রূপ অঙ্কনে ঔপন্যাসিকরা প্রথম থেকে সিদ্ধহস্ত। বিভিন্ন আঙ্গিকে বিবর্তনের ধারাপথে নারীর জীবন বিশ্লেষিত হয়েছে কখনো পুরুষ ঔপন্যাসিকদের কলমে, আবার কখনো নারীর হাতে নারীর কথা সাহিত্যে অমরতা লাভ করেছে। প্রথম দিকের উপন্যাসের বিষয় হিসেবে ইতিহাস স্থান লাভ করেছে বেশী করে, তুলনায় সামাজিক উপন্যাসের আবির্ভাব পরবর্তীকালে। স্বাভাবিক ভাবে ইতিহাসের ধারাপথে নারীর পদচিহ্ন খুব দ্রুত বিলীন হয়ে গেছে। তাই প্রথম দিকের ঐতিহাসিক উপন্যাসে নারীর প্রাধান্য কম। এই প্রসঙ্গে ‘ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের’ মত হল—

“ক্রমপরিণতির দিক দিয়া বোধ হয় ঐতিহাসিক উপন্যাস সামাজিক উপন্যাসের পূর্ববর্তী। আমাদের বাস্তব পর্যবেক্ষণ শক্তি উপন্যাস ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিকশিত হইবার পূর্বেই আমরা ইতিহাসের কল্পনায় অনেকটা অবাস্তব রাজ্যে স্বচ্ছন্দ গতিতে বিচরণ করিতেছিলাম। উপন্যাস-রচনার প্রাথমিক যুগে সামাজিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাসই যে অধিক সংখ্যায়

রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই”।^(৩)

সামাজিক উপন্যাসের পর্যায়ে মানবজীবন ও সেই সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়াদি প্রকাশের মাত্রা লাভ করে। অবশ্য একবাক্যে স্বীকার করে নেওয়া যায় উপন্যাসের নিজেরই একটা মানবতাবাদী রূপ আছে। কারণ উপন্যাসের মধ্যে সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র চালিত হয় লৌকিক নিয়মে, সেখানে অদৃষ্ট অথবা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মতো দেব-দেবীর তেমন কোন হস্তক্ষেপ ঘটে না। শুধুমাত্র দেব-দেবীর প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া নয়, কোনরকম অলৌকিকতাকে উপন্যাসে স্থান দেওয়া যায় না। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র বাস্তব জগতের মানুষ, চারপাশে দৃশ্যমান অত্যন্ত চেনা মানুষ। তাই তাদের বিশ্লেষণ করতেও স্বাভাবিক ভাবে মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা দরকার। শুধুমাত্র উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করাই সমালোচকের কাজ নয়, তার সঙ্গে জীবন বোধ ও জীবনদর্শন সম্পর্কে উপন্যাসিকের কি মন্তব্য তা খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন একজন প্রকৃত সমালোচক। উপন্যাসের ঘটনাক্রমে কিভাবে মানব জীবনের বিচিত্র রূপ প্রতিফলিত হয়, তারই অন্বেষণে সাধারণত পাঠকের সজাগ দৃষ্টি থাকে। পাশাপাশি উপন্যাসিকের জীবন জিজ্ঞাসার কথাও পাঠকের লক্ষ রাখা দরকার। উপন্যাসিকের জীবনের সামগ্রিক উপলব্ধি প্রকাশ করতে গিয়ে সমালোচক ‘সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়’ লিখেছেন –

“জীবনের সামগ্রিক বোধ এবং Pattern-এর ব্যাপারটি পরস্পর ঘন সন্নিবদ্ধ একটি উপন্যাস থেকে আমরা শেষ পর্যন্ত জীবন খুঁজি না, জীবন সম্বন্ধে উপন্যাসিকের কী বক্তব্য সেইটাই সন্ধান করি। উপন্যাসের Pattern মানে অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেই অখণ্ড রসমূর্তি রচনা, যা পাঠকের রস-পিপাসার সর্বতোভাবে নিবৃত্তিসাধক— সেই Pattern লেখকের এই জীবন সম্বন্ধে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা হল লেখকের জীবনদর্শন”।^(৪)

‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাস পাঠকেরা প্রায় সকলেই মেনে

নিয়েছেন যে, লেখিকা সারাজীবন ধরে যা কিছু নিজের জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করেছেন তাই উপন্যাসের পরতে পরতে প্রকাশ পেয়েছে। কারণ তিনি তেমন ভাবে বিদেশী সাহিত্য বা উপন্যাসের তত্ত্বকে পাঠ করে লেখার জগতে আসেননি। নিজস্ব কর্মোদ্যমে জীবনের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতকে হেলায় তুচ্ছ করে জীবনের রূপদানে আজীবন নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সমকালীন সমাজকে নানাভাবে প্রতি-রূপায়িত করে সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আর তার জন্যই হয়তো আমরা ‘সত্যবতী’র মত মাটির কাছাকাছি থাকা বাস্তব চরিত্রকে তাঁর উপন্যাসে খুঁজে পাই। আসলে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ সাহিত্যের পাতায় যে সমাজের প্রতিচ্ছবি রচনা করেছেন, তা সমাজের যে কোন প্রান্তে খুঁজে বের করতে বেশী সময়ের দরকার হয় না। কেননা, তিনি যেমন রান্না ঘরের ভিতর থেকে পরিবারের সমস্তরকম খুঁটিনাটি সচেতন দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তেমনি বাইরের পৃথিবীকেও একই ভাবে বাড়িতে বসেই উপলব্ধি করেছেন। আর তাই স্বাভাবিক ভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন মহিলার লেখাকে সহজেই পুরুষ সমালোচকরা ‘মেয়েলি লেখা’ বলে কটুক্তি করেন। কিন্তু সমস্ত বাঁধাকে হেলায় তিরস্কার করে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ তাঁর লেখায় অব্যক্ত নারীর বেদনাকেই রূপদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পুরুষের প্রতিষ্ঠিত মঞ্চে পদার্পণ করেন। তাঁর লেখার বিষয় খুব সহজেই হয়ে দাঁড়ায় সমাজের নারী চরিত্রের বিচিত্র অবস্থান। আর সময়ের প্রেক্ষিতে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেছেন নারী-পুরুষের নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে। মেয়েরা সমাজের অর্ধাংশ, তাঁদের কথা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব নিয়েছিলেন লেখিকা ‘আশাপূর্ণা দেবী’। পূর্ববর্তী নারী-উপন্যাসিকদের তুলনায় উপন্যাস রচনায় সংখ্যার দিক থেকে যেমন বেশী, তেমনি বিষয়-বৈচিত্র্য ও জীবন পর্যালোচনার সমস্ত ব্যাপারে তিনি অগ্রবর্তিনী। তাঁর লেখার প্রধান উপজীব্য বিষয় মধ্যবিত্ত ঘরের চেনা-জানা চিত্র

পরিচিত মানুষ। আর বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সমস্যার মূল কেন্দ্রে রয়েছেন মেয়েরা। মরমী কথাকার ‘আশাপূর্ণা দেবী’ মেয়েদের অধিকারহীনতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তি, সুখ-দুঃখের, বেদনার, ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার কথা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর রচিত উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাসের কথা প্রসঙ্গে আলোচনা কালে সর্বাগ্রে ‘ট্রিলজী’র কথাই মনে আসে। তাঁর বিখ্যাত ‘ট্রিলজীর’ তিন নায়িকা রক্তের সম্পর্কে মা, মেয়ে ও নাতনি। প্রথমজন ‘সত্যবতী’, অন্যজন ‘সুবর্ণলতা’ আর শেষেরজন ‘বকুল’। তিনজন চরিত্র বিখ্যাত তিনটি উপন্যাসের নায়িকা। তবে একথাও বলতে হয় ‘আশাপূর্ণা দেবী’ রচিত অন্যান্য উপন্যাসগুলিও জনপ্রিয় ও সাহিত্যের দরবারে সমাদর পেয়েছে। ‘প্রেম ও প্রয়োজন’ যদিও তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস তবুও জনপ্রিয়তার খামতি থাকেনি। পরবর্তীকালের ‘অগ্নিপরীক্ষা’, ‘উন্মোচন’, ‘উত্তরণ’, ‘জহর’, ইত্যাদি উপন্যাসের কথাও একইভাবে বলা চলে। প্রতিটি উপন্যাসে আলাদা ভাবে একদিকে যেমন নূতন দিগন্ত সঞ্চারের কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি চির-অবদমিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, শোষিত, পীড়িত মেয়েদের কথা বলা হয়েছে। আসলে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ রচিত উপন্যাসগুলির সময়ের প্রেক্ষাপট উনিশ শতকের প্রারম্ভিক পর্ব থেকে শুরু করে বর্তমানকালের প্রারম্ভিকপর্ব পর্যন্ত। যখন গোটা বাংলাদেশে গৌরীদানের পূর্ণ লাভের জন্য আগ্রহী ছিলেন সমাজপতিরা। বিভিন্নরকম কুসংস্কারের মধ্যে সমাজের প্রতিটি মানুষ জর্জরিত ছিল। সেইসময় নারীশিক্ষা নিয়ে মিশনারীদের সামান্য উদ্যোগ চলছে শহরের বুকে। আর গ্রাম বাংলার নারীসমাজ সেসময় লেখা-পড়া তো দূরের কথা, নিজেদের সামান্যতম চাহিদাও মুখ ফুটে উচ্চারণ করার সাহস পেত না। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ সেই

মেয়েদের জীবন চিত্রিত করেছেন যারা কোনদিন বুঝতে পারেনি সব কিছু থাকতেও কেন তাদের কোন কিছুতেই অধিকার নেই।

‘আশাপূর্ণা দেবী’র প্রথম উপন্যাসের নাম ‘প্রেম ও প্রয়োজন’। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লেখিকার স্বতন্ত্র মানসিকতা স্পষ্টতর হয়ে যায়। সমসাময়িক সমাজকে উপন্যাসে প্রকাশ করার রীতি সূচনালগ্ন থেকেই চলে এসেছে। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটকে বেশীরভাগ উপন্যাসে প্রেক্ষিত হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ‘প্রেম ও প্রয়োজন’ উপন্যাসে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের আনুমানিক চল্লিশের দশকের প্রেক্ষাপটের কাহিনী। কয়েকটি মধ্যবিত্ত (আর্থিক দিক দিয়ে) পরিবারের কথা তুলে ধরে কাহিনীর বয়ান তৈরি করা হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে একদল ছেলের নাম উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে, পূর্বজ উপন্যাসিকদের প্রচলন করা প্রথাকে কিছুটা আমল দিয়ে পুরুষের পরিচয়ে নারী চরিত্রের অবতরণ। নারীকে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিতির জগতে নিয়ে আসার দক্ষতা লেখিকা প্রথম উপন্যাসে দেখাতে পারেননি। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় ‘প্রবীর’, ‘অমরেশ’, ‘কালো গৌরাজ’, ‘সমর’, ‘বিজয় মল্লিক’ সবাই একটি পাড়ায় বসবাস করে। তাদের পারিবারিক বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের একটি করে কাহিনীর সূত্রপাত। আবার একটি কাহিনীর সঙ্গে আর একটি কাহিনীর যোগের মধ্য দিয়ে নতুন একটি সম্পূর্ণ কাহিনীর অবতরণ। আর এই পুরুষ চরিত্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত নারী চরিত্রগুলি উপন্যাসের কাহিনীর মোড়কের মাঝেই উঠে আসে। ‘প্রবীরের’ মা ‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’ এবং তার পালিতা কন্যা ‘মন্দিরা’, ‘অমরেশের’ বিধবা পিসি ‘কৃষ্ণবালা’, বৌদি ‘আরতি’ প্রমুখ নারী চরিত্র। নারীর সামাজিক অধিকারের প্রশ্নে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ পূর্বজ উপন্যাসিকদের থেকে কিছুটা ঋণ নিয়েও স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পেরেছেন। অবশ্য তাঁর পক্ষে

প্রথম লেখা উপন্যাসেই স্পষ্ট করে সেকথা বলা সম্ভব ছিল না। তিনি নারীকে সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করার অবকাশ দিয়েছেন চারিত্রিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। ‘প্রেম ও প্রয়োজন’ উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলির সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করতে নারী চরিত্রগুলির সার্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে। উপন্যাসটিতে ‘আরতি’ নামে নারী চরিত্রটির দাম্পত্য সম্পর্কের কথাই শুধু বেশী করে তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য বাকি চরিত্রগুলির প্রাক-দাম্পত্য ও অন্ত-দাম্পত্যের পর্যায়ে কথা কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ‘আরতির’ স্বামী ‘অখিলেশ’ একসময় অফিসের চাকরি করে সংসারের ঘানি টানতো। একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি সাধক। কিন্তু হঠাৎ ‘অখিলেশের’ সংসারের প্রতি মায়া কমে যায় একজন সাধুর শিষ্য হয়ে সন্ন্যাসীর জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। সমস্ত দায়-দায়িত্ব ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়ে উদাসীন জীবন যাপন করতে থাকে। সাধনায় ব্যাঘাত ঘটছে বলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সাধুবাবার চরণে উৎসর্গ করে দেয়। একমাত্র সন্তানকে নিয়ে ‘আরতি’ অথৈ জলে পড়ে। অর্থাভাব আর অনাহারের কবলে পরে হঠাৎ কলেরা রোগে সন্তানটি মারা যায়। ‘আরতি’ কোনমতেই স্বামী ‘অখিলেশ’কে তার সন্তান হারানোর জন্য ক্ষমা করতে পারে না। নিজেকে মুক্ত করতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়, সাহায্য চায় পাশের বাড়ির যুবক ‘প্রবীরের’ কাছে। ‘প্রবীর’ মানসিক দিক দিয়ে বহুদিন আগে থেকে প্রস্তুত ছিল এই নরক যন্ত্রনা থেকে ‘আরতি’কে মুক্ত করার জন্য। তাই স্বাভাবিক ভাবে সে এই ঘিঞ্জি গলির চাপান-উতর থেকে তাকে মুক্তির সন্ধানে নিয়ে যায়। যেদিন ‘আরতি’ দীর্ঘদিনের মায়া বন্ধন ছিন্ন করে সংসার ত্যাগ করে চলে যায়, অপমান বোধে ‘অখিলেশ’ আত্মহত্যা করে। খুব স্বাভাবিক ভাবে বোঝা যায় যে ‘অখিলেশ’ সন্ন্যাসী হয়নি। সংসারে বৃত্তের বাইরে তার নজর ছিল না। শুধুমাত্র ভণ্ড ধার্মিক হয়ে সে উদাসীন জীবন যাপন করতে ভালোবাসত। আর সে তার

স্ত্রীকে রেখেছিলো গৃহবন্দী করে। যেদিন তার পুরুষত্বের গায়ে আঘাত লেগেছে, নপুংসকতার পরিচয় দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ‘আরতি’ আর ‘প্রবীর’ নতুন করে জীবন শুরু করার জন্যই, পুরাতন সমস্ত কিছু ত্যাগ করে চলে গেছে। যখন তারা জীবনের প্রয়োজনেই নিজেদের অনেকটা কাছাকাছি চলে আসে, তখন ‘প্রবীরের’ মুখে একেবারে বাস্তব সংলাপ দিয়ে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তোলেন লেখিকা। প্রবীরের সংলাপ –“...আজ আর স্বীকার করতে লজ্জা করব না এ শুধু একদিনের দয়ামায়া নয়, যখন তোমার সঙ্গে না ছিল পরিচয়, না ছিল চোখের দেখা, তখন থেকে প্রতিনিয়ত তোমার বঞ্চিত জীবনের গ্লানি আমাকে পীড়া দিয়েছে, তোমার ক্ষোভের বেদনা অহরহ করেছে আকর্ষণ। অমরেশ যখন পালালো তখন কি ইচ্ছে হয়েছিল জান আরতি? ইচ্ছে হয়েছিল—সেই নিষ্ঠুর দৈত্যপুরীর কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসি তোমাকে। নিজের মনকে সবসময় বিশ্বাস করতে পারতাম না বলেই এড়িয়ে যেতাম তোমার সঙ্গ। আজ দৈব ও দুদৈব যাই বল দুজনকে সংসারের গণ্ডির বাইরে এত কাছাকাছি এনে ফেলেছে বলেই হয়তো এত বড় অসম্ভব কথা শোনানোর দুঃসাহস হল। তাই বলছি — তোমার সব ভার বইবার সৌভাগ্য আমাকে দাও আরতি”^(৫)। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে একজন নারী ঔপন্যাসিক কী কঠিন দুঃসাহসে এরকম একটি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। যেখানে ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ ও ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ কলম নামিয়ে রেখেছেন, সেখান থেকেই নতুন করে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ শুরু করেন। তিনি কত স্বাভাবিক ভাবে একজন বিধবা নারীর নতুন দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। যে অধিকার পূর্বে ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ তাঁর সৃষ্ট অন্যতম নারীচরিত্র ‘বিনোদিনী’ অথবা ‘দামিনী’কে দিতে পারেননি। ঠিক যেমন দিতে পারেননি ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ তাঁর সৃষ্ট ‘রমা’ আর ‘অচলা’কে। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ প্রথম উপন্যাসের মধ্যে এতদিনের জমাট বাঁধা অথচ বহুআলোচিত বিধবা নারীর নব-দাম্পত্য জীবনকে স্পষ্ট করে উল্লেখ

করেন। আর তাই তিনি উপন্যাসের অন্যতম নায়ক চরিত্র হিসেবে ‘প্রবীর’কে দাঁড় করিয়ে প্রমাণ করতে চান, একজন বিধবার সঙ্গে কঠিন সমাজ-বাস্তবতায় দাম্পত্য জীবন শুরু করার পর কোন অনুশোচনা বা অবৈধ-প্রেমের অজুহাত তাকে টলাতে পারেনি। আসলে ‘আরতি’ চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীত্বের নিষ্ঠুর অবমাননার বিরুদ্ধে ‘প্রবীরের’ মাধ্যমে ঔপন্যাসিক একটি জোরালো সামাজিক প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নারী আপন ভাগ্য আপনি জয় করতে পারবে তার পরিবেশ তখনও তৈরি হয়নি। তাই পুরুষের সহযোগিতায় নারীত্বের অপমানের, বঞ্চনার জবাব দিতে পুরুষকেই দাঁড় করান রঙ্গমঞ্চে। অবশ্য পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতে ঔপন্যাসিক আর তেমনভাবে পুরুষের সহযোগিতা না নিয়েই ‘সত্যবতী’, ‘সুবর্ণলতা’ ও ‘বকুলের’ মতো নারীচরিত্র তৈরি করেছেন যারা নিজেরাই পারে নিজের ভাগ্যকে জয় করতে।

আলোচ্য উপন্যাসে ‘আরতির’ যেরকম দাম্পত্য সম্পর্কের কথা লেখিকা উল্লেখ করেছেন তাতে করে নারীত্বের অবমাননার কথাই বার বার উঠে এসেছে। কিন্তু শতগুণা ও অপমানের পরেও যে নারী সংসারের সুখের জন্য মুখ বুজে থাকে, তাকেই একসময় জয়ী করিয়েছেন ঔপন্যাসিক বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর মধ্য দিয়ে। আর সেই প্রেক্ষাপটে জীবনের সমস্ত গ্লানি ও পিছুটান মুছে দিয়ে ‘আরতির’ মতো নারী বেছে নেয় জীবনের সঠিক রাস্তা। সে যেমন করে ‘প্রবীরের’ সঙ্গে নতুন করে দাম্পত্য জীবন শুরু করে, তাতে করে একজন নারীর যথাযথ সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করা হয়। এখানেই ঔপন্যাসিক হিসেবে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ সার্থকতা।

‘প্রেম ও প্রয়োজন’ উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে নারীত্বের

প্রসঙ্গ অথবা নারীর সামাজিক অবস্থানের কথা বলতে গিয়ে ‘অরুণ কুমার বসুর’ একটি মন্তব্য তুলে ধরা দরকার। তিনি ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’ তৃতীয় খণ্ডের’ ভূমিকায় লিখেছেন—

“‘প্রেম ও প্রয়োজন’ উপন্যাসে তিনি বাঙালী হিন্দু পরিবারের অনেক নীচতা ও সংকীর্ণতা পরশ্রীকাতরতা অনুদারতার বিবরণ দিয়েছেন, ভঙ্গি অন্যরকম হলেও যা শরৎচন্দ্রকে অবশ্যই স্মরণে আনে। ...কিন্তু যা উপন্যাস পাঠের পরম প্রাপ্তি তা ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ অমিতসাহসিকা বিদ্রোহিনী সত্তা। আরতিকে নিয়ে প্রবীরের সংসার স্থাপনের যে উদাহরণ এখানে তিনি পেশ করেছেন, তা শিকলভাঙা প্রেমের জয়গান নয়, তা তাঁর নারীমুক্তি চেতনার একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত”^(৬)।

নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ ভূমিকা প্রনোধানযোগ্য। প্রথম উপন্যাসে এরকম দৃঢ় পদক্ষেপ ভাবিকালের পাঠকের কাছে নতুন যুগের দুয়ার খুলে দিতে পারে।

আমাদের সমাজে নারীদের যেভাবে পণ্যবস্তু হিসেবে গণনা করা হয় তার একটা পূর্ব ইতিহাস আছে। “অস্বীকার করার উপায় নেই যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তির পরেই সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের তাগিদে উত্তরাধিকার সৃষ্টির বিষয়টি মানুষের বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের মাঝে এক বিশাল পরিবর্তন নিয়ে এল। নিজের গর্ভের সন্তানের (মূলত পুত্র সন্তান) প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার ফলেই বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করে মানুষ। আগে যে পুরুষের পালিত জীব জন্তু এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীর সংখ্যা যত বেশী ছিল সমাজে তার প্রতিষ্ঠাও ছিল তত বেশী”^(৭)। উদ্ধৃত উক্তি থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে গৃহপালিত পশু মানুষের অর্থনৈতিক দিকে প্রতিষ্ঠা দিতো। কালক্রমে

গৃহপালিত পশুর সঙ্গে নারীকেও গণনা করা শুরু হতে থাকে, এবং নারী হয়ে ওঠে পুরুষ পরিচালিত সমাজের পণ্য সামগ্রী। যে দলে অথবা দলপতির কাছে নারীর সংখ্যা বেশী থাকবে তিনি তত বেশী বিত্তবান বলে মনোনিত হয়ে আসতেন। তাছাড়া আর একটি বিষয় নারীর সংকটের অন্যতম কারণ, প্রাচীনকাল থেকে যত বড় যুদ্ধ হয়েছে তার পেছনে মূল কারণ ছিল অশ্ব, উট, হাতি প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর সঙ্গে নারী লুণ্ঠনের বিষয়। নারীর কোন জাত থাকতো না, প্রাচীনকালে জলের মতো নারী যে পুরুষের কাছে থাকতো তার পরিচয়ে পরিচিত হত। এই ধারা যে আজ প্রবহমান তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ জন্মের পর নারী পিতার পরিচয়ে পরিচিত, বংশানুক্রমে পিতার উপাধি(Surname) নারীকে গ্রহণ করতে হয়, বিবাহের পরে স্বামীর উপাধিতে পরিচিত হতে হয়। একালের বিখ্যাত নারীবাদী সমালোচক ‘সুতপা ভট্টাচার্য’ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন –

“প্রাচীন ভারতে নারীকে যে মানুষ বলে গণ্য করে নি, তা আরও স্পষ্ট হয় তার সমাজ বিন্যাস লক্ষ্য করলে। চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজে নারীর কোন বর্ণ? নারী যে ব্রাহ্মণ হতে পারে না, ব্রাহ্মণের কন্যা বা জায়া হলেও—এতো সকলের জানা, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের কিংবা বৈশ্যের ঘরে জন্মে নারী কি ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের অধিকার লাভ করে? পিতা বা স্বামীর পরিচয় অনুসারে নারী পরিচয় পায়, তার নিজের কোন পরিচয় নেই, কোন বৃত্তি নেই। প্রাচীন ভারতের নারী তাই পুরুষের হাতের যন্ত্র, খেলার পুতুল, ভোগের উপকরণ”^(৮)।

এইসমস্ত কারণে হয়তো নারী ঔপন্যাসিকরা প্রথম থেকেই বহুদিনের এবং বংশানুক্রমে প্রাপ্ত এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য প্রতিটি ছত্রে যেন প্রশ্ন করেছেন, নারী কবে মানুষ হবে? যেমন করে ‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’ তাঁর ‘ছায়াপথ’ উপন্যাসের নায়িকা ‘সুপ্রিয়ার’ মধ্য দিয়ে অনেকগুলি প্রশ্ন করেছেন সমাজপতিদের উদ্দেশ্যে। যার কোন উত্তর কারো জানা নেই। সুপ্রিয়ার প্রশ্নগুলি

যেন প্রতিবাদের দৃঢ় ভাষা। ‘পুরুষেরা নারীকে নিয়ে ঘর করে, কিন্তু শ্রদ্ধা কোথায়? সম্মান কোনখানে? সম্ভব কই’? আমরা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও যেন কোনরকম উত্তর দিতে পারি না।

‘আশাপূর্ণা দেবীর’ প্রতিটি উপন্যাসে নারীর সামাজিক অবস্থানের ভিন্নতা অবশ্যই চোখে পড়ার মতো। প্রথম উপন্যাসে যেভাবে নারী চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন তারই ধারা বজায় থেকেছে পরবর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে। সামগ্রিক ভাবে তাঁর সমস্ত উপন্যাসের আলোচনা করা সম্ভব নয়, তাই বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলির দাম্পত্য জীবনের নিরিখে সামাজিক অবস্থান আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য একটি কথা স্বীকার করে নিয়ে বলা ভালো, বাংলা সাহিত্যের মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ সমাজের প্রচলিত বহুমানব চরিত্রকে বেশী পরিমাণে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতো করে অন্যকোন ঔপন্যাসিক তেমনভাবে ব্যক্তি, পরিবার ও গার্হস্থ্যজীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করেননি। একান্নবর্তী পরিবারের কথা তাঁর অনেক উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ নিজের জীবনে যা দেখেছেন ও উপলব্ধি করেছেন তাই তাঁর রচিত উপন্যাসের পাতায় তুলে ধরেছেন। আর তাই একান্নবর্তী পরিবারের চিত্ররূপ তার জীবনাভিজ্ঞতার ফসল। প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস হিসেবে ‘মিতির বাড়ি’ উপন্যাসটির নাম করা যেতে পারে। উপন্যাসটির নামকরণের মধ্যেই ঔপন্যাসিক বিষয় ও চরিত্রের পরিচয় দিয়ে পাঠককে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। পাঠককে শুধু উদ্ধার করতে হয় কিভাবে লেখিকা বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন, কারণ পরিবেশনই হল সৃষ্টিকর্তার নির্মাণের ভিত্তি।

মিতির বাড়ি’ উপন্যাসের শুরুতেই যে নারী চরিত্রটি চোখে পড়ে তার নাম ‘উমাশশী’। বহুদিন আগেই সে দাম্পত্য সম্পর্কের পাট চুকিয়ে দিয়ে বাবার বাড়িতে এসে বটবৃক্ষের মতো শিকড় তাড়িয়ে বসেছে। কিন্তু বাড়ির কর্তার কাছে সে একজন সেবিকা ছাড়া অন্য কিছু নয়। ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ আলোচ্য প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে লিখেছেন—‘উমাশশী তাঁহার নিজের মেয়ে বলিয়ায় শুধু নয়, বিধবা মেয়ে বেওয়ারিস মাল, তাই প্রথম পর্বে তাকেই তলব দেওয়া সহজ’। একজন পিতা তার মেয়েকে কাজের জন্য কিভাবে ডাকবেন সেই প্রসঙ্গে লেখিকার উদ্ধৃতি উল্লেখ করার মতো। তবে চরিত্রটির সম্পর্কে খুব অল্প কথায় বলা যায় যে ‘সমস্ত দিকের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে বলে নেহাত ঠেকায় পড়ে পিতার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার নিরিখে বহুদূরে উড়ে যাবার ক্ষমতা থাকলেও, কুসংস্কারের শিকলে নারীদের পা বাঁধা থাকতো পরিবারের গণ্ডিতে। তাই নিজের মতো করে জীবন যাপনের সাহস জুগিয়ে উঠতে পারেনি ‘উমাশশীর’ মতো শত-সহস্র বাঙালী বাল্য বিধবা নারীরা। তাই ‘উমাশশী’ও ক্রমশ নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে মিতির বাড়ির একান্নবর্তী সংসারের সঙ্গে।

আলোচ্য উপন্যাসে চল্লিশের দশকের কোলকাতার এক জীর্ণ পুরাতন বাড়ির একান্নবর্তী পরিবারের কথা বলা হয়েছে। পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা তেত্রিশ জন, একে অপরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে তারা একে অপরকে দোষারোপ করেই দিন কাটায়। বাইরের জগতের স্রোত এদের হৃদয় স্পর্শ করে না, সর্বদাই শুধু চলে পরনিন্দা পরচর্চা আর কলহ। কেউ কারো উন্নতি দেখলেই ঈর্ষার বশে ক্ষতি করার পরিকল্পনা করে। একই ছাঁদের তলায় বাস করলেও পরিবারের সবাই একে অপরের শত্রু। আলোচ্য প্রসঙ্গে বিখ্যাত উপন্যাস সমালোচক ‘শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়’

লিখেছেন –

“মিতির বাড়ি’ বহু পরিজন সমবায়ে গঠিত একটি যৌথ পরিবারের চিত্র। গৃহকত্রী হেমলতা ও তাঁহার কনিষ্ঠ জা-এরা, অনেকগুলি ভ্রাতা ও তাঁহাদের স্ত্রী সন্তান কয়েকজন পিতৃ গৃহাশ্রিতা বিধবা কন্যা ও এক সদ্য বিবাহিতা তরুণ পুত্রবধূ— এইগুলি মিলিয়া এক বৃহৎ জটিল শাখা-প্রশাখায় বিসর্পিত সংসার। বাহিরের এই শিথিল ঐক্য ঈর্ষা-দেষ-কলহ-তীক্ষ্ণ বাক্য বিনিময় ও ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার অভিঘাতে সর্বদা বিড়ম্বিত। ইহার মধ্যে কয়েকটি মাত্র নর-নারী ব্যক্তিত্ব চিহ্নাঙ্কিত বাকি সকলে একান্নবর্তী পরিবারের আসবাব-পত্রের সামিল। উহাদের ভিড়ে পদে পদে হোঁচট লাগে, স্বচ্ছন্দ বিচরণ করার স্থান সংকুচিত হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাত-সংঘাতে বাঁকা-চোরা হইয়া উঠে। এক সংসারকে জানিলেই সব সংসারকে জানা হয়; উহাদের বহির্বিন্যাস একটু-আধটু ভিন্ন; অন্তঃপ্রকৃতি হুবহু এক। কখনও কখনও বাহিরের আগন্তুক আসিয়া পরিবারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতকে আরও তীব্র ও জটিল করিয়া তোলে। এই বিক্ষুব্ধ পরিবেশে জীবনের যে রূপ দেখা দেয় তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও বিকৃত। এমন কি উদার, আদর্শবাদী মনও এই গ্লানিময় পরিবেশে বৃথা সংগ্রামে আত্মক্ষয় করে ও সহজ, প্রসন্ন স্বার্থকতা হইতে বিচ্যুত হইয়া এক চিত্তদাহকারী দাবানলে সমস্ত সুন্দর ও সুকুমার বৃত্তিকে ঝলসাইয়া ফেলে”^(৯)।

এরকম পরিবারের কথা ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ বহুউপন্যাসে লক্ষ করা যায়। একান্নবর্তী পরিবারগুলির মধ্যে নারীর পারিবারিক অবস্থান ও সামাজিক মর্যাদা কতটা আছে, তা নির্ধারণ করার জন্য উপন্যাসিকের অনেক গবেষণার নির্যাস হল এক একটি উপন্যাস। নারীরা অবগুষ্ঠনের তলায় থেকেও কিভাবে ধীরে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে সমাজের অর্ধেক আকাশ অধিকার করে, তার ধারাভাষ্য যেন আমরা পাঠ করতে পারি তাঁর উপন্যাসে। তিনি ‘মিতির বাড়ি’ উপন্যাসে যে নারী চরিত্রগুলি নির্মাণ করেছেন, তারা যেন তাঁরই অঙ্গুলী নির্দেশে কখনো

প্রতিবাদ করেছে আবার কখনো নিয়মের বন্ধনে থেকেও স্বপ্ন দেখেছে দূর আকাশে উড়ে যাওয়ার। মিত্তির বাড়ির নারীদের মধ্যে অনেকেই গৃহবধু, দু'একজন দাম্পত্য জীবনের স্বাদ ভুলে বৈধব্য জীবন যাপন করেছে। আলোচ্য উপন্যাসে দুজন নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে আলোচনার দাবি রাখে। কারণ দুজনই যুগের নিরিখে প্রতীকধর্মী চরিত্র। একজন গৃহকর্ত্রী 'হেমলতা' আর অন্যজন তারই নাতবৌ 'সুরেখা'। দুজনের মধ্যে একটা কালের ব্যবধান। একজন সংকীর্ণমনা, অন্যজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বময়ী। প্রথমজন কারণে অকারণে নিজের ক্ষমতার দন্ডে অন্ধ হয়ে ক্রোধে সবাইকে ভস্মীভূত করতে চায়, আর দ্বিতীয়জন সেবায় গুশ্রষায় ক্ষমা সুন্দর ব্যবহারে সমস্ত কিছুকে নিষ্কলঙ্ক করে তুলতে চায়। দ্বিতীয়জন অর্থাৎ 'সুরেখা' হল আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা, 'আশাপূর্ণা দেবীর' সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। আমরা খুব সহজে 'সত্যবতী', 'সুবর্ণলতা', 'বকুল'দের সঙ্গে 'সুরেখার' নাম উচ্চারণ করতে পারি। 'সুরেখা' মিত্তির বাড়ির সকল সদস্যদের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করেছে। সকলকে মেনে নিয়ে সংস্কার করার প্রচেষ্টা তার মধ্যে আছে। কিন্তু 'দশচক্রে ভগবান ভূত' এর মতো অবস্থা হয়েছে 'সুরেখার'। কেউ তাঁকে বুঝে সঙ্গ দেয়নি, উল্টে প্রতিবাদ করেছে তার আধুনিকতার বিরুদ্ধে। 'আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী পঞ্চম খণ্ডের' ভূমিকায় 'নিতাই বসু' আলোচ্য প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“সুরেখা আধুনিক মনের ব্যক্তিত্ব সম্পন্না মেয়ে। তার নিজস্ব বিচারবোধ আছে, কিন্তু তার স্বামী মনোজ ওই বাড়ির ছাঁচে গড়া ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ। সুরেখা অবশ্য ওদের সংসারে মানিয়ে নিতে চেষ্টার ক্রটি করেনি। কিন্তু সে ওদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেনি। মানুষ যে কত নির্মম কঠিন রুঢ় ও সংকীর্ণ হতে পারে, তা মিত্তির বাড়ির বউ হয়ে না গেলে সুরেখা কখনও বুঝতে পারত না। প্রত্যেকে যেন প্রত্যেককে আঘাত করার জন্য সর্বদা উদ্যত। ওরা মনুষ্যত্বের কোন মূল্য দেয় না। অসহিষ্ণু অসন্তুষ্ট কতকগুলো জীব যেন দৈবক্রমে

জট পাকিয়ে এক জায়গায় পড়ে আছে। সত্যিকারের কোন বন্ধন নেই, সবাই যেন নিরাশ্রিত। মর্যাদাবোধ নেই, আছে নিছক আস্থাশালন; ক্ষমা নেই, আছে শুধু বিচার করার নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া; করুণা নেই, আছে শুধু নির্মম শাসনের প্রয়াস”^(১০)।

‘সুরেখার’ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সমালোচক ‘নিতাই বসু’ চারপাশের বৃত্তে থাকা অন্যান্য চরিত্রগুলি সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। তবে দাম্পত্য সম্পর্কের বৃত্তে থেকে সবচেয়ে বেশী প্রস্ফুটিত চরিত্র হল ‘সুরেখা’। যে মিত্তির বাড়ির একান্তবর্তী পরিবারের অন্তঃপুরের প্রচলিত নিয়ম রীতি ভেঙে, আধুনিক মানসিকতায় সামাজিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। গৃহকর্তী ‘হেমলতার’ দুর্দান্ত শাসনের মধ্যে থেকেও শেষ পর্যন্ত নিজের স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পেরেছে। সে যেন সরল রেখার মতো ঋজু মনোভাব নিয়েই এই সংসারের সিংহদুয়ারে পা রেখেছিল। শ্বশুরবাড়িতে প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিল ‘হেমলতার’ দাপট; তবু কোন ভয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ না থেকে লড়াই করেছে সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ গৃহকর্তী ‘হেমলতার’ দাপটের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন —“বাহিরের লোক লৌকিকতা আচার ব্যবহারেই হোক, অথবা সংসারের আয় ব্যয় অনুসারে বিহার ব্যসন বিলাসের হিসাব কষাতেই হোক, তাঁহার উপর কাহারও কথা কহিবার হুকুম নাই”^(১১)। এইরকম প্রতিকূল অবস্থাতেও ‘সুরেখা’ ব্যক্তিগত নারী স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়। আর যার ফলে জগদল পাথরের মতো আঁকড়ে থাকা মিত্তির বাড়ির কুসংস্কারের ভিত নড়ে যায়। যেখানে মিত্তির বাড়ির কোন নারীর বাইরের আলো দেখা নিষিদ্ধ ছিল, সেখানে ‘সুরেখা’ জ্ঞানেরআলোয় সমস্তরকম নিষিদ্ধতা দূর করে দেয়। সে নিজেই স্বামীর সঙ্গে পার্কে লেকচার শুনতে গিয়ে প্রথম বাইরের জগতের সঙ্গে মেয়েদের মেলামেশার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু তার এই কাজে গৃহকর্তী অপমানিত বোধ করে সংসার ত্যাগ করে কাশীবাসী হয়। বাড়ির সকলে ‘সুরেখা’কে ক্ষমা চেয়ে নিতে বললেও, সে তাতে রাজি হয়নি। সে

নিজের জেদে ও সংস্কারের জোড়ে অটল ছিল। আমরা যেন এখানে ‘সুবর্ণলতার’ সঙ্গে ‘সুরেখার’ মিল খুঁজে পাই। ‘সুবর্ণলতা’ যেমন অন্যায়কারী শাশুড়ির পা ধরে ক্ষমা চায়নি; সুরেখাও তেমনি বিনাঅপরাধে পিসিশাশুড়ির পা ধরে ক্ষমা চায়নি। ‘সুরেখা’ বুঝতে পেরেছিল মাথানত করে নয়, অপমানের বোঝা বহন করে নয়, যথাযোগ্য অধিকার নিয়ে স্বামীর বাড়িতে বাস করতে হবে। আর তাই প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করে সে বলে—“তোমাদের মিত্তির বাড়ির মান অপমানের মানদণ্ড এতো সুস্পষ্ট যে নিশ্চয় ফেলতেও ভয় করে, হিসাব কষে ফেলতে হয়। কি জানি পাগ্লা নেমে গেল বুঝি। ...সেদিন মেজকাকার সামনে খবরের কাগজ পড়ে ফেলেছিলাম, শুনলাম সেটা তার পক্ষে অপমান। ...মাথা ধরেছে বলে মায়েদের কিছু আগে গুতে এসেছিলাম, শুনলাম সেও নাকি গুরুজনের পক্ষে অপমান। ...বারোমাসে এ মান-অপমানের ট্যাক্স যোগানো কি সত্যি সম্ভব”^(১২)। সম্ভব যে কোনদিনই ছিলনা তা সকলেই জানতো, কিন্তু কেউ কোনদিন কোন প্রতিবাদ করেনি। আর তাই ‘সুরেখা’কে দেখে অন্যান্য নারী চরিত্ররাও একটু একটু করে পরিবর্তন হতে থাকে। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি সামাজিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে মিত্তির বাড়ির সকলেই মানবিক মর্যাদার কথা মনে নিয়েছে। আলোর দিশা দেখানোর জন্য ‘সুরেখা’ সকলের অগ্রজের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই স্বাভাবিক ভাবে ‘সুরেখা’ চরিত্রটিকে আমরা সহজেই ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র হিসেবে ধরে নিতে পারি। ব্যক্তিত্বময়ী স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য তার স্বামী মনোজ ও মিত্তির বাড়ির পরিবারের সকল সদস্যকে একইসঙ্গে সংস্কারের বন্ধনে জড়াতে পেরেছে। তাই সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে আলোচ্য চরিত্রটি আলাদা করে সম্মানের দাবীদার বলে মনে করা যেতে পারে।

‘আশাপূর্ণা দেবী’ নারীচরিত্রের বিভিন্নরূপ অঙ্কন করেছেন

বহুউপন্যাসে ঘটনাবর্তের মধ্য দিয়ে। প্রতিনিধি স্থানীয় নারী চরিত্রগুলিকে আমরা দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে বিশ্লেষণ করতে পারি। ‘মিতির বাড়ি’ উপন্যাসের ‘সুরেখা’ চরিত্রটিকে বধু রূপে আমরা দেখতে পাই। একজন গৃহবধু তার দাম্পত্য জীবনে কিভাবে স্বামী ও অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সামলে নেয়, সেকথা আমরা ‘সুরেখা’ চরিত্রের মধ্য দিয়ে জানতে পারি। কিন্তু একজন নারীকে গৃহবধু হিসেবে কোন গৃহে আসার আগে, পিতৃগৃহে কন্যারূপে লালিত-পালিত হতে দেখা যায়। তাই ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাসে যেসমস্ত নারীচরিত্র কন্যারূপে বালিকা বয়সেই স্বামী ও দাম্পত্য জীবন নিয়ে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবন কাটায়, তাদের কথাই বেশী করে আলোচনা করা যেতে পারে। ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ যেসমস্ত উপন্যাসে বালিকাবধু বা কন্যা চরিত্রগুলি দেখা যায়, তার একটা তালিকা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

উপন্যাসের নাম	উপন্যাসে বালিকাবধুর নাম
‘অগ্নিপরীক্ষা’	তাপসী চরিত্র।
‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’	সত্যবতী ও সুবর্ণলতা চরিত্র।
‘সুবর্ণলতা’	সুবর্ণ ও বকুল চরিত্র।
‘বকুলকথা’	নমিতা, রেখা ও শম্পা চরিত্র।
‘শশীবাবুর সংসার’	সুমিত্রা চরিত্র।
‘নেপথ্য নায়িকা’	মাধবী চরিত্র।
‘দিনান্তের রঙ’	নীতা চরিত্র।
‘নিলয় নিবাস’	লুসি চরিত্র।
‘তনুশ্রীর জন্ম’	তনুশ্রী চরিত্র।
‘লীলা চিরন্তন’	মৌমিতা চরিত্র।

উপন্যাসের নাম	উপন্যাসে বালিকাবধুর নাম
‘মিতির বাড়ি’	সুরেখা চরিত্র।
‘তুলির টানে আঁকা’	তুলি চরিত্র।
‘দ্বিতীয় বসন্ত’	লতিকা চরিত্র।
পাখির খাঁচা ও খাঁচার পাখি	কনক চরিত্র।
‘নীলপর্দা’	রীণা চরিত্র।
‘অবগুপ্তিতা’	শেফালি, সুনন্দা ও উদিতা চরিত্র।
‘নিমিত্ত মাত্র’	সর্বাণী ও সুরভি চরিত্র।
‘ছোট সে তরী’	চারুলতা ও বাবলি চরিত্র।

‘অগ্নিপরীক্ষা’ উপন্যাসটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক ‘অরুণ কুমার বসু’ লিখেছেন—“শরৎচন্দ্রের পারিবারিক কাহিনীর উত্তরাধিকার বহন করেই আশাপূর্ণা দেবী তাঁর প্রতিষ্ঠা আদায় করে নিয়েছিলেন, একথা সত্যি। তাই ভুল বুঝাবুঝি, সত্য গোপনের কানামাছি খেলা; তাই নিয়ে সৃষ্ট চরিত্রের মনে টেনশন ঘনিয়ে তোলা, আর সমাপ্তির কাছে এসে মধুর আবেগমোক্ষণ —এই জাতীয় গল্পের সাধারণ লক্ষণ। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় ‘আশাপূর্ণা দেবী’ জনপ্রিয় চিত্রমুখী এই প্লট রহস্যটি আয়ত্ত করেছিলেন, যা তাঁর বহু উপন্যাস পাঠ জনিত মেধারই পরিচায়ক। অগ্নিপরীক্ষা তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ”^(১৩)। ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের’ উপন্যাসের কিছু নারীচরিত্রের বাল্যকালেই বিবাহ হয়ে বৈধব্যবরণ করতে হয়েছে, এদের মধ্যে ‘মাধবী’, ‘রমা’, ‘শুভদা’, ‘সাবিত্রী’, ‘হেমললিনী’, ‘সুরমার’ মতো নারীচরিত্রের নাম করা যেতে পারে। আবার এমন কিছু চরিত্র আছে যারা বাল্যবিবাহ করার পরেও দাম্পত্য জীবনের কোথাও কোন খামতি আসেনি। আসলে নারীর জীবন বহুরূপে

সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে আসছে উপন্যাস রচনার প্রারম্ভিকলগ্ন থেকে। কারণ নারীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ে সমস্ত লেখকদের সমবেদনার অভাব কোন কালেই দেখা যায়নি। ‘শরৎচন্দ্রের’ সময়েও সমাজ ও সমাজপতিদের অনুশাসনে নারীরা বিভিন্ন দিকে কোণঠাসা হয়ে থাকত। আর তাই হয়ত যাঁদের চোখের জলের হিসেব কেউ রাখলো না, তাঁদের কথা বলতে গিয়ে ‘শরৎচন্দ্র’ কলম তুলে নিয়ে ছিলেন। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি তাই উপন্যাসের পরিণতিতে হয় সমাজপতিদের বিধান মেনে নেয়, অথবা আত্মত্যাগ করে জীবনযাপন করে। বেশীরভাগ নারীকে তার প্রেমের বলিদান দিতে হয়েছে ‘শরৎ সাহিত্যের’ আনুকূল্যে। শরৎ সাহিত্যে নারী প্রসঙ্গে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ নিজে একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, “শরৎচন্দ্র একটা আলাদা জগতের চেহারা পেয়েছিলেন। তিনি মেয়েদের মনোজগতের ছবি দেখেছিলেন। সেখানে তিনি ঘরোয়া মেয়েদের মধ্যেও যে শক্তি, দৃঢ়তা, বিদ্রোহ লক্ষ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের চোখেও তখন তা এতটা ধরা পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের নায়িকারা যেন ‘দূর আকাশের তারা’। শরৎচন্দ্র ঘরোয়া জীবনকে সামনে এনে ধরে দিয়েছিলেন। সেখানে নারীর সেবা যত্ন আছে, উদ্বেগ ব্যাকুলতাও আছে কিন্তু তার সঙ্গে তার দৃঢ় মানসিকতার ছবিও আছে। সব শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যেই শরৎচন্দ্র মানসিকতার বিকাশ দেখেছেন, এবং সেটি জানিয়ে গেছেন। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা পুরুষের সমকক্ষ হতে চায়নি, তার থেকে মহত্তর হতে চেয়েছে। তারা সামান্য হয়েও অসামান্য্য”।^(১৪) ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ‘শরৎচন্দ্রের’ এই মনোভাব থেকে কিছুটা হলেও সরে এসে প্রেমের জয় ঘোষণা করতে কোথাও কোনরকম কৃপণতা তেমনভাবে করেননি। ‘অগ্নিপরীক্ষা’ উপন্যাসে ‘তাপসী’ চরিত্রটিকে ঔপন্যাসিক যেভাবে তুলে ধরেছেন; তাতে করে মানবিকতার জয়গান ঘোষিত হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনাক্রম সেদিনের পরিচিত গল্পের গণ্ডির মধ্যেই সীমায়িত ছিল। ‘তাপসীর’ বাল্যবিবাহ ও তাকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘনঘটা ধীরে ধীরে

উপন্যাসের কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ তার বিবাহ হয় পিতা-মাতার অনুপস্থিতি ও অনুমতি ছাড়াই। তাই মায়ের শাসনে ‘তাপসী’ বাধ্য হয় পুতুলখেলার মতো বিবাহকে কিছুদিনের জন্য ভুলে যেতে। সে শহরের মধ্যে জীবনযাপনে কোথায় যেন একটা খামতি অনুভব করে। আধুনিক কালের মা ‘চিত্রলেখা দেবী’ তার মেয়েকে সবদিক থেকে আধুনিকভাবে গড়ে তুলতে চান, কিন্তু বাধ সাধে ‘তাপসী’ নিজে। তার হাল ফ্যাশানের কাপড়-চোপোড়, অথবা সাজ-সজ্জা কোনটাই পছন্দের নয়। তার পছন্দ পুরনো দিনের ডিজাইন করা শাড়ি, আর হালকা সাজ-সজ্জা। যতদিন যায় এবং যতভাবে ‘চিত্রলেখা দেবী’ মেয়েকে সেই পুতুলখেলার মতো বিবাহকে ভুলিয়ে দিতে চান, ততই যেন ‘তাপসী’ বেশী করে গুরুত্ব অনুভব করতে থাকে জীবনের প্রথম অগ্নিসাক্ষী সাত পাকে বাঁধার ঘটনাকে। আর ব্যক্তিত্বের বিকাশের সাথে সাথে মায়ের সঙ্গে তার বিরোধ চরম আকার লাভ করে আলোচ্য বিষয় নিয়ে। ‘কিরীটি’ নামে এক সুদর্শন যুবককে যখন ‘চিত্রলেখা দেবী’ মেয়ের পাত্র হিসেবে মনোনীত করে বাড়িতে নিয়ে আসে। তার ভাবনা ছিল কিছুদিন একসঙ্গে থাকলে মেয়ের মন এমনিতেই গলে যাবে। কিন্তু ‘তাপসী’ যে অন্য ধাতুতে গড়া তা অনুমান করতে পারেনি তার মা। তাই ‘কিরীটি বাবু’কে দূরেই রেখে ‘এঙ্গেজমেন্ট’-এর দিন কাউকে না জানিয়ে কাশীবাসিনী ঠাকুমার কাছে পালিয়ে যায়। সেখানে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আঙনে পুড়ে সোনার মতো শুদ্ধরূপ পাওয়ার মাধ্যমে তাপসী শুদ্ধতা লাভ করে জীবনের যাত্রায়। অবশ্য উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে তার মনে সযত্নে লালিত ছোটবেলার সেই বিয়ের সফলতা দেখানো হয়েছে। সে জীবনের সংস্কারকে মেনে নিয়ে, অগ্নিপরীক্ষায় সফল হয়ে অগ্নিসাক্ষী স্বামীকে যেভাবে লাভ করেছে, তাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

‘অগ্নিপরীক্ষা’ উপন্যাসের ‘তাপসী’ যেন শরৎচন্দ্রের অন্যতম উপন্যাস ‘দেনাপাওনা’ ও ‘দত্তা’ উপন্যাসের নায়িকাদ্বয়ের মিলিত

রূপ। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ পরবর্তীকালে লেখা ‘বকুলকথা’ উপন্যাসের ‘শম্পা’ চরিত্রটিকে ‘তাপসীর’ দ্বিতীয়সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। ‘বকুলকথা’র ‘শম্পা’কে আমরা দেখতে পাই ‘তাপসীর’ মতো করে। সেও তার মা-বাবার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের প্রিয় মানুষটিকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে। কোন মা কোনদিন সন্তানকে সংসারের মধ্যে অথই জলে ফেলে দেয় না, অথবা সন্তান খারাপ হোক তা চায় না। তাই ‘বকুলকথায়’ যে মা চরিত্রকে আমরা পাই, তাকে দেখি সংস্কার ও দায়িত্বের জোড়ে মেয়েকে মানুষ করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু ‘শম্পা’কে দেখা যায় নিজের মন ও মানসিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে গণ্ডিছাড়া জীবনযাপন করতে। মা-বাবার পছন্দকে মেনে না নিয়ে নিজের মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আলোচ্য চরিত্রটিকে অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে। ‘তাপসীর’ মায়ের মতো ‘শম্পার’ মাও চেয়েছিল কোন মর্যাদাসম্পন্ন অথবা তাদের থেকে কোন উচ্চবিত্ত ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবেন। যাতে করে সবদিক সঠিকভাবে বজায় থাকে, তারসঙ্গে যেন তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাতে মেয়ের মতামত আছে কিনা, অথবা পাত্রের প্রকৃত গুণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন তারা অনুভব করেননি। ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ ‘বকুলকথা’ উপন্যাসের ‘শম্পা’কে ভালো করে অনুধাবন করার জন্য তাঁর পূর্বে সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে একটু ভালভাবে পর্যালোচনা করা দরকার বলে মনে করি। ‘বকুল’, ‘পারুল’, ‘সুবর্ণলতা’, ‘সত্যবতীর’ মতো ‘শম্পার’ পূর্বজরা যেপথ তৈরি করে দিয়েছিলেন আধুনিককালের রথ চলার জন্য; সেই পথকেই স্পর্ধায় দৃঢ়তায় ও সাহসে রাজপাথে পরিণত করার দায়িত্ব নিয়েছে ‘শম্পার’ মতো নারীরা।

‘আশাপূর্ণা দেবীর’ ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের রচনার প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে ‘সত্যবতীর’কাল হিসেবে ধরা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের

সময়কালকে। ‘সত্যবতী’ ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের নায়িকা। উপন্যাসটিতে যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখিকা ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ‘সত্যবতী’কে দাঁড় করিয়েছেন, তাতে করে বাঙালী নারীর জীবনের একটি বিশেষ সময়কে জানা যায়। একটি বিশেষ সময়ের বাঙালী সমাজের সামাজিক প্রতিচ্ছবি ঔপন্যাসিক উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। পুরুষতান্ত্রিকতার জাঁতাকলে পৃষ্ট হতে হতে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নারীর উঠে দাঁড়ানোর কাহিনী ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাস। ‘সত্যবতী’ সেইসমস্ত নারীর প্রতিনিধিত্ব করেছে, যাঁরা মার খেয়ে পড়ে পড়ে মরতে রাজি ছিল না, প্রতিবাদ করে নিজের ব্যক্তিত্ব তথা নারীত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। দাম্পত্য জীবনের নিরিখে ‘সত্যবতীর’ জীবন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এক ভিন্নমাত্রার সত্যের সন্ধান দেওয়াই ছিল ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য। মাত্র নয়বছর বয়সে শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর ঘর করতে আসে ‘সত্যবতী’। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় পিতৃগৃহে যে পরিবেশে সে মানুষ হয়ে উঠেছে; শ্বশুরবাড়িতে এসে সেই পরিবেশ পায়নি। প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই তাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। তার স্বামী ‘নবকুমার’ তার তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে, তবুও কোনদিনই সে তার স্বামীর প্রতি বিরূপ ব্যবহার দেখায়নি। তার হৃদয়ে স্বামীর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা চিরকালই ছিল। সে কোনদিন স্বামীর বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করেনি। স্বামীকে সহযোগিতা করেছে সবসময়, প্রয়োজনে বুঝিয়ে দিয়েছে জীবনের প্রকৃত সত্যকে। ‘নবকুমার’ নিজের স্ত্রীর দৃঢ়তা ও স্পর্ধাকে স্বীকার করে নিয়েই ভালোবাসতে পেরেছে; একথা স্বীকার করে নিতে হয়। তাই তার দাম্পত্য জীবনের কোথাও কোন খামতি দেখা যায়নি। কিন্তু উপন্যাসের শেষে দেখা যায় স্ত্রীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সে রক্ষা করতে পারেনি। একমাত্র কন্যাকে কম বয়সে বিবাহ দিতে বাধ্য হয়, ঘটনাক্রমে ‘সত্যবতী’কে তা জানানো হয়নি। কারণ সে চেয়েছিল মেয়ে লেখাপড়া শিখবে এবং সবদিক দিয়ে উপযুক্ত হলে তবেই বিবাহ

দিবে। তাই তার কন্যা জন্মের পরেই স্বামীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নিয়েছিল, মেয়ে উপযুক্ত হলে তবেই বিবাহ দেবে। তাই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে কোনরকম তোয়াক্কা না করে সে চিরদিনের মতো কাশিবাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার নিজের সুখের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে দিয়ে।

‘সত্যবতী’ তার স্বামী ‘নবকুমার’কে বহুক্ষেত্রে মেনে নিয়েছে, কিন্তু শেষবার যখন তার স্বপ্ন ভেঙে গেছে তখন আর সে মেনে নেয়নি। শুধু বলেছে –‘সুবর্ণ যদি মানুষ হওয়ার মালমশলা নিয়ে জন্মে থাকে ঠাকুরঝি, সে মানুষ হলে নিজের জোরেই হবে! তার মাকে বুঝাবে’। শুধুমাত্র নিজের সন্তানের কথা চিন্তা করে ‘সত্যবতী’ ঘর ছাড়েনি, সেকালের ও পরবর্তীকালের হাজার হাজার ‘সুবর্ণের’ কথা ভেবে প্রতিবাদ করেছে। তার উদ্দেশ্য ছিল ‘সুবর্ণেরা’ জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ও সার্থকতা খুঁজে নিয়ে, একজন সত্যিকারের মানুষ হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক। নিজের দাম্পত্য জীবনের যে শিক্ষা ‘সত্যবতী’ স্বয়ত্তে লালিত করেছে, সামাজিক মর্যাদার লড়াই করতে গিয়ে সেই শিক্ষার ধ্রুতকুণ্ডলী তৈরি করে দিয়ে যবনিকা টেনেছে। তাই স্বাভাবিক ভাবে ‘সত্যবতী’ একটি প্রতিবাদী সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সে দাম্পত্য জীবনের নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গ্রামের গলিপথ থেকে কোলকাতার রাজপথে স্বামীকে নিয়ে আসে। যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের দাম্পত্য জীবনকে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করে। মর্যাদায় আর সম্মানে নিজের সঙ্গে স্বামীকে জড়িয়ে এগিয়ে চলতে চায় বহুদূরের পথ। সেই দাম্পত্য জীবনের সর্বনাশ করে ‘নবকুমার’ ও তার মা ‘এলোকেশী দেবী’। কোনওরকম পরামর্শ ছাড়াই একমাত্র কন্যা ‘সুবর্ণলতার’ কিশোরী অবস্থাতেই বিবাহ দিয়ে দেয়। যা ‘সত্যবতী’ কোনভাবেই মেনে নেয়নি, চরম অপমানবোধে সে সিদ্ধান্ত নেয় নিজের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে দিয়ে সন্ন্যাসজীবন যাপনে। সেই অপমান শুধু তার একার নয়, সেকালের

প্রগতিকামী সকল নারীর, সেকথা সে নিজেও জানতো। কারণ সে সারা জীবন এমন বহু নারীকে দেখেছে, যাঁরা বিবাহ ও দাম্পত্য নামক যুপকাঠে নিজেদের ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছে।

‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসে আমরা অনেকরকম দাম্পত্য সম্পর্কের সন্ধান পাই। সত্যবতীর পিতা-মাতা ‘রামকালী চাটুয্যে’ ও ‘ভুবনেশ্বরী দেবীর’ দাম্পত্য জীবন তার মধ্যে ভিন্নধর্মী। গোটা উপন্যাস জুড়ে দেখা যায় নির্ভেজাল দাম্পত্য সম্পর্কে কোনদিন কোনরকম বিবাদ ঘটেনি। কারণ হিসেবে বলা যায় ‘ভুবনেশ্বরী দেবী’ স্বামীর সমস্তরকম কাজকর্মে কোনরকম সংশয় না রেখে নির্দিধায় মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে বহুবিবাহের যুগেও একপত্নী ও একটি কন্যাসন্তান নিয়ে সুখী ছিলেন ‘রামকালী’, বংশরক্ষার অজুহাতে দ্বিতীয়বিবাহ করেননি। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায় ও কাজ-কর্মে ‘ভুবনেশ্বরী দেবীকে’ কোথাও কোনরকম প্রশ্ন করার মতো কারোর অবকাশ ছিল না। তার মাথার ওপর ছিলেন শাশুড়িমা ‘দীনতারিণী’, পিসিশাশুড়ি ‘কাশীশ্বরী’ ও ‘মোক্ষদা’। তাই কোন কাজে কোনরকম মত প্রকাশ করা; কিংবা বিশেষ কোনকাজে কারো অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করা তার আয়ত্তে ছিল না। এককথায় তিনি স্বামীঅন্ত প্রাণ, তাই স্বাভাবিক ভাবে বিরোধ তো ছিল না, কোন মতান্তরের অবকাশও ছিল না। একসময় দেখা যায় তার মেয়ে ‘সত্যবতী’ লিখতে পড়তে শিখেছে এই নিয়ে গোটা পরিবারের মহিলামহলে কোলাহল শুরু হয়ে যায়। কি হবে ‘সত্যবতীর’, ঘোরতর পাপ করেছে সে, কি করে শ্বশুরবাড়িতে ঘর করতে যাবে? এরকম নানান প্রশ্নে যখন সবাই বাড়ির পরিবেশ অস্থির করে তুলেছে; ঠিক তখন নীরব থেকে ‘ভুবনেশ্বরী’ সমস্ত প্রশ্নের যেন উত্তর দিয়ে দেন। আমরা জানি নীরবতা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মতির লক্ষণ। এরপরও সকলে মিলে ‘সত্যবতীর’ এই ঘোরতর অপরাধের জন্য বিচার চাইতে রামকালীর কাছে দরবার করে। আবার

সকলে মিলে ‘ভুবনেশ্বরী’কেই সমস্তঘটনার সাক্ষী হিসেবে পেশ করেছে বিচারকের সামনে। সেকালের নিয়মের জাঁতাকলে দিনেরবেলা স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর দেখা করা নিষেধ ছিল। আর সেখানে ‘ভুবনেশ্বরী’ তার নিজের মেয়ের অপরাধের কথা জানাতে যাবে স্বামীর কাছে, এই সময়ের সঠিক বর্ণনা করেছেন লেখিকা ‘আশাপূর্ণা দেবী’, তিনি লিখেছেন—“ভুবনেশ্বরী অবশ্য একথার কোন উত্তর দেয় না। দেওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে, যদিও তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তবু গুরুজনের সমক্ষে স্বামী সম্পর্কে উল্লেখই যে যারপরনাই লজ্জাজনক। ভুবনেশ্বরী যে রামকালীর সঙ্গে কথা কয়, এতবড় লজ্জার কথাটা শাশুড়ি এই লোক সমাজে প্রকাশই বা করে বসলেন কেন? ছি ছি! লজ্জা প্রতিকারের আর কিছু না দেখে মাথার ঘোমাটাটাই আর খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে মাথা হেঁট করে ভুবনেশ্বরী”^(১৫)। দায়িত্ব যখন নিয়েছেন তখন পালন তো করতেই হবে। ভয় লজ্জা সমস্ত কিছুকে জয় করে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ায়, লজ্জায় মাথা নত করে স্বামীকে জানিয়ে দেয় ‘সত্যবতীর’ লেখাপড়া শেখার কথা। ‘রামকালী’ সত্যতা যাচাই করার জন্য ‘সত্যবতী’কে ডেকে পাঠিয়ে লিখে দেখাতে বলেন। তখন ‘ভুবনেশ্বরী’ ভেবেছিল কালের কঠোর নিয়মে বুঝি ‘সত্যবতীর লেখাপড়া বন্ধ হবে। কিন্তু যখন জানতে পারল ‘রামকালী’ তার মেয়েকে পড়াশুনা করাতে চায়; তখন তার আনন্দের সীমা থাকল না। ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ আলোচ্য চরিত্রের মনন বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য লিখেছেন একটিমাত্র বাক্য, ‘ভুবনেশ্বরীর দু’চোখে শ্রাবণ নামে’। আর কিছু লিখতে হয়নি ঔপন্যাসিককে, একটিমাত্র বাক্যে যেন বুঝিয়ে দেন আসলে মা কি চায় নিজের সন্তানের জন্য। ‘সত্যবতী’ লেখাপড়া শিখবে, সমাজের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এগিয়ে যাবে বন্ধুরপথে আগামী প্রজন্মের জন্য। যেসময় সমাজের পুরুষ সমাজপতিরা মেয়েদের জীবনের চারপাশে কুসংস্কারের গাণ্ডি এঁকে দিতো, সেসময়েই ‘রামকালী’ তার মেয়েকে পড়াশুনা করার ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। এখানে অলক্ষ্যে

যেন মা হিসেবে জয়ী হয়েছেন ‘ভুবনেশ্বরী দেবী’। সুখী দাম্পত্য জীবন ছিল ‘ভুবনেশ্বরী দেবীর’, আর সেই সুখের কারণেই সিঁদুর মাথায় নিয়েই একদিন হঠাৎ কাউকে জানান না দিয়েই ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন। ‘রামকালী’ গোটাজীবনে যে জীবনসঙ্গীকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি; মৃত্যুর পরে যেন তার অনুপস্থিতিতে বুঝতে পারে সে জীবনের কতটা অংশ জুড়ে ছিল। আসলে প্রতিটি মানুষই কাছে থাকা মানুষের মূল্য ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, যখন দূরে চলে যায় তখন তার মূল্য বোঝা যায়। ঔপন্যাসিকের কথায় রামকালীর অনুভূতি ব্যক্ত হয় —“সেই ছোট খাটো মানুষটা, যাকে রামকালী কোনদিনই পুরো একটা মানুষ বলে গণ্য করেননি, সে যে দৃঢ় কঠিন রামকালীর ভিতরের এতটা শক্তি হরণ করে ফেলবে, এ রামকালীর ধারণার মধ্যেই ছিল না। ...ভুবনেশ্বরী সম্পর্কে যেন তার একটা বাৎসল্যমিশ্রিত প্রীতি ছিল, জীবনের কোন আদর্শে, কোন চিন্তায়, কোন সুখ-দুঃখে তাকে ডাক দেননি। আজ মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ বিচার করেননি রামকালী স্ত্রীর উপর। চিরদিন যাকে ছোট ভেবে এসেছেন, সে হয়তো সামান্য নয়। রামকালী যদি তাকে স্নেহের সঙ্গে কিছু শ্রদ্ধা দিয়ে হৃদয়ের সহধর্মিনী করে তুলতে পারতেন, হয়তো সারাটা জীবন এতখানি নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতেন না”^(১৬)। ‘ভুবনেশ্বরীর’ সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে ‘রামকালীর’ কোথাও খেদ নেই, আর তাই হয়তো বহুবিবাহের যুগেও রামকালী দ্বিতীয়বিবাহ করেননি। একজন গৃহিনী ও স্ত্রী হিসেবে ‘ভুবনেশ্বরী’ ছিলেন যথার্থ, ‘রামকালীর’ মতো ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রের সঙ্গে যথাযথ সঙ্গী হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন। তাই সমস্তুদিক থেকে পর্যালোচনা করে ‘ভুবনেশ্বরী দেবী’কে একজন যথার্থ নারী চরিত্র হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আলোচ্য উপন্যাসে একটি গৌণ নারী চরিত্র দাম্পত্য জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে

আছে। ‘জটার বৌ’ নামে পরিচিত চরিত্রটির ভাগ্যান্বেষণের যাত্রায় নিজের প্রকৃত নামটাও হারিয়ে ফেলেছে। সামাজিক সংস্কারের বন্ধনে স্বামীর নামেই সে পরিচয় লাভ করেছে ‘জটার বৌ’ নামে। কিন্তু ‘জটা’ প্রকৃত পক্ষে তার নামের উপাধি বহনকারী স্ত্রীকে যথার্থ মর্যাদা দেয়নি। সে রোজরাতে মাতাল হয়ে চর-ঘুষি-লাথি দিয়ে স্ত্রীকে বাধ্য করে কথা মতো কাজ করতে। সংসারের কাজ যে ‘জটার বৌ’ করে না তা নয়, আসলে নারীর উপর নির্যাতন করা পুরুষের পুরুষত্বের প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু স্বামীর লাথি খেয়েও ‘জটার বৌয়ে’র মতো নারীদের কিছু করার থাকে না। আকাশের মেঘের মতো উড়ে যাওয়ার সাধ থাকলেও, সংসারের গভীরে তাদের জীবন শিকড় পোখিত হয়ে যায় বিবাহের দিনেই। স্বামীর লাথি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে কোনরকমে বেঁচে উঠলে ‘সত্যবতী’ তাকে বলেছে —‘তোমাদের এত ভয় কিসের বলতে পার’? কিসের ভয় তা সন্ধান করার ক্ষমতা ‘জটার বৌয়ে’র নেই। যার নিজস্ব নাম হারিয়ে যায়, স্বামীর পরিচিতিতে পরিচিত, অন্যের হাতে যার জীবন সুতা নিয়ন্ত্রিত। ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ খুব সচেতনভাবে আলোচ্য চরিত্রটিকে সহানুভূতিশীল সম্পন্ন করে তুলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নামহীন, গোত্রহীন, বর্ণহীন ও উপাধিহীন নারীকে বাস্তবের সম্মুখে দাঁড় করে দিয়ে নারীর নিজস্বতাকে ফুটিয়ে তোলা। কতদিন আর দাম্পত্য সম্পর্কের যুপকাঠে নিজেকে বলি দিতে থাকবে। দাম্পত্য সম্পর্কের সঠিক মূল্যায়ন করে কেন নিজের অধিকার ও জীবনের সঠিকস্থান সম্পর্কে সচেতন হবে না? এরকম বহুপ্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ আলোচ্য চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের আর একটি নারী চরিত্র দাম্পত্য জীবনের নিরিখে আলোচনার দাবি রাখে। ‘সারদা’ নামে নারী চরিত্রটি ‘রাসবিহারীর’ প্রথমা স্ত্রী। আলোচ্য চরিত্রটি ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ হৃদয় নির্যাসে

নির্মিত। কারণ এই একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে একদিকে কোমল স্নেহাতুরা আর অন্যদিকে প্রখর মুখরা এবং ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ‘সারদা’ চিরকাল চেয়েছে তার যেন সতিন না থাকে অথবা কোনদিনই না হয়। বিবাহের সময় সে প্রথমা স্ত্রী হিসেবেই সংসারে এসেছিল, সমাজের বহুবিবাহের সময়কালে অন্যান্য নারীদের মতো সেও সৈঁজুতি ব্রত পালন করত, যেন তার সতিন না হয় সেইকারণে, তাই সে সৈঁজুতি ব্রতের ছড়া মুখস্থ করে বলেছিল—

“অশ্বথ কেটে বসত করি
সতীন কেটে আলতা পরি
ময়না ময়না ময়না
সতিন যেন হয় না”^(১৭)।

কিন্তু যে যেটা চায় না তার কপালে যেন তাই ঘটে। তাই ঘটনাক্রমে ‘সারদার’ সৈঁজুতি ব্রতের কোন ফল লাভ হয় না। উল্টে তার পুন্যকর্মে ছাই দিয়ে সতিন আসে ঘরে। এরপরই দেখা যায় যে ‘সারদা’ স্বামীর সোহাগে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল; কিছুদিনের মধ্যেই সে কেমন কঠোর হয়ে যায়। সতিন যেন না আসে সেজন্য স্বামীকে তিন সত্যির শপথ দিয়েছিল, নিজে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল। সোহাগে আদরে স্বামীকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছে। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ সারদার স্বামী সেবা সম্পর্কে লিখেছেন —“গরমকালে রাতে পাখা ভিজিয়ে সারারাত বাতাস করে স্বামীকে, শীতের রাতে পিদ্দিমে হাত তাতিয়ে ঠাণ্ডা সিরসিরে হাত-পা গরম করে দেয়। ...আর সংসারের কাজে রান্নাঘরের গরমে যতই গলদঘর্ম হোক, সৌখিন বরটির কাছে রাতে শুতে আসার সময় গা-হাত ধুয়ে কোঁচানো মিহি শাড়িখানা পরতে ছাড়ে না, মাথায় গন্ধ তেলটি দিয়ে একটু চকচকে হয়ে আসতে ভোলে না”^(১৮)। তার সমস্তরকম আত্মাহুতি ও কঠোর পরিশ্রম ভস্মে পরিণত হয়। সতিন ‘পটলীর’ প্রতি প্রথমাবস্থায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সর্বনাশ করতে চাইত; কিন্তু তার মরমী মন যখন

স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তখন আর জোড় করে তা আদায় করতে চায়নি। তাই শেষপর্যন্ত নিজের সমস্ত স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি ‘পটলী’কে দিয়ে কাশীবাসী হয়ে যায়। এখানে ‘সারদা’ চরিত্রের মধ্যদিয়ে আমরা একজন নারীর জীবনে হাসি মুখে দাম্পত্যসুখ ত্যাগ করতে দেখি। নিজের সুখ ঐশ্বর্যপূর্ণ দাম্পত্য জীবন যে বহুকষ্টে আগলে রাখতে চেয়েছে, কিন্তু সমাজের নিষ্ঠুর পরিহাসে সে সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। স্বামীর সোহাগ বিসর্জন দিয়ে পথে নেমে যায়, আর এক বৃহৎ সংসারের খোঁজে। ‘সারদা’ চরিত্রটি তাই একদিকে মানবিকতার সীমা ছাড়িয়ে মহামানবিকতার স্তরে উন্নিত হয়েছে। যে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে আঁকড়ে ধরে সে বাঁচতে চেয়েছে, দাম্পত্য সম্পর্কের সেই বন্ধনে নোনা জল প্রবেশ করেছে ‘পটলীর’ বেশে। অভিমান করে তাই সে সংসার ত্যাগ করে নিজের সমস্ত সুখ দিয়ে যায় ‘পটলী’কে। মহানুভবতায় আর ত্যাগে তাই ‘সারদা’কে অন্তিম নারী চরিত্র হিসেবে ব্যাখ্যায়িত করা যেতে পারে।

দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র ‘সত্যবতী’কে অনুশীলন করলে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর সামাজিক অবস্থানের রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ‘সত্যবতী’ চরিত্রটিকে নতুন করে পুনরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন হল তার দাম্পত্য জীবনের বিশ্লেষণের জন্য। প্রকৃত অনুসন্ধানে আমরা হয়তো দেখবো তার দাম্পত্য জীবনে না পাওয়ার বেদনা ও মানিয়ে নেওয়ার অভিসন্ধি। যেন সুখের আড়ালে থাকা পর্দাবেষ্টিত অভিশপ্ত জীবন। দূর থেকে সাজানো বাগানের মতো মনে হলেও, আসলে ধূ ধূ করা মরুভূমির ক্যাকটাসের মতো। তার দাম্পত্য জীবনের গুরুটা আচমকা দমকা বাতাসের মতো, যেমন কিছু বুঝে ওঠার আগেই উড়িয়ে নিয়ে যায়। পিতা ‘রামকালী’ গৌরীদানের পুন্য অর্জনের জন্য তার বিবাহ সাতবছর বয়সেই সম্পন্ন করেছিল। অবশ্য বিবাহের পরেই কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেননি

‘রামকালী’। তার ইচ্ছে ছিল কিছুকাল বাপেরবাড়িতে থেকে ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম শিখে তারপর কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবে। কিন্তু বিবাহের একবছর পূর্ণ না হতেই সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক পাঠানো হয় নববধুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পত্রবাহককে পারিতোষিক দিয়ে ফেরোৎ পাঠান ‘রামকালী’, কারণ তিনি সেসময় উপলব্ধি করেন তার কন্যার এখনো পুতুলখেলার বয়স অতিক্রান্ত হয়নি। কিন্তু তার ভাবনাকে বুড়োআঙ্গুল দেখিয়ে কিছুদিন পর আবার পত্র আসে ‘সত্যবতী’কে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং সঙ্গে হুমকি দিয়ে বলা হয়—এবার নববধুকে না পাঠালে পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহ দেবেন ‘নীলাম্বর বাড়ুয়ে’। ‘রামকালী’ এই স্পর্ধায় অপমানবোধ করে, এবং সিদ্ধান্ত নেয় কোনদিনই কন্যাকে সেই গৃহে পাঠাবেন না। কিন্তু সত্যবতী চায় না তার পিতার উঁচু মাথা কোন কারণে সমাজের কাছে নিচু হয়ে যাক। তাই সে নিজেই শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুত হয়ে পিতাকে সম্মত করে। তারপর শ্বশুরবাড়িতে এলেও সে দীর্ঘদিন স্বামীকে দেখেছে বন্ধুর মতো, যে দূর থেকে কথা বলে এবং দুঃখে-দুখী ও সুখে-সুখী হয়। সমব্যাখী হয়ে ‘নবকুমার’ তার স্ত্রীর উপর মায়ের নির্যাতনের জন্য ‘ভবতোষ মাস্টার’কে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠায়। প্রথমদিকে তাদের মধ্যে সেরকম বাক্যালাপ হয়নি, হঠাৎ একদিন ‘সত্যবতী’ অন্ধকার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ‘নবকুমার’কে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে, ‘তার পিতাকে কে চিঠি পাঠিয়েছে?’ যদিও সত্যবতী জানতো নবকুমার চিঠি পাঠিয়েছে; তবু সামনাসামনি প্রশ্ন করে তাকে লজ্জায় ফেলতে চায়। স্ত্রী সম্পর্কে ‘নবকুমারের’ সমস্ত কল্পনা ও স্বপ্ন একটি বাক্যে যেন মাটিতে মিশে যায়। মধুর আলাপ ও সম্ভাষণের স্বপ্ন সে যেভাবে দেখেছিল, তা যেন ‘সত্যবতীর’ জেদ ও কাঠিন্যের জন্য অনায়াস থেকে গেছে। প্রথমদিন থেকেই ভীত সন্ত্রস্ত ‘নবকুমার’ ধীরে ধীরে বৌয়ের প্রশ্নে কিছুটা স্বাধীন মত প্রকাশ করার অবকাশ পায়। কবে কিভাবে তাদের দাম্পত্য জীবনের শুভ সূচনা হয়েছিল তা পরিস্কার ভাবে উল্লেখ নেই

উপন্যাসের কাহিনীতে। ‘সত্যবতী’ যেভাবে মানুষ হয়েছে, তাতে করে তার মতে সংসার মানে শুধু ঘরকন্না করে দু’বেলা খেয়ে পড়ে বাঁচা নয়। নিজেকে সুখী রেখে অন্যকে সুখ দেওয়াতেই প্রকৃত আনন্দ। মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচা, এবং যথার্থ সম্মানের সঙ্গে সমাজের অন্যতম একজন হয়ে জীবনযাপন করাই হল প্রকৃত সংসার ধর্ম। ‘সত্যবতী’ তার নিজের জীবনাদর্শে অটুট ছিল, কিন্তু সেসময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে তা ছিল অস্বীকার যোগ্য স্পর্ধা। কারণ সে নিজে ও তার মতাদর্শ তুলনায় সেদিনের থেকে ছিল আধুনিক। সে প্রতিবাদ করেছিল বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের মতো কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে। তার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরলে শহর থেকে ডাক্তার নিয়ে আসে। ‘ভাবিনীর’ বোনকে শাশুড়ি ও স্বামী মিলে হত্যা করলে, সে প্রতিকার চেয়ে গোরা সাহেবকে চিঠি লিখে আবেদন জানায় হত্যাকারীর যথার্থ শাস্তির জন্য। যে মেয়ে দেশের আইনের কথা বলে, সমাজের কুসংস্কারে বিরুদ্ধে একা প্রতিবাদ করে, সেই মেয়ের স্বামী হিসেবে ‘নবকুমার’ যেন অনেকটাই নিষ্প্রভ। ‘সত্যবতী’ ছোটবেলা থেকেই পিতার কাছে পেয়েছে সমস্ত রকম প্রশ্রয়, তাই মনের ভিতর একটা কর্মের চেষ্টা ও অদম্য সাহস ভিত তৈরি করে ফেলে। তুলনায় ‘নবকুমার’ কিছুটা রক্ষণশীল, ভয়প্রবণ ও স্নেহাতুর। দুজনের ধ্যান-ধারণায় ভিন্নতার জন্য তাদের দাম্পত্য জীবনে তেমনভাবে সুখের দেখা মেলেনি। দোষারোপ করলে দুজনকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়। একদিকে পুরুষ হিসেবে বহুক্ষেত্রে ‘নবকুমার’ ছিল পৌরুষহীন পুংলিঙ্গ, অন্যদিকে নারী হয়েও সত্যবতীর মনে পৌরুষত্বের তেজ ও কর্মোদ্দীপনা। এরকম অহংবোধ তাকে তাড়া করতো প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে। যেসময় মেয়েরা হয় ঘরের অন্ধকারে বসে বিধবা হয়ে থাকতো, নয়তো সংসারের দাসী হয়ে জীবন কাটিয়ে দিত, সেইসময় ‘সত্যবতী’ লেখাপড়া শিখে কুসংস্কারের বন্ধন মুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল। তাই মনে হয় মূর্খেররাজ্যে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পড়েছিল তার কাঁধে। অবশ্য

একটি কথা স্বীকার করে নিতে হয় যে, তার একগুঁয়ে জেদি অহংবোধযুক্ত মনোভাব অন্যান্য যাবতীয় গুনকে প্রায় মাটি করে দিয়েছে। আর তাই হয়তো ‘নবকুমারের’ মধ্য দিয়ে লেখিকা বলেন —“বাবাঃ বুড়ো হয়ে গেলাম জীবনে কখনো মন খুলে দুটো গল্প করতে পারলাম না”^(১৯)। আসলে ‘সত্যবতী’ ও নবকুমার মনে ও মননের দিক থেকে দুজনে দুটি মেরুর বাসিন্দা। নবকুমার নিজের মতো করে বাঁচতে পারেনি, সারাজীবন অন্যের তদারকি ও মন পুষিয়ে চলতে চলতেই পথ শেষ হয়ে গেছে। ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ নারী জাগরণ দেখাতে চান ঠিকই, কিন্তু মানুষ ‘নবকুমার’কে অস্বীকার করে নয়। আর তাই হয়তো তিনি ‘নবকুমারের’ পক্ষ নিয়ে বলেন —“এখন সে যেন দেখতে পাচ্ছে পুরুষ হয়েও সে পরাধীন। সত্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সত্যের রুচি-অরুচি সত্যের ভ্রুকুটির ভয় নবকুমারকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, কেন রে বাবা কেউ তো এমন বন্ধন দশাশ্রয় নয়”^(২০)। কিন্তু সত্যবতী দাম্পত্য জীবনের প্রেক্ষিতে নিজেকে কেমন করে দেখেছে, সে কী স্বামীকে যথার্থ মর্যাদা ও সম্মান দিতে পেরেছে? ‘নবকুমার’ যেভাবে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে ‘সত্যবতীর’ প্রতি অনুরক্ত, ‘সত্যবতী’ও কি তাই? এরকম বহুপ্রশ্নের সন্ধানে ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ লিখেছেন —“সত্য তাই নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখেছে, সে কি এই নবকুমারের বশ্যতার পরিবর্তে উল্টোটা হলে সুখী হত? অনেকবার মনের কোনে আলো ফেলে ফেলে দেখে সত্য, হত সুখী? সত্যের স্বামী যদি সত্যের যুক্তি খণ্ডন করে স্বমতে প্রতিষ্ঠিত থেকে বিপরীত ভাবে নিজেকে চালাতে পারতো, তাতেও সুখী হত!”^(২১) বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক, তিনি জানাতে চান আসলে ‘নবকুমার’ নিজ মতে অটল থাকলে ‘সত্যবতী’ সুখী ও সন্তুষ্ট কোনটাই হতে পারতো না। আর তাই হয়তো উপন্যাসের শেষে তাকে তৈরি করতে হয় অবধারিত কাহিনীর পরিণতি, যেখানে বিশ্বাসঘাতক ‘নবকুমার’কে সামনে এনে ‘সত্যবতীর’ দোষগুলিকে আড়াল করার একটা

অবসর পাওয়া যায়। কোন এক বিশেষ মুহূর্তে ‘সত্যবতী’কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ‘নবকুমার’ তার নয়বছরের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ দেয়। যে জন্য ‘সত্যবতীর’ সারা জীবনের সংগ্রাম, আর নিজের কাছের মানুষের কাছে পরাজয়ের ফলে সে হঠাৎ সিদ্ধান্তে চিরতরে স্বামীর সংসার ত্যাগ করে চলে যায়। ‘নবকুমার’ অবশ্য সেইমুহূর্তে ‘সত্যবতী’কে প্রশ্ন করেছিল —‘তোমার বাবা এত বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনিও তোমাকে সাত বছরে গৌরীদান করেছিলেন, সে কথা তো কই মনে পড়ছে না’? ‘সত্যবতীর’ হয়তো সারাজীবন সেকথা মনে ছিল, তাই সে চেয়েছিল তার মেয়ে লেখা পড়া শিখবে, মানুষের মতো মানুষ হবে, তারপর বিবাহ। নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করার জন্যই, হয়তো বিবাহ নামক বন্ধন সম্পর্কে তার নানারকম অভিমত ছিল, বিবাহ বন্ধনের দৃঢ়তা পুরুষ ও নারীর পক্ষে সমান নয় কেন, কেন পুরুষের জীবনে ‘বিবাহ’ বহু ঘটনার একটি ঘটনা মাত্র, অথচ নারীর পক্ষে সেই বন্ধনচিহ্নটুকুর উপরেই নির্ভর করে তার ভালো থাকা-না-থাকা, তার জীবন-মরণ; একই অগ্নিসাক্ষ্যের সমস্ত দায় পুরুষ কিভাবে মোচন করতে পারে খুব সহজেই, এমনকি নিছকই খেয়াল-খুশিতেও এড়িয়ে যেতে পারে বন্ধনের সব দায়-দায়িত্ব। অথচ নারীর পক্ষে সে বন্ধন কেন চির অলঙ্ঘ্যই থেকে যায়? এই সমস্ত প্রশ্নের নিরিখে তাকে আমরা দোষ-গুণ সম্পন্ন মানবচরিত্র হিসেবে বিশ্লেষণ করে, যেটুকু নির্যাস পাই তাতে নারী জাগরণের প্রতীক হিসেবে তাকে ধরা যেতে পারে। কিন্তু সংসারের অন্ধকার কোণ থেকে দেখলে ধরা পড়বে কিছু দোষ-ত্রুটি। ‘সত্যবতী’ নিজেকে তার স্বামীর সঙ্গে কোন ক্ষেত্রেই মিলিয়ে চলতে পারেনি। ‘নবকুমার’ তাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চেয়েছিল কিন্তু নাগাল পায়নি কোনদিনই। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে ছিল বিস্তর ফাড়াক। দিনের পর দিন একছাঁদের তলায় থেকেও কেউ কাউকে চিনতে পারেনি। আসলে দুজনের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই একে-অপরের কাছে প্রকাশ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু নিয়তির পরিহাসে প্রকাশ করতে না পারার

চাপা কান্না যেন ভিতর ভিতর চরিত্রদুটিকে অন্তসারশূন্য করে তুলেছে। আসলে ‘সত্যবতী’ দাম্পত্য জীবনের মাঝপর্বে এসে যখন দেখছে স্বামীর প্রতারণা। তখন সে বুঝতে চেষ্টা করেছে মেয়েমানুষের বিয়েটাই জীবনের সর্বস্ব নয়। আর তাই মেনে নিয়ে সকলকে বোঝাতে চেয়েছে, প্রয়োজনে বিয়ের বন্ধন নামক দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ সেইযুগের প্রেক্ষাপটে একজন নারী হিসেবেও বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে সে দ্বিধাবোধ করেনি। আলোচ্য প্রসঙ্গের প্রমান পাই দুইযুগ পরের প্রেক্ষাপটে রচিত ‘বকুলকথা’ উপন্যাসের ‘পারুলের’ বক্তব্যের মাধ্যমে এই ধরনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ‘বকুলকথা’ উপন্যাসের আটত্রিশ সংখ্যক অধ্যায়ে ‘পারুল’ একটি চিঠি লেখে ‘বকুলের’ কাছে। তাতে সে জানায়—“তুই তো জানিস আমাদের মাতামহী সত্যবতী দেবীর কথা! তিনি নাকি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সংসারের গণ্ডি ছেড়েছিলেন, ‘বিয়ে’ জিনিসটা ভাঙবার নয় কেন? তিনি কী এখন কোনখানে বসে তাঁর প্রশ্নের অনুকূল উত্তর পেয়ে খুব খুশি হয়ে উঠেছেন? দেখছেন ওটা ‘ভাঙবার কিনা’ এই প্রশ্নটাই আজ হাস্যকর হয়ে উঠেছে”^(২২)। যদিও ‘পারুল’ উক্ত মন্তব্যটি করেছে তার ছেলের বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাপ্রসঙ্গে। যে বিষয়টি ‘সত্যবতীর’ সময়কালে ভাবনার অবকাশ ছিল, তাই ‘বকুল’ ‘পারুলদের’ সময়ে সহজেই বাস্তব জীবনে ঘটতে দেখা গেছে। তবুও আমরা স্বীকার করে নিতে পারি ‘সত্যবতী’ ব্যতিক্রমী সামাজিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছে। অন্যান্য ঔপন্যাসিকরা যেভাবে নারীচরিত্র সৃষ্টিতে অবহেলা প্রকাশ করেন, ‘আশাপূর্ণা দেবী’ যেন তারই প্রতিবাদ করে ‘সত্যবতী’ চরিত্রটিকে সৃষ্টি করে তুলেছেন। তিনি আলোচ্য চরিত্রের বিশ্লেষণে লিখেছেন—“যখন আমার খুব কম বয়েস তখন থেকেই দেখতাম পারিবারিক জীবনে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে—আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের কথা বলছি—ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশী তফাৎ। মেয়েরা যেন কিছুই নয়, আর

ছেলেরা পরম মানিক, এইরকম ব্যাপার। এটা আমাকে খুব বিদ্ধ করতো। কিন্তু আমাদের আমলে তো সাহস ছিল না যে প্রতিবাদ করি, এমনকি গুরুজনের মুখের উপর একটি কথা বললেও ফাঁসির হুকুম হয়ে যাবে। তাই মনের মধ্যে রাগ দুঃখ জ্বালাটা জমতো। আমাদের সেই নিরুচ্চার প্রতিবাদগুলোই যেন এক একটি প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে আমার কাহিনীর নায়িকা রূপে দেখা দিয়েছে। যেমন, ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র ‘সত্যবতী’^(২৩)। আলোচ্য বিষয়ে ঔপন্যাসিকের দেওয়া স্বীকৃতির পরে মনে হয় তেমনভাবে আর কোনো সংলাপের প্রয়োজন হয় না। আর তাই আমরা সহজেই বলতে পারি, ব্যতিক্রমী ভাবনায়, ব্যতিক্রমী প্রেক্ষাপটে, ব্যতিক্রমী চরিত্র হিসেবে ‘সত্যবতী’ কালজয়ী হয়ে চিরকালের সামাজিকতায় উচ্চস্থানে অবস্থান করবে।

‘সুবর্ণলতা’ উপন্যাসে ‘সুবর্ণ’ একমাত্র নারীসত্তার প্রতিনিধি। আর তাই হয়তো ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ উপন্যাসের শুরুতেই সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি লিখেছেন –“আপাতদৃষ্টিতে ‘সুবর্ণলতা’ একটি জীবনকাহিনী, কিন্তু সেইটুকু এই গ্রন্থের শেষ কথা নয়। সুবর্ণলতা একটি বিশেষকালের আলেখ্য। যে কাল সদ্যবিগত, যে কাল হয়তো বা আজও সমাজের এখানে সেখানে ছায়া ফেলে রেখেছে। ‘সুবর্ণলতা’ সেই বন্ধন-জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রনার প্রতীক”^(২৪)। উপন্যাসের শুরু থেকেই তার দাম্পত্য জীবনের বিবরণ দেখা যায়; তবে তা মোটেও সুখকর নয়। তার ঠাকুরমা ও বাবার নির্মম খেলালে নয় বছর বয়স থেকেই নারীত্বের অবমাননা দেখে আসছে। তার শাশুড়ি ‘মুক্তকেশী’র নানা রকম অত্যাচার ও কুসংস্কারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে সে একসময় বিদ্রোহী হয়ে যায়। স্বামী-সংসার সমস্ত ক্ষেত্রে বিদ্রোহ করতে গিয়ে একসময় সে হাপিয়ে পড়ে। তবু যেন বার বার পূর্বজন্মের অনুপ্রেরণায় সে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ায়। তখন তার যুক্তি তেজের সামনে কেউ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। কিন্তু তারপরেও যখন পরিবারের সকলে

মিলে তাকে অপমানিত করতে থাকে, তখন সেই অপমান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করতে চায়। কিন্তু বাধ সাধে তার বিবেক মনুষ্যত্ব ও মায়ের দেওয়া শিক্ষা; যা বার বার ফিরে এসেছে সেই দিন-রাত্রির গ্লানির জীবনে। একসময় সে তার এই অসহায়তা থেকে মুক্তির জন্য নির্জনে সাহিত্যচর্চা শুরু করে। তারপর মামাতো ভাসুর ‘জগন্নাথ’ প্রেস খুলেছে শুনে বাড়ির সকলকে লুকিয়ে বই ছাপাতে দিয়েছিল। কিন্তু সস্তা কাগজ ও ভাঙা টাইপে প্রকাশিত হওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল থেকে যায়। আর তাই নিয়ে বাড়ির সকলের মধ্যে ঠাট্টা তামাশায় পরিণত হয়। কথায় আছে পৃথিবীর সকলের সঙ্গে যেকোন বিষয় নিয়ে লড়াই করা চলে, কিন্তু আপনজনেরাই প্রতিপক্ষ হলে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়াটাই শ্রেয়। ‘সুবর্ণলতা’ তাই সমস্ত প্রকাশিত পুস্তক আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। এখানেই তার সমস্ত জীবনের আপোষহীন সংগ্রামের যবনিকাপাত ঘটেছে। আর তাই আমাদের সহজেই মনে হতে পারে, ‘সত্যবতী’ যেখানে নারীসত্তার বিকাশের ধারা কিছুটা হলেও এগিয়ে নিয়ে গেছে সেখানে ‘সুবর্ণলতা’ হয়তো অনেকটাই পিছিয়ে নিয়ে এসেছে। যদিও এক কদম এগিয়ে গিয়ে দু’কদম পিছিয়ে আসাকেও চলমান ইতিহাসের সত্য হিসেবে ধরা হয়। সমালোচক ‘তপোধীর ভট্টাচার্য’ আলোচ্য প্রসঙ্গে একটি সুমনোনীত মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন—

“নারীর নিজস্ব সংবেদনা দিয়ে নারীর একান্ত আপন কথা লিখতে গিয়ে আশাপূর্ণা মূলত নৈঃশব্দের ঝরোখা সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই ঝরোখার আড়ালে যুগের পর যুগ ধরে অজ্ঞাত ও অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে প্রকৃত নারীসত্তা। এই নৈঃশব্দ নির্মান করেছে পিতৃতন্ত্র; নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে প্রতিমা হয়ে ওঠার নিশ্চিদ্র আয়োজন। পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের স্বেচ্ছাবৃত পুতুল হওয়াতে নারীত্বের অবিচল প্রতিষ্ঠা—ধর্মতন্ত্র নিরলসভাবে এই আদর্শ প্রচার করে গেছে। পুরুষের ভাষা, চেতনা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ যে-ছাঁচে তৈরি করেছে, তাকে

সংগ্রহে ও প্রবল উন্মাদনায় মান্যতা দেয় যারা তাদের আদর্শ নারী বলে বন্দনা করেছে রক্ষণশীল পৌরসমাজ। সত্যবতীর প্রতিবাদ ছিল অচলায়তনের এই সর্বগ্রাসী বৌদ্ধিক ও আস্তিত্বিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। অস্ত্রবাসী নারীর মানুষ হয়ে ওঠার সেই প্রথম প্রতিশ্রুতি কিন্তু, সরলীকৃত পাটিগণিতের নিয়মে রক্ষিত হয় না। কোন-এক সুবর্ণলতা প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ মননে জাগিয়ে রেখেও ঈঙ্গিত আত্মাধ্যান করতে পারে না নিষ্ঠুর ও বিবেকশূন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির চাপে। তবু, ...পাঠক লক্ষ করেন : ‘সুবর্ণলতা সেই দুর্লভ মেয়েদের একজন— যারা তাদের কালকে অতিক্রম করে যায়— এগিয়ে দেয় প্রবহমান কালের ধারাকে, যে ধারা মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়ে যায়, নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়। এরা বর্তমানের পূজা পায় কদাচিৎ, এরা লাঞ্ছিত হয়, উপহাসিত হয়, সমসাময়িক সমাজের বিরক্তিভাজন হয়। এদের জন্য কাঁটার মুকুট, এদের জন্য জুতার মালা। ...তবু এরাই একদিন স্মরণীয় হয়ে ওঠে—এদের নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি হয়। ...সুবর্ণলতা এইরকম একটি নারী চরিত্র’^(২৫)। সুবর্ণলতার’ মতো চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের পরে নারী প্রসঙ্গে নারীবাদী সমালোচক ‘মাধবী মাইতির’ একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

“নারীকে নির্মাণ করা হয়। নির্মাণ করে পুরুষ ও নারী উভয়ই। নির্মাণের উদ্দেশ্য কাজে লাগানো। সমাজ-সংসার ব্যক্তি সকলের কাজে লাগানো। পুরুষও নির্মিত হয়। ক্ষমতাবানরাই নির্মাণ করে। ...নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার মোক্ষম জায়গা হল তার যৌনতা। যা পুরুষের চেয়ে বহুগুণে বেশী। এবং তার সন্তান উৎপাদন করার মতো শারীরিক গঠন, যা পুরুষের একেবারেই নেই। এই জায়গাটা থেকেই পিতৃতন্ত্র ভয় পেতে শুরু করেছে নারীকে, তাকে বানিয়ে তুলেছে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে। যেখানে পুরুষের চাওয়াটাই প্রধান। তার ছাপ মারা না থাকলে বিষয়টি অবৈধ’^(২৬)।

‘বকুলকথা’ উপন্যাসেও অনুরূপ ভাবে নারীসত্তার আখ্যান নির্মাণে ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ কয়েকজন নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে ‘বকুল’ ‘পারুল’ ‘শম্পা’, ‘নমিতা’, ‘রেখা’ প্রমুখদের নাম বলা যেতে পারে। তবে ‘বকুল’ এই উপন্যাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নারী সত্তার প্রতিনিধি। সে তার মাতা ও মাতামহীর উপলব্ধির প্রতিটি স্তরের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতাকে আত্মস্থ করে সুস্পষ্ট প্রশান্তিতে নিজেকে মেলে ধরেছে জীবনের পাতায়। সে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সমস্তরকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে তার পূর্বসূরিদের দেখানো পথ অনুসরণ করেনি। ধীর স্থিরভাবে ধৈর্যের সঙ্গে সহ্যশক্তি দিয়ে সত্যের অটল অবিচল অবস্থায় নিজেকে দৃঢ় রেখেছে। ছেলেবেলা থেকেই নিজেকে সাধারণ মানুষ ভাবার জন্য কোনদিন কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করেনি। সে সর্বদা বাস্তব জগৎকে নিরীক্ষণ করেছে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে। আর তাই হয়তো ‘অনামিকা দেবী’ নামে তার সংবেদনশীল অথচ আত্মস্থ শিল্পীসত্তার প্রকাশ ঘটে। নতুন মোড়কে নতুন যুগের উপলব্ধিকে নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকায় তার সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। তার লেখায় মেয়েদের স্বাধীনতা বিষয়ক নানা অভিমত ও বাস্তব জগতের তথাকথিত আধুনিকতার চেহারা ধরা পড়েছে। তার মাতামহী ‘সত্যবতীর’ বাসনা ছিল মেয়েরা শিক্ষিত হোক। তার মা ‘সুবর্ণলতা’ও একইভাবে নারী শিক্ষার পক্ষপাতি ছিল। আর ‘বকুল’ সেই স্বপ্নগুলিকেই যেন ‘অনামিকা দেবী’ ছদ্মনামে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তার ‘মা’ও নিঃসঙ্গ জীবনের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও অনুভূতিগুলিকে ছাপার অক্ষরের মাধ্যমে রূপ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘ বেদনার ইতিহাস পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ‘বকুলের’ পূর্বসূরিদের সমস্তরকম স্বপ্নের অপূর্ণতা যেন পূর্ণ হয়েছে নবজন্ম রূপে ‘অনামিকা দেবী’র কলমে।

অবশ্য ‘অনামিকা দেবীর’ কথা ভালো করে জানতে হলে একটু ফ্ল্যাশব্যাক করে দেখতে হয়। দেখে নিতে হয় ‘বকুলের’ ছোটবেলা আর তার মায়ের জীবনের শেষ পর্যায়। এই প্রসঙ্গে ‘অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়’ লিখেছেন—

“একটু পিছন ফিরে দেখি বকুলের মা সুবর্ণলতার জীবন। চৌত্রিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে সে কী পেয়েছিল? শাশুড়ির হাতে পদে পদে লাঞ্ছনা, অপমান, স্বামীর হাতে প্রহার ও ধর্ষণ (অনিচ্ছায় স্বামীর ইচ্ছা মেটাতে প্রায় প্রতিরাতে দেহদান), আর আটটি ছেলেমেয়ের জন্মদান। সুবর্ণলতা গোপনে লেখালেখি করত, লিখেছিল সুবর্ণলতার আত্মকথা। দূর-সম্পর্কের বটঠাকুর ছাপাখানার মালিক জগন্নাথবাবুর আগ্রহে শস্তা কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা শ্রীহীন বাঁধানো বই তার আত্মকথা। জগন্নাথবাবুর বাড়ি বয়ে দিয়ে যাওয়া সেই বইয়ের বাণ্ডিলের জন্য শ্বশুরবাড়িতে তীব্র উপহাস। তারই প্রতিবাদে ছাদে গিয়ে দুপুর-রোদে সেই বইগুলি সে পুড়িয়ে ফেলেছিল। এটাই সুবর্ণলতার প্রতিবাদ। বস্তুত সারাজীবনই সে প্রতিবাদ জানিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে। দর্জিপাড়ার এই বাড়ি তার কাছে হয়ে উঠেছিল কারাগার। সেই কারাগার থেকে মুক্তির জন্য সুবর্ণলতা শেষ শয্যা পেতেছিল দক্ষিণের বারান্দার চিক্-ফেলা অংশে। সে বারবার এই বাড়ির অনেক বন্ধনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। শেষের দিকে প্রতিবাদ মেয়ে বকুলের জন্য গৃহশিক্ষক রাখা। যে বাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ, সে বাড়ি থেকেই মেয়ে পারুল ও বকুলকে স্কুলে পাঠিয়েছে, গৃহশিক্ষক রেখে তাদের শিক্ষার পথ সুগম করতে চেয়েছে”^(২৭)।

‘বকুল’ বড় হয়ে কেমন হবে তার বেশীর ভাগ শিক্ষাটা পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে। যেসময় মেয়েদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ ছিল, সেইসময় তার মা বাড়িতে গৃহশিক্ষক রেখে মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছে। শিক্ষিত হওয়ার জন্য ‘বকুল’ হয়তো পরবর্তীকালে একজন যথার্থ সাহিত্যিক হতে পেরেছেন।

ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ ত্রয়ী অগ্নিকন্যার মধ্যে একমাত্র ‘বকুল’ নারী শক্তি প্রকাশের আধার রূপে প্রতিচিত্রিত হয়েছে বলে মনে হয়।

‘বকুলের’ কথা শেষ হলে ‘বকুলকথা’ উপন্যাসে ‘শম্পা’র কাহিনী শুরু হয়। আধুনিক জন-জীবনের শিক্ষায় পূর্বজন্দের সমস্তরকম ঘেরাটোপকে অস্বীকার করে নিজের পছন্দের ছেলে ‘সত্যবানের’ সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের সূচনা করে। ঘটনার দ্রুতগতিময়তায় পুরাণের ‘সত্যবানের’ মতো করে তার স্বামীরও দুর্ঘটনায় দুটি পা হাঁটু পর্যন্ত কাটা পড়ে। আর তারপর বাঁচার অদম্য চেষ্টা, জীবনের সঙ্গে ‘শম্পা’র লড়াই চলতে থাকে। তার চারপাশের রঙিন পৃথিবী যেন এক পলকেই অজানা কোন ঝড়ের দাপটে বর্ণহীন হয়ে যায়। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে অনেকেই হয়তো ‘শম্পাকে’ অবক্ষয়ী আধুনিকতার রোল মডেল ধরে নিতে পারেন। এমনকি তাকে সাময়িকভাবে চরিত্রহীন ও বেলেগ্লাপনার দায়ে অভিযুক্ত করতে পারেন। আর তার এই সমস্ত কিছুকে প্রশ্ন দিয়েছে পিসি ‘বকুল’ ওরফে ‘অনামিকা দেবী’। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় থেকেই ‘শম্পা’কে আমরা দেখতে পাই, ঔপন্যাসিক লিখেছেন—

“শম্পার জীবনে এখন একটি নতুন প্রেমের ঘটনা চলছে। এখন শম্পা সব সময় আহ্লাদে ভাসছে। অনামিকা দেবী সঠিক খবর জানেন না, সত্যি কিছু আর সব খবর রাখেনও না, তবু যতটুকু ধারণা তাতে হিসেব করেন, শম্পার এ ব্যাপারে এই নিয়ে সাড়ে পাঁচবার হল। সাড়ে অর্থ এটা এখনও চলছে, তার মানে অর্ধপথে। প্রথম প্রেমে পড়েছিল শম্পা ওর দূর সম্পর্কের মামাতো দাদা বুবুলের সঙ্গে। শম্পার তখন এগার বছর বয়েস, বুবুলের বছর সতেরো”^(২৮)। এইপর্যন্ত শুনে দেখে সকলেই উপরিউক্ত মন্তব্যগুলিকেই সমর্থন করবেন ‘শম্পার’ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে। কিন্তু আদতে সে তার সব পছন্দের ছেলের সঙ্গে প্রেম করেনি, তার মত অনুসারে বলে যায়, ‘কেউ আমার জন্য হাঁ করে বসে

থাকবে না, আমায় দেখলে ধন্য হবে না, এ ভালো লাগে না...কিন্তু সত্যি প্রেমে পড়তে পারি এমন ছেলে দেখি না’। এই মানসিকতার জন্য হয়তো তাকে কিছুটা অন্যভাবে দেখতে হয়। আসলে ‘বকুলকথা’ উপন্যাসের একমাত্র ‘শম্পা’ চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক সমকালীন ‘বিয়ে’ নামক প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির খাঁচা ভেঙে দিতে পেরেছেন। যেভাবে ‘শাস্ত্রে’ বলে এতদিন ধরে পুরুষ নারীকে নরকের দার বলেছে, দাসী ও উনমানব বানিয়েছে, সেই ‘শাস্ত্রের’ ধ্বজাধারী উত্তরপুরুষেরা পাণিগ্রহণের নামে যদি ভোগ্য-পণ্য নারীর সঙ্গে ধন প্রাপ্তিতে মত্ত হয়ে ওঠে তখন তা ‘বিবাহের’ স্বীকৃতি পায়। এই ধারণা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ঔপন্যাসিক ‘শম্পা’ চরিত্রের মধ্য দিয়ে ‘বিবাহ’ নামক প্রাতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছেন। আসলে ঔপন্যাসিক ‘শম্পা’ চরিত্রের মধ্য দিয়ে আলোচ্য উপন্যাসে আধুনিকতার মর্জিকে সমর্থন করেছেন। তিনি লিখেছেন—

“আধুনিক” শব্দটার বিশেষ একটা অর্থ আছে, ওটা বয়েস দিয়ে মাপা যায় না। একজন অশীতিপর বৃদ্ধও আধুনিক হতে পারেন, একজন কুড়ি বছরের যুবকও প্রাচীন হতে পারে। ওটা মনোভঙ্গী। কেবলমাত্র বয়সের টিকিটখানা হাতে নিয়ে যারা নিজেদের ‘আধুনিক’ ভেবে গরবে গৌরবে স্ফীত হয়, তারা জানে না ও টিকিটটা প্রতি মুহূর্তে বাসি হয়ে যাচ্ছে, অকেজো হয়ে যাচ্ছে। কুড়ি বছরটা পঁচিশ বছরের দিকে তাকিয়ে অনুকম্পার হাসি হাসবে। আমি একজনকে জানি, আজ যাঁর বয়েস আশীর কম নয়, তবু তাঁকেই আমি আমার জানা জগতের সকলের চেয়ে বেশি আধুনিক মনে করি”^(২৯)। ‘শম্পা’ চরিত্রটিকে ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ সময় দিয়ে নয় মন মজী দিয়ে আধুনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

‘আশাপূর্ণা দেবী’ অত্যন্ত সচেতন ভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁর সমকালীন সমাজবিবর্তনের ধারা। পুরুষতন্ত্র যেখানে নারীকে তার

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে ধরে নেয়, সেখানে তিনি প্রকৃত মানুষ হিসেবে নারীসত্তার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। নিজেদের জীবনের যে স্বাধীনতার জন্য নারীরা উনিশ-বিশ শতকে দীর্ঘ সংগ্রাম করেছে, তারই বিবরণ যেন ঔপন্যাসিক লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিতে। আমরা যেভাবে তাঁর রচিত ‘ত্রয়ী উপন্যাসের’ নায়িকাদের দেখতে পাই। তেমনি দেখছি অন্যান্য উপন্যাসের নারী চরিত্রকে। আসলে সমস্ত নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক একদিকে যেমন আদর্শ সত্তা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, অন্যদিকে সমকালীন সমাজের সমস্তরকম ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ‘দ্বিতীয় বসন্ত’ উপন্যাসে দেখা যায় ‘বিভাস’ ও ‘লতিকা’ সুখী-দম্পতি। একমাত্র মেয়ে ‘রিম্ফু’কে নিয়ে তাদের সুখের সংসার। উপন্যাসের মাঝেই জানা যায় ‘বিভাস’ ও ‘লতিকার’ প্রাকবিবাহের একটা সুন্দর প্রেমের কাহিনী। বাল্যকাল থেকেই তারা একে-অপরকে ভালোবাসতো। বহুরকম প্রতিকূল পরিবেশেও তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট থেকেছে। কিন্তু আমরা দেখি নির্ভেজাল দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেও মাঝে মাঝে আলোড়ন ওঠে। অবশ্য দাম্পত্যবন্ধন দৃঢ় থাকলে তা তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। ‘লতিকার’ বিবাহিত জীবনে হঠাৎ একজন পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, যে তার স্বামীর সিংহাসনকে টলমল করে দেয়। কিন্তু স্বামীর প্রতি একান্ত ভালোবাসার কারণে তার কেন্দ্রচ্যুতি ঘটেনি। ‘চশমা পাল্টে যায়’ উপন্যাসে স্ত্রী ‘সুকুমারীর’ প্রতি ‘সোমপ্রকাশের’ আশ্চর্য দরদভরা অনুভূতিশীল মনের প্রকাশ দেখা যায়। ‘সোমপ্রকাশ’ নিজের সহজ সরল পত্নীকে একটু স্নেহ মিশ্রিত চোখেই দেখতো। কিন্তু সেই স্নেহের সঙ্গে কতটা ভালোবাসা ছিল সেটা ‘সুকুমারীর’ মৃত্যুর পর সে নতুন করে উপলব্ধি করে। এবং সেই ভালোবাসার প্রকাশস্বরূপই স্ত্রীর ছোটো-খাটো ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সে তার সাধ্যমত পূর্ণ করার চেষ্টা করেছে। ঔপন্যাসিক এরকম বহু উপন্যাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করার মাধ্যমে নারী ও নারীসত্তার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে পেরেছেন। যারা যুগোপযোগী হওয়ার পরেও কাল থেকে কালোত্তীর্ণ হয়ে আজকের যুগেও সমানভাবে সমাদর পেয়ে থাকে।

<<<<<>>>>>

তথ্যসূত্র

- ১) আশাপূর্ণার কলমে পুরুষ: নারীর ত্রিবার্ষিক অভিযাত্রায়, ড. ছন্দা রায়, আশাপূর্ণা দেবী জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনা-আশাপূর্ণা দেবী মেমোরিয়াল কমিটি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭৫.
- ২) ‘গৃহধর্ম’, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রকাশক-প্রসূন বসু- নবপত্র প্রকাশন, প্রকাশকাল-১৫ই এপ্রিল ২০০৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২০.
- ৩) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা. লি., পুনর্মুদ্রণ-২০১১/১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৩.
- ৪) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে’জ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩.
- ৫) ‘প্রেম ও প্রয়োজন, আশাপূর্ণা দেবী, আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলী,(তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদনা-অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪৭.
- ৬) আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড, ভূমিকা অংশ) সম্পাদনা-অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-০২.
- ৭) মেয়েদের লেখালেখি, সুতপা ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপনি, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৪
- ৮) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৮.
- ৯) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা. লি., পুনর্মুদ্রণ-২০১১/১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮.
- ১০) আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড, ভূমিকা অংশ) সম্পাদনা-নিতাই বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-০৫.
- ১১) ‘মিত্তির বাড়ি’, ‘আশাপূর্ণা দেবী’, আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), সম্পাদনা-নিতাই বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৩.
- ১২) ‘মিত্তির বাড়ি’, ‘আশাপূর্ণা দেবী’, আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), সম্পাদনা-নিতাই বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭৪.

১৩) ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’ (তৃতীয় খণ্ড, ভূমিকা অংশ) সম্পাদনা-অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-০৪.

১৪) চিত্রা দেব’কে দেওয়া আশাপূর্ণা দেবীর সাক্ষাৎকার, পুনঃমুদ্রিত-যা হয় তাই আমি লিখি, কবিতীর্থ/অষ্টবিংশতি বর্ষ- গ্রীষ্ম সংখ্যা-১৪১৬, সম্পাদক-উৎপল ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭১.

১৫) ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘আশাপূর্ণা দেবী’, ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’ (সপ্তম খণ্ড) সম্পাদনা-অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪২৭.

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১৮.

১৭) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৮৩.

১৮) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪২৩.

১৯) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫২৮.

২০) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৪২.

২১) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৪৭৫.

২২) ‘বকুলকথা’, ‘আশাপূর্ণা দেবী’, ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’ (সপ্তম খণ্ড) সম্পাদনা-অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা -১২৮.

২৩) ‘আর এক আশাপূর্ণা’, ‘আশাপূর্ণা দেবী’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – মাঘ ১৪০১, পৃষ্ঠা সংখ্যা -১৫-১৬.

২৪) ‘সুবর্ণলতা’, ‘আশাপূর্ণা দেবী’, ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’ (সপ্তম খণ্ড) সম্পাদনা-অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৮৩.

২৫) ‘সুবর্ণলতা : নারীসত্তার নির্মাণ-প্রকল্প’, তপোধীর ভট্টাচার্য, আশাপূর্ণা নারী পরিসর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা -১৯৭.

২৬) মিথ্যা গোপনীয়তা নৈঃশব্দ অবলা সন্দর্ভ, মাধবী মাইতি, প্যাপিরাস, ২ গগেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা-০৪, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১২. ভূমিকা(রিভিউ অংশ)

২৭) ‘বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি’, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১০০-১০১.

২৮) ‘বকুলকথা’, ‘আশাপূর্ণা দেবী’, ‘আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী’ (সপ্তম খণ্ড) সম্পাদনা- অরুণ কুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩২৮.

২৯) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৭৪.

<<<<<>>>>>

ষষ্ঠ অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী ও অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা

ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যখন সম-মানসিকতা সম্পন্ন সম-জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়, তখন দুই বা ততোধিক ভ্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনা প্রথম প্রচলন করেন ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’। তিনি সাহিত্যের সৌন্দর্য খুঁজেছিলেন সমগ্রতার মধ্যে। ‘উত্তরচরিত’ রচনা থেকেই তিনি পাশ্চাত্য পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। সেই সূত্রেই স্বদেশীয় ‘জয়দেব’-এর সঙ্গে ‘বিদ্যাপতির’, ‘কালিদাসের’ ‘কুমারসম্ভবে’র সঙ্গে ‘মিল্টনের’ ‘প্যারাডাইস লস্ট’, ‘কালিদাসের’ নায়িকা শকুন্তলার সঙ্গে ‘শেকসপীয়রের’ দুই নায়িকা মিরন্দা ও দেসদিমোনার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ ‘সাহিত্য’ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘বিশ্বসাহিত্য’ প্রবন্ধে তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের কথাই বলেছেন। অবশ্য এই সবার বহুপূর্বে ইংরেজ কবি ‘মেথিউ আর্গল্ড’ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ‘Comparative Literature’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এর পরবর্তীকালে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘Hutcheson Macaulay Posnett’ প্রথম ‘Comparative Literature’ শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। ‘Webster’s’ ‘Encyclopaedic Unabridged Dictionary of English Language’ গ্রন্থে তুলনামূলক সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন –“The study of the literature of two or national groups differing on cultural background and usually in language, concentrating on their relationship to and influences upon each other.”^(১)

এই একই বিষয়ে একটু ভিন্নভাবে ‘ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন’ তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কে লিখেছেন। ‘সিনি সাহিত্য অকাডেমী’ দ্বারা প্রকাশিত ‘Contemporary Indian literature’ গ্রন্থে লিখেছেন –“There is a unity of outlook as the writers in different languages derive their inspiration from a common source and face more or less the same kind of experience, emotional and intellectual.”^(২)

সার্বিক প্রেক্ষিতে আমরা তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনা সম্বন্ধে বলতে পারি যে, বিভিন্ন ভাষায় বা একই ভাষায় সমজাতীয় সৃষ্টি বা সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে স্বতন্ত্র ও স্পষ্ট করে তোলা। সেক্ষেত্রে একালের সাহিত্যের সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের তুলনা হতে পারে। এই বিচার বিভিন্ন ভাষায় সম-মানসিকতা সম্পন্ন কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও কথাকার সাহিত্যিকদের মধ্যে হতে পারে। কোনো একজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে কিছু বিষয় বিশ্লেষণ করতে হলে, তাঁর সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনাতেও সমান দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তাতে করে এই দুই পর্বের ঔপন্যাসিকদের রচনার সঙ্গে আলোচ্য ঔপন্যাসিকের রচনার তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব। ঔপন্যাসিকরা তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে মানুষের সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরেন। আর তা সঠিক মূল্যায়ন হয় তুলনামূলক পদ্ধতির দ্বারা। সুতরাং সাহিত্য সমালোচনার অন্যতম ধারা হিসেবে তুলনামূলক অধ্যয়ন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত সূত্র ধরেই ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ পূর্ববর্তী ও সমকালীন লেখক-লেখিকাদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা যেতে পারে। আমরা দাম্পত্য সম্পর্ক কেন্দ্রিক তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে দুটিপর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি। আলোচ্য পর্বদুটি হল যথাক্রমে:—

১/ ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ও অন্যান্য নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা।

২/ ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ও অন্যান্য পুরুষ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা।

➤ ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ও অন্যান্য নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা :- ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বলেছিলেন যে – ‘পূর্বজ লেখক-লেখিকাদের ঋণ তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে’। আমরা সহজেই একটি কথা স্বীকার করে নিতে পারি যে, সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের নানারকম স্তর অতিক্রম করার পরে, একজন নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন। উপন্যাসের মতো জটিল সাহিত্য রচনার জগতে নারীরা তুলনায় পুরুষদের থেকে অনেক পরে প্রবেশ করেন। অবশ্য নানারকম সামাজিক অবরোধ জনিত কুসংস্কার এই বিলম্বের মূল কারণ বলে অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, ‘নিরুপমা দেবী’, ‘অনুরাধা দেবী’, ‘গীরিবালা দেবী’, ‘সীতা দেবী’, ‘শান্তা দেবী’, ‘অনুরূপা দেবী’, ‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’ ও ‘আশাপূর্ণা দেবী’দের মতো ঔপন্যাসিকদের যেভাবে সমাজের নানারকম বাঁধা অতিক্রম করে লেখার জগতে প্রবেশ করতে হয়েছে, তা পৃথিবীর যে কোন সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পূর্বজদের তুলনায় পরবর্তীকালের অন্যতম নারী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ‘মহাশ্বেতা দেবী’, ‘বাণী বসু’, ‘নবনীতা দেবসেন’, ‘মদ্রাকান্তা সেন’, ‘তিলোত্তমা মজুমদার’, ‘তসলিমা নাসরীন’, ‘সুচিত্রা ভট্টাচার্য’, ‘সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়’, ‘সেলিনা হোসান’, ‘মল্লিকা সেনগুপ্ত’ প্রমুখদের চলার পথ কিছুটা হলেও প্রশস্ত ও মসৃণ হয়েছে পূর্বজদের কর্মসফলতার কারণে। প্রখ্যাত উপন্যাস সমালোচক ‘শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়’ আলোচ্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করে লিখেছেন:-

“বাংলা উপন্যাসে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা মহিলা ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব। উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় প্রেম, নর-নারীর পরস্পরের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ রহস্য; ইহারই অফুরন্ত বিচিত্রতা উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পল্লবিত হইয়াছে। এই প্রেম চিত্রণের ভার যদি সম্পূর্ণরূপে পুরুষেরই একচেটিয়া হয়, তাহা হইলে ইহা যে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ একদেশদর্শী হইবে ইহা

অনুমান করা কঠিন নয়। ...অবশ্য ইহাও সত্য যে, সাহিত্যের উৎকর্ষের মানদণ্ড স্ত্রী-পুরুষ নিরপেক্ষ ভাবে নির্ধারিত হইয়াছে— পুরুষ-নারীর রচিত সাহিত্য-বিচারে কোন ভিন্ন আদর্শ নাই। চরিত্র বিশ্লেষণে ও জীবন সমস্যার গভীরতা প্রতিপাদন সমস্ত উৎকৃষ্ট উপন্যাসেরই সাধারণ ধর্ম”।^(৩)

নারী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তাই ভিন্নতা তেমনভাবে চোখে পড়ে না, সকল নারী ঔপন্যাসিক প্রায় একইভাবে সমাজের বিভিন্ন ঘটনার রূপাঙ্কনে সহজাত রূপে নিয়োজিত ছিলেন। তবুও আলোচনার প্রেক্ষিত হিসেবে বলা যায়, ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ তুলনায় অন্যান্য নারী ঔপন্যাসিকদের রচনায় কিছুটা স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি যেভাবে পরিবার তথা সমাজের অন্তঃপুরকে দেখেছেন ও বুঝেছেন, তারই প্রতিরূপ প্রতিচ্ছবি যেভাবে লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন; তুলনায় অন্যান্য নারী ঔপন্যাসিকরা কিছুটা হলেও সেই স্থানে সঠিকভাবে পারদর্শীতা দেখাতে পারেননি বলে মনে করা যেতে পারে।

প্রথম দিকে যে নারী-ঔপন্যাসিকরা কলম ধরেছেন তাঁরা অনেকেই পুরুষ-ঔপন্যাসিকদের কণ্ঠস্বরকে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্য রচনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়। কারণ উপন্যাস রচনার যে ধারা পুরুষ-ঔপন্যাসিকরা তৈরি করেছিলেন সেই পথকে খুব সহজে অগ্রাহ্য করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রথম দিকের নারী-ঔপন্যাসিকদের পড়াশুনা শিক্ষার দিকটিও আলোচ্য বিষয়ে বিশেষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে ‘শিবনাথ শাস্ত্রী’ ‘বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন’ সম্পর্কে লিখেছেন—

“...১৮৪৯ সালে মহাত্মা বীটন্ বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন বলিয়া এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে, বঙ্গদেশে তাহাই স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রচলন। বহুকাল পূর্ব হইতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিবার

চেষ্টা চলিতেছিল। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিতেছি : ১৮১৭ সালে স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হওয়া অবধি এই প্রশ্ন উঠে যে, বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইবে কিনা? এই বিষয় লইয়া সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। রাধাকান্ত দেব উক্ত সোসাইটির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন; এবং স্কুল সোসাইটির অধীনস্থ কোনও কোনও পাঠশালাতে বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকেও শিক্ষা দিবার রীতি প্রবর্তিত করেন”^(৪)।

একইসঙ্গে সমালোচক ‘শাস্ত্রী মহাশয়’ স্বীকার করেন যে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা হলেও তা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়নি। তাই নারীদের শিক্ষার গতি শমুকগতিতে এগিয়ে চলেছিল, আর তার পেছনে ছিল পুরুষ সমাজপতিদের দয়া-দাক্ষিণ্য। তাই আমরা স্বাভাবিক ভাবে স্বীকার করে নিতে পারি যে, নারীদের শিক্ষার জগতে বিলম্বে প্রবেশের কারণে সাহিত্য রচনার প্রাকমুহূর্তে পুরুষ-সাহিত্যিকদের প্রাধান্যতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য ছিল। যদিও আমরা সাহিত্যের যথাযথ মানদণ্ডের বিচারে বলতে পারি— “পুরুষ অথবা নারী যাঁরই রচনা হোক সাহিত্যের মানদণ্ড হবে সাহিত্যের গুণ যথার্থ বজায় আছে কিনা তা খতিয়ে দেখে”^(৫)। অবশ্য নারীদের রচিত সাহিত্যের যথার্থ বিশ্লেষণ করার জন্য উদ্ধৃত মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য, এছাড়াও যে কারণগুলি নারী ঔপন্যাসিকদের সাহিত্য রচনার প্রতিকূলতার জন্য যথাযথ বলে মনে হয় তা নিম্নে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:—

প্রথমত:— পুরুষদের তুলনায় নারীদের পড়াশোনা তথা শিক্ষার জগতে অনেকটা বিলম্বে প্রবেশ করা।

দ্বিতীয়ত:— নারীদের নানারকম সামাজিক কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করতে হয়েছে, এবং কিছু ক্ষেত্রে পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হয়েছে।

তৃতীয়ত:— নারীদের মেনে নিতে হয়েছে পরিবারের নানারকম অনুশাসন ও গণ্ডিবদ্ধ জীবনের কুসংস্কার।

চতুর্থত:— নানাবিধ কারণ দেখিয়ে পুরুষশাসিত সমাজে নারী রচিত সাহিত্যের সামাজিক স্বীকৃতিতে বাঁধা।

পঞ্চমত:— নারীদের প্রতি পিতৃতন্ত্রের আক্রোশ।

উপন্যাস রচনার প্রথম দিকে নারী ঔপন্যাসিকদের কিছুটা প্রক্ষিপ্ত ও পদানুসরণ করতে হয়েছিল। আর তাই ব্যতিক্রমী সাহিত্য রচনায় আমরা প্রথম দিকের নারী ঔপন্যাসিকদের তেমনভাবে পাইনি। যদিও স্বীকার করে নিতে হয় ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’ ও ‘নিরুপমা দেবী’ প্রমুখদের মতো লেখিকাদের স্বভাবসিদ্ধ সফলতার কথা। এই প্রসঙ্গে ‘সুদক্ষিণা ঘোষ’ লিখেছেন—

“বিংশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশকের যে সমাজে দাঁড়িয়ে অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী বা গিরিবালা দেবীরা উপন্যাস লিখেছেন, সে সমাজ ছিল পুরুষ প্রাধান্যের, নারী জীবনও প্রধানত ছিল পুরুষ নির্ভর, পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েই গড়ে উঠতে শিখত অধিকাংশ মেয়েই, তাই স্বভাবতই এঁদের রচনাতেও এসেছে পুরুষ প্রাধান্য, কোনো পুরুষের আশ্রয়ের নিরাপত্তায় পৌঁছে তাঁরা মনে করেছেন সেইখানেই পথ চলার শেষ। তবু, নিরুপমা দেবী তার মধ্যেই খুঁজেছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, স্বামীকে বাদ দিয়ে জীবন যাপনের ছবি কখনো কখনো প্রতিবাদ হিসেবে ধরা দিয়েছে তাঁর উপন্যাসে”^(৬)।

‘নিরুপমা দেবীর’ উপন্যাসে যেরকম দাম্পত্য জীবনের কথা আমরা জানতে পারি; ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাসেও অনুরূপ দাম্পত্য সম্পর্কের কথাচিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ‘অনুরূপা দেবী’ ও ‘গিরিবালা দেবী’দের মতো ঔপন্যাসিকরা সুখী দাম্পত্য জীবনের কথা সাহিত্যের মধ্যে বেশী করে বলতে পছন্দ করতেন। বিশেষত তাঁদের উপন্যাসে দেখা যায় স্বামীর পায়ে জীবন আত্মবিসর্জন দিয়ে নারীরা বধূবেশে সারাজীবন সুখেই কাটিয়ে দেয়। নিজেদের দাম্পত্য জীবনকে মধুর করে তোলাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। সেই পটভূমিকায় ‘অনুরূপা দেবী’ কিছুটা চেষ্টা করেছেন প্রতিবাদী সত্তার মধ্য দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্ককে প্রকাশ করতে। স্বামীত্বের অটল সংস্কারকে মেনে না নিয়ে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্ররা প্রতিবাদ করে, অধিকারের প্রশ্নে, মর্যাদার প্রশ্নে, নারীত্বের প্রশ্নে। তাঁর ‘অন্নপূর্ণার মন্দির’ উপন্যাসটির কথা আলোচ্য প্রসঙ্গে সূত্রালেখ করা যেতে পারে। ‘সতী’ নামে নায়িকা চরিত্রটি যেভাবে প্রতিবাদ করেছে তা পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে তেমন চোখে পড়ে না। প্রণয় প্রার্থী ‘বিশ্বেশ্বর’ একদিন ‘সতীর’ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিল। এরপর অনেক জল গড়িয়ে গেছে সংসার নদী দিয়ে, ‘সতীর’ সঙ্গে ‘বিশ্বেশ্বরের’ মিলন সম্ভব হয়নি। বহুদিন পর নিজের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে দিয়ে ‘সতী’ প্রতিবাদের ভাষায় ‘বিশ্বেশ্বর’কে চিঠি লিখে জানায় –“এই অধম জাতিকেই একদিন তুমি ভালোবাসিবে, এ অধম জাতি বুকের মধ্যে কতখানি সমুদ্র লুকাইয়া রাখে, একদিন তাহা মর্মে মর্মে বুঝিবে। সেদিন স্বীকার করিবে, সংসারে স্নেহের আদান-প্রদানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সুখ”।^(৭) আমরা ‘আশাপূর্ণা দেবী’ রচিত ‘বকুলকথা’ উপন্যাসের ‘বকুল’ চরিত্রটির কাছে এরকম প্রতিবাদী স্বর শুনতে পাই। যে প্রেম প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর কোনদিন বিবাহ করবে না সংকল্প করে জীবন কাটিয়ে দেয়। আসলে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ যেখান থেকে পথ চলা শুরু করেছিলেন, তাঁর

পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকরা সেখানে এসেই চলার পথ শেষ করেছিলেন। ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’ আর ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ সময়ের ব্যবধানের কারণে তাঁদের রচিত সাহিত্যের বিষয় স্বাভাবিক ভাবে ভিন্নতর হয়েছে। ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’ রচিত ‘কাহাকে’ উপন্যাসে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে মূলত সুখী-দাম্পত্য জীবনের কথাই বলতে চেয়েছেন বলে মনে করা হয়, দাম্পত্য জীবনে নারীর ভালোবাসা ও অধিকার নিয়েই তিনি মূলত প্রশ্ন করেছেন। যেভাবে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ সৃষ্ট অনবদ্য চরিত্র ‘সত্যবতী’ স্বামীর অভিশাপের বিরুদ্ধে বলে—“তাই তো দিয়ে আসছো তোমরা আবহমানকাল থেকে। স্বামী হয়ে, বাপ হয়ে, ভাই হয়ে, ছেলে হয়ে। ওটা নতুন নয়, অভিশাপেরই জীবন আমাদের”^(৮)।

‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাস অনুসন্ধান করে যেরকম দাম্পত্য সম্পর্কের কথা পাওয়া যায়, তার কিছুটা মিল পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের পাতায় লক্ষ করা যেতে পারে। তবে একই সঙ্গে একথাও বলা যেতে পারে যে পূর্ববর্তী নারী-ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যের মধ্যে ছিল নিয়মানুবর্তীতা ও অনুকরণ বিষয়ক দাম্পত্য জীবনের প্রকাশ, যা ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাসে নেই বললেই চলে। পূর্ববর্তী নারী ঔপন্যাসিকরা সুখী-দাম্পত্যের মধুর মিলন দেখিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি সাধিত করেছেন। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ সুখী-দাম্পত্য অথবা অসুখী-দাম্পত্য উভয় ক্ষেত্রে সাবলীল; এবং তিনি শুধু বিবরণ নয়, সমস্যা নির্ণয় করে সমাধানের পথ তৈরির সূত্র নির্দেশ করেছেন।

‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি শুধুমাত্র পারিবারিক-দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে অনুসন্ধান করে, তাঁর পূর্ববর্তী নারী-ঔপন্যাসিকদের রচনায় নারীচরিত্রগুলির দাম্পত্য সম্পর্ক সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ পেয়েছে। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ তাঁর

প্রথম উপন্যাসে যেভাবে সুখের আড়ালে নষ্ট-দাম্পত্যের কথা বলেছেন, তা প্রমাণ করে যে তিনি সেকাল ও পরবর্তীকালের নারীদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন। তিনি লেখার মধ্য দিয়ে আঘাত দিতে চেয়েছেন সেই সমস্ত সমাজপতিদের, যারা ‘বাল্যবিবাহ’, ‘বহুবিবাহ’, ‘গৌরীদান’, ‘কন্যাদান’ এরকম বহুনামে নারীদের কুসংস্কারের অন্ধকারে বন্দী করে রাখতে চেয়েছেন। তাই হয়ত তিনি প্রথম উপন্যাসের নায়িকা ‘আরতির’ মধ্য দিয়ে অন্ধকার বন্ধন ত্যাগ করে আলোর পথের সন্ধান দিয়েছেন। নিজের জীবনের সমস্ত দুর্গতি মেনে নিয়েও ‘আরতির’ দাম্পত্য জীবনের সুখ স্থায়ী হয়নি। তার দাম্পত্য জীবনের সুখ হঠাৎ উধাও হয়ে যায় গৃহী থেকে সন্ন্যাসী হওয়া স্বামীর অবহেলার কারণে। তবু সে দাঁত কামড়ে পরে থাকে সংসারের কঠিন বন্ধনে। কিন্তু যখন তার একমাত্র সন্তান অবহেলায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, তখন সে স্বার্থপর স্বামীকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পরবর্তী জীবনে ‘আরতি’ আবার আর একজন সহৃদয় মানুষের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল। অবহেলায় আত্মবিসর্জন না দিয়ে প্রতিবাদের যে ভাষা ‘আরতি’ খুঁজে পেয়েছে তা পাঠককে কিছুটা সন্তুষ্ট করে দেয়। আলোচ্য বিষয়ের নিরিখে স্বাভাবিক ভাবে বলা যেতে পারে, প্রথম দিকের নারী ঔপন্যাসিকদের তুলনায় ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ ও বিবরণে একটু ভিন্ন মাত্রা লক্ষ করা যায়। পূর্ববর্তিনী ঔপন্যাসিকদের প্রভাব তাঁর লেখায় আছে কিনা, সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

“পূর্ববর্তিনীদের প্রভাব পড়েছে কিনা, সে বিচার পাঠকের। তবে আমার যা কিছু জানা সবই তো বই পড়ে। যাঁদের বই পড়েছি সেখান থেকে কিছু নিয়েছিও হয়তো। তবে স্বেচ্ছায় কাউকে অনুকরণ করেছি বলে মনে হয় না। তবে আগে যাঁরা লিখতেন তাঁরা মোটামুটি সবাই আদর্শ প্রধান লেখা লিখতেন, অর্থাৎ সেখানে বলা হত ‘এরকম হওয়া উচিত’। আমি

বরাবরই লিখি ‘এরকম হয়’। এইরকম হওয়া উচিত একথা বলি না।
...আমি মেয়েদের জীবনের মানসিক সংগ্রামের কথাই বলেছি। বহিজীবনের
জটিলতার জট খুলতে চেষ্টা করিনি। অর্থাৎ আমার লেখা প্রধানত
মনস্তত্ত্বমূলকই। ঘটনাবহুল তেমন নয়”।^(৯)

পূর্ববর্তিনী ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে লেখিকা নিজে যে পার্থক্যের কথা
বলেছেন, তারপরে আর তেমনভাবে আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশেষ কিছু বলার
থাকে না। অন্যদিকে ঔপন্যাসিক নিজেই তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের থেকে
নিজেকে আলাদা করে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। তিনি জেনে-বুঝেই
লিখেছেন সমাজে যে ঘটনাগুলি ঘটে তার বিবরণ, তিনি কখনোই লেখেননি
যে সমাজে এরকমটি হওয়া উচিত। তাই তাঁর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা খুব
সহজেই পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচিত উপন্যাসের থেকে তাঁর রচিত
উপন্যাসের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি।

- ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ও অন্যান্য পুরুষ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের
তুলনামূলক আলোচনা:- বাংলা কথাসাহিত্যের জন্মালগ্ন থেকেই নারী
ঔপন্যাসিকদের তুলনায় পুরুষ ঔপন্যাসিকরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন,
সাহিত্যের ইতিহাসে সেকথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ‘প্যারিচাঁদ মিত্র’, ‘ভূদেব
মুখোপাধ্যায়’, ‘কালিপ্রসন্ন সিংহ’ প্রমুখ ঔপন্যাসিকরা যে পথে চলার সূচনা
করেছিলেন ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ তাতে বিশেষ পালক সংযোজন
করেছিলেন। উপন্যাস রচনা ও উৎকৃষ্টতার বিচারে তাঁর নাম সর্বাত্মে স্মরণ করা
হয়। নানাবিধ কারণে সমালোচক ‘অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়’ তাঁকে বাংলা
সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে অভিহিত করেছেন।^(১০) অবশ্য সেজন্য
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কারণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে উঠে আসতে পারে।
আমরা জানি কথাসাহিত্যের দুটি শাখার রচনাগুণেই সৃষ্টি ও বিকাশের

ধারাবাহিক ইতিহাস ধারণ করে জন্মলগ্ন থেকে লালিত-পালিত হয়েছে। সাধারণত যেকোন একজন কথাকার সেই ঘটনাবলীকেই সাহিত্যে সৃজন করেন, যা বাইরের জগত থেকে তাঁর মনের মধ্যে জারিত হয়। আবার বাইরের জগতের মতো করেই তিনি তা সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন। মূলত ঔপন্যাসিকদের উপর এই দায়িত্ব বেশী করে বর্তায় বলে মনে করা যায়। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবে একটি কথা বলা যায় যে, সমাজের সমসাময়িক ঘটনার অভিঘাত যেভাবে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে প্রকাশিত হয়, সাহিত্যের অন্য কোন শাখায় সেইভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না। যদিও বৈধ-অবৈধ প্রেম, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের নানা রূপ থেকে রূপান্তর মধ্যযুগের সাহিত্য পাঠ করেও আমরা জানতে পারি। কিন্তু বর্তমান অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে বদলে যাওয়া মানুষের সম্পর্কের ব্যাখ্যান আধুনিককালের অন্যতম সাহিত্যশাখা উপন্যাসের মধ্যে আরও নিবিড় ও সূক্ষ্মভাবে চোখে পড়ে। মূলত যুগসমস্যা-যুগযন্ত্রণা যেভাবে ঔপন্যাসিকদের ভাবিয়ে তুলেছে এবং যেরকম ভাবে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন একালের মানুষের জীবনযাত্রা, তাই যেন তাঁদের রচিত উপন্যাসের শরীরে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরে থাকেন। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমালোচক ‘সত্যেন্দ্রনাথ রায়’ একটি মন্তব্য করেছেন, তিনি লিখেছেন –

“উপন্যাস তার জন্মকালীন পরিবেশ দ্বারা, তার ঐতিহাসিক দায়িত্বের দ্বারা, যে আবেগ ও উৎকর্ষা নিয়ে তার জন্ম সেই আবেগ ও উৎকর্ষার দ্বারা অনেকখানিই যে নিয়ন্ত্রিত হয় তাতে সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই যে তার কন্টেন্ট ও ফর্ম, তার বিষয় এবং রূপ, দুইই কিছু পরিমাণে এই নিয়ন্ত্রণের অধীন। আবার এতেও কিন্তু সন্দেহ নেই যে, উপন্যাসকারের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, তাঁর নিজস্ব জীবনবোধ, তাঁর নিজস্ব শিল্পবোধ, রূপসৃষ্টি, রীতি-সচেতনতা, উপন্যাসকারের ব্যক্তিগত প্রতিভা, এ-ও উপন্যাসকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। উপন্যাসের কন্টেন্ট ও ফর্ম দুইই প্রতিভার এই

নিয়ন্ত্রণকে মেনে নেয়। উপন্যাস একই সঙ্গে শিল্পীর সামাজিক ক্রিয়া এবং তাঁর ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশ। ভাষান্তরে বলা যায় উপন্যাস একইসঙ্গে শ্রেণীর প্রকাশ ও ব্যক্তিরও প্রকাশ”^(১১)।

এই ব্যক্তি ও শ্রেণীকে নিয়েই সমাজের যে দন্দ তার যোগসূত্রের কারণে গড়ে ওঠে বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন। যেভাবে পর্যায়ক্রমে উপন্যাসের ধারা এগিয়ে গেছে ঠিক সেভাবেই পাল্টে গেছে কাহিনী ও চরিত্রের বয়ান। আর তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পূর্ববর্তী উপন্যাসিকদের সঙ্গে পরবর্তীকালের উপন্যাসিকদের রচনার তুলনা ঠিক যথাযথ ভাবে প্রস্ফুটিত হয় না। যদিও ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের’ আগে যাঁরা উপন্যাস রচনা করার প্রয়াস দেখিয়েছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের রচনার শিল্প সার্থকতা পরবর্তীকালের সমালোচকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। প্রথম উপন্যাসের নিদর্শন হিসেবে ‘আলালের ঘরের দুলাল’ উপন্যাসটিকে ধরা হয়, কিন্তু সে সম্পর্কে সমালোচকদের সুরে সুর মিলিয়ে বলা যায় –“উপন্যাসটিতে অনেক বেশী সত্য আছে, কিন্তু তুলনায় জীবন জিজ্ঞাসার অভাব লক্ষ্যণীয়”^(১২)। তাই ‘বঙ্কিম পর্ব’ থেকেই আলোচনার সুবিধার জন্য এই বিষয়ের তথ্য সন্ধানের চেষ্টা করা যেতে পারে। ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ মূলত বেশীরভাগ উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিভিন্ন আঙ্গিক রচনা করেছেন বলে মনে করা হয়। ‘বিষবৃক্ষ’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, ‘কপালকুণ্ডলা’, ‘রজনী’ ইত্যাদি উপন্যাসে বিবাহিত পুরুষের বিভিন্ন আসক্তি ও ফলাফল হিসেবে নষ্ট-দাম্পত্য সম্পর্কের কথা লক্ষ্যণীয়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অবৈধ-দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটিয়েছেন কেন্দ্রীয়-চরিত্রের মৃত্যু দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ ও তাঁর পরবর্তীকালের উপন্যাসিকদের উপন্যাসে মৃত্যুকে নয় জীবনকেই প্রাধান্য দেওয়ার রীতি প্রচলিত হতে শুরু করে। একবাক্যে স্বীকার করতে হয় এক্ষেত্রে কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেছেন ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’। ‘ফ্যাক্ট অফ এন্ডিং’ দেখিয়ে ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’

যেখানে জনপ্রিয় ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ ও পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকরা ‘ফ্যান্ট অফ স্টারটিং’ দেখিয়ে উপন্যাসের বহুরূপতার পথ খুলে দেন। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ অবশ্য ‘বঙ্কিমচন্দ্র’, ‘রবীন্দ্রনাথ’ ও শরৎচন্দ্র প্রমুখদের সাহিত্য রচনার অনুগামী হয়েও নারীকে ভিন্ন পথে জয়ী করে তুলেছেন তাঁর বেশীর ভাগ উপন্যাসে। তিনি অবশ্য মৃত্যুকে নয় জীবনকেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু জীবনের কথা বলতে গিয়ে জীবন-মরণ সংগ্রামের কথা তেমন ভাবে তুলে ধরেননি। অবশ্য অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের তুলনায় তিনি উপন্যাসের পাতায় অবৈধ-সম্পর্কের কথা অনেকটা কম পরিমাণে ব্যক্ত করেছেন। আজকের পাঠক হিসেবে আমরা বলতে পারি ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ আসলে দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র আঁকতে গিয়ে পাঠককে অলক্ষ্যে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন এবং পরবর্তীকালে ঘটনা পরম্পরায় সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানসিক সুস্থ সুকুমার বৃত্তির জয় ঘোষণা করেছেন। ‘বঙ্কিমচন্দ্রের’ কয়েকটি উপন্যাসে বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গ আছে। আট-নয় বছরের ‘শৈবালিনীর’ বিবাহ হয়েছিল শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ‘চন্দ্রশেখরের’ সঙ্গে। শুধু বাল্যবিবাহ নয় তিনি তার পরিণাম বা পরিণতিও দেখিয়েছেন ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে। আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ বাস্তবতাকে যথার্থ ভাবে চিত্রিত করেছেন সাহিত্যসম্রাট ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’। সেকালের নারীদের জীবন ও জীবন কেন্দ্রীভূত সমস্যাকে তুলে ধরতে গিয়েই তিনি সৃষ্টি করেছেন ‘সূর্যমুখী’, ‘কুন্দনন্দিনী’, ‘ভ্রমর’, ‘প্রফুল্ল’, ‘শৈবালিনী’, ‘বিমলা’, ‘আয়েষা’, ‘মৃণালিনী’, ‘কপালকুণ্ডলা’, ‘মতিবিবি’, ‘রজনী’, ‘লবঙ্গলতা’, ‘রোহিনী’, ‘হীরামালিনী’, ‘জেবউন্নিসা’, ‘দরিয়াবিবি’, ‘কল্যানী’ প্রমুখ নারী চরিত্রের। উক্ত নারী চরিত্রগুলির মধ্যে অনেকেই বেশীরভাগ সময়ে পুরুষের অঙ্গুলীহেলনে পুতুলের মতো জীবনযাপন করেছে। নারীর অন্তর্করণকে তেমনভাবে ‘বঙ্কিমচন্দ্রের’ উপন্যাসে আবিষ্কার করা সম্ভব হয় না বলেই মনে হয়। শুধুমাত্র

সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ও তাকেই কেন্দ্র করে মোহিত পুরুষের লিপ্সার কারণে ফলাফল হিসেবে দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন ও বিপর্যয়ের চিত্রকথার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ‘বঙ্কিমচন্দ্রের’ পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকরা নানারকম দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে পুরুষদের তুলনায় নারীকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন বলে মনে হয়। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের’ উপন্যাস রচনার সময়কাল থেকেই সেই প্রবণতা লক্ষণীয়। পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উক্ত প্রবণতা থেকে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ব্যতিক্রমী হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে উপন্যাসের কাহিনীতে নারী ও পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্ব সহকারে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এককেন্দ্রিকতা তেমনভাবে লক্ষ করা যায় না। তাঁর সমস্ত উপন্যাসগুলিতে তেমনভাবে কোথাও নারীকে পুতুলের মতো পুরুষের ইশারায় চালিত হতে দেখা যায়নি। তুলনায় যেন পুরুষ চরিত্রের থেকে নারী চরিত্রগুলিকে অনেকটাই প্রতিবাদী হিসেবে লক্ষ করা যায়।

‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ রচিত উপন্যাসে পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের তুলনায় মানুষের সমস্তরকম সম্পর্কের নতুন ভাষ্যের সন্ধান বেশী করে পাওয়া যায় বলে মনে করা হয়। একদিকে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের সম্মেলনে সমস্তরকম কর্মপন্থায় পুরুষের স্থান নারীকে দখল করতে দেখা যায়। অন্যদিকে বহুকালের প্রেক্ষিতে প্রাচীন সাহিত্য থেকে যে মানব দেহ কেন্দ্রিক বন্দনা শুরু হয়েছিল, তা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে তিনি প্রথম মনের মানুষ ও মননের স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়েছেন। ‘চোখের বালি’ ‘ঘরে বাইরে’ ‘চতুরঙ্গ’ ‘চার অধ্যায়’ প্রতিটি উপন্যাসে পালাবদলের কথা চোখে পড়ার মতো। ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছিল যে, তিনি একাধারে ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’, ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, ‘তারাক্ষর চট্টোপাধ্যায়’ ‘বিভূতিভূষণ

চট্টোপাধ্যায়’ সহ অনেকের রচিত সাহিত্য পাঠ করে নিজের ক্ষেত্রে নির্যাস রূপক চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর রচিত উপন্যাসে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের’ প্রভাব ও কিছু মিল স্বাভাবিক ভাবে চোখে পড়ার মতো।

‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের’ সাহিত্যের মতো ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ বহুউপন্যাসে সময়ের দ্রুততা ও প্রক্ষেপ নেই। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ সৃষ্ট ‘বিনোদিনী’ চরিত্রের মননের মতোই ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ‘সত্যবতী’ চরিত্রের মন ও মননকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের’ লেখা ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে যেভাবে ‘বিমলার’ জীবন সংকট ঘনীভূত হয়েছে, ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ লেখা ‘সুবর্ণলতা’ উপন্যাসে অনুরূপ সংকটের সন্ধান পাই ‘সুবর্ণলতা’ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। আপাতমস্তক আদর্শবাদের মোড়কে জড়ানো ‘রবীন্দ্রনাথ’ সৃষ্ট ‘নিখিলেশ’ ভেবেছিল ‘বিমলার’ সমস্ত অন্তঃকরণটি মোড়া রয়েছে শুধু তাকে দিয়ে। তারই পরীক্ষা নিতে গিয়ে ‘বিমলা’কে বিভ্রান্তির পথে ফেলে দিয়েছিল ‘নিখিলেশ’, যার পরিণামে ‘বিমলার’ পদস্খলন ঘটে। কিন্তু সেখানে পাঠক অপেক্ষা করে ‘বিমলার’ পূর্ব অবস্থান ফিরে পাওয়ার আসায়। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ এইস্থানে প্রশ্ন চিহ্ন রেখে দেন। তাঁর সাহিত্যে দেখা যায় সম্পর্কের বিশ্লেষণে ন্যায়বোধ, নীতিবোধ এবং সর্বপরি গভীর মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত অবস্থান। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ হয়তো সচেতন ভাবে ‘রবীন্দ্রনাথের’ উপন্যাস রচনার উক্ত আদর্শগুলিকে তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। তিনি ‘সুবর্ণলতা’কে ঘর-সংসারের মধ্যে রেখে দেখিয়েছেন সংসারের অন্য কোন সদস্য তাকে ঠিক করে বুঝতেই পারেনি, এমনকি স্বামী ‘প্রবোধ’ও তার ধারেকাছে নেই। সন্তান, স্বামী ও অন্যান্য সকলের কাছে পর্যুদস্ত ‘সুবর্ণলতা’ও তাই শেষপর্যন্ত তার মা ‘সত্যবতীর’ আদর্শকে মেনে নিয়ে সামাজিক মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ন রেখেছে।

‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’-এর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন। ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ বেশীর ভাগ উপন্যাস একটি নৈতিক মানদণ্ডে রেখে দাম্পত্য সম্পর্ক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর উপন্যাসে যখন কোন দাম্পত্য জীবনের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ ঘটেছে, তখনই তিনি স্ত্রীচরিত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ এই ধারণা থেকে সরে এসে মৃত্যুকে তিরস্কার করে জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি চরিত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধান করে উপন্যাসের যবনিকা টানেননি, অসমবিবাহের জটিলতা তাঁকে গভীর ভাবে ভাবিয়েছিল। ‘চোখের বালি’, ‘নষ্টনীড়’ উপন্যাস সেই ভাবনার পরিণত রূপ হিসেবে রচিত। পরবর্তীকালে তিনি ‘ঘরে বাইরে’ ও ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের গভীরে নিহিত কিছু সঙ্কট নিয়ে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ তাঁর বেশীর ভাগ উপন্যাসে যেখানে ‘ত্রিভুজ ছক’ পরিণয় সম্পর্ক তৈরি করেছেন, ‘রবীন্দ্রনাথ’ সেখান থেকে সরে এসে ‘চতুর্ভুজ ছক’ তৈরি করেছেন ‘মহেন্দ্র’-‘আশা’-‘বিনোদিনী’ ও ‘বিহারী’কে নিয়ে। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের’ পরবর্তীকালে অনেকে এই ‘ত্রিভুজ ছক’ ও ‘চতুর্ভুজ ছক’ গ্রহণ করে উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু কিছুটা হলেও ব্যতিক্রমী ‘আশাপূর্ণা দেবী’, কারণ তাঁর উপন্যাসে তৃতীয় অথবা চতুর্থ ব্যক্তির প্রবেশের ফলে দাম্পত্য সম্পর্কে সংকটের ছায়া তেমন ভাবে কোথাও ঘনিষে আসেনি। তাঁর উপন্যাসে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক ছোট অথবা বড় সমস্যা ও মানসিকদ্বন্দ্ব দাম্পত্য জীবনের সংঘাত তৈরির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ ও ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের’ প্রভাব তাঁর সাহিত্যে থাকার জন্য তিনি খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন শত বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও নারী কতটা ধৈর্য সহকারে দাম্পত্য সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে চায়। আবার

শেষপর্যন্ত ‘সত্যবতী’, ‘সুবর্ণলতা’, ‘সুরেশ্বর’ মতো নারী চরিত্রের ঘর-সংসার ছেড়ে আত্মসম্মতির জন্য পথে নামতে হয়, নিজেদের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে দিয়ে। এই চিত্রও তাঁর উপন্যাসের প্রেক্ষিতে সেদিনকার পটভূমিকায় নবতম সংযোজন। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের’ উপন্যাসে সময়ের প্রক্ষেপে কাহিনীর দ্রুততা তেমনভাবে দেখা যায় না। দাম্পত্য জীবনের চিত্রাঙ্কণেও তিনি একইভাবে হালকা টেউ এর দোলা দিয়ে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। ‘নষ্টনীড়’ ও ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের কাহিনী উক্ত প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায়। প্রথমটিতে দেখা যায় স্বামীর অনাগ্রহ, ব্যস্ততা ও নিঃসঙ্গতা ক্রমশ নায়িকা ‘চারুলতা’কে বিপথে চালিত করে। ‘অমল’ সেই সুযোগে ধীরে ‘চারুলতা’র সমস্ত মনের অধিকার করে নেয় তার সহজাত ভঙ্গীতে। ‘অমল’ চলে যাওয়ার পর ‘চারুলতা’র মনে যেরকম তোলপাড় অবস্থার তৈরি হয়, তাতে অস্থিরতার ক্ষেপ নেই, নেই দ্রুত লয়ে ছন্দ পতনের ঘটনা। ‘রবীন্দ্র সাহিত্যে’ এরকম অবস্থার প্রকাশ ঘটে থাকে ধীর শান্ত ও সংযত ভঙ্গীতে। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে অনুরূপ ভাবে ‘বিমলার’ মনের বিবর্তন ও মেকি ঝলকানিতে ভুলে স্বামীর অগোচরে ‘সন্দীপের’ প্রেমাবেশে পদস্থলনের পরে চেতনা প্রাপ্ত হলে, ঔপন্যাসিক কোথাও ‘পুনঃ মুখিক ভব’ অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে অস্থিরতার প্রকাশ ঘটাননি। মূলত ‘রবীন্দ্র সাহিত্য’কে নানারকম সম্পর্কের বিশ্লেষণ, ন্যায়বোধ, নীতিবোধ ও সর্বোপরি গভীর মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাসে অনুরূপ ভাবে ধীর লয়ে নির্দিষ্ট ছন্দে মূল্যবোধের মাত্রা অক্ষুণ্ণ রেখে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে দেখা যায়।

‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের’ উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙালী জীবনের যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তাতে করে দাম্পত্য জীবনের নতুন থেকে নতুনত্বের সন্ধান লাভ করা সম্ভব। আমরা ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে

দাম্পত্য সম্পর্ক তুলনামূলক আলোচনার জন্য প্রতিনিধিত্বানীয় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাসের কথা তুলে ধরে বিশ্লেষণ করবো। ‘শরৎচন্দ্রের’ উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের অন্বেষণে আগে বিবাহ ও দাম্পত্য কেন্দ্রিক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-চেতনা নিয়ে, সমালোচকদের মন্তব্যের ভিত্তিতে বলা যায়—

“বিবাহ শব্দটির ব্যাপ্তি এবং গভীরতা দুই-ই শরৎচন্দ্রের রচনায় আছে। তিনি সেই কথাকার যিনি জীবন ছেনে নর-নারীর বিবাহ ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন। তাঁর প্রখর সমাজচেতনা এবং সহানুভূতিকাতর মন নারীর দিকে ঝুঁকেছিল। দেখেছিলেন পুরুষের সমাজব্যবস্থা নারীর শ্বাসরোধ করে তোলে। তাই স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েও কৌলিন্যপ্রথার প্রতি তাঁর রোষকষা দৃষ্টি। বর্ণগৌরব তাঁকে কোনভাবে আচ্ছন্ন করেনি। রুঢ় বিদ্রোপ লিখেছেন বৃদ্ধ জরদগব কুলীনের বিবাহকাহিনী, যার অন্তে শোনা যায় বালবিধবার বুকচাপা কান্না। সেই বালবিধবার পদস্বলনে কিংবা বিধবার অচরিতার্থ প্রেমের ছবি আঁকায় তিনি বিষন্ন কোমল স্বভাবী লেখক। অন্যদিকে প্রেম থেকে বিবাহ কিংবা বিবাহ পরবর্তী প্রেমের বর্ণনায় তাঁর মুখ হয়ে ওঠে সহসা উজ্জ্বল। স্বামী-পুত্র-পরিবার নিয়ে আনন্দে ভরপুর নারীর মধ্যে তিনি দেখেন নারী জীবনের সার্থকতা। আবার তিনি তো বিবাহ বিচ্ছেদের পক্ষেও আছেন। নতুন নারী গ্রহণ পুরুষের অধিকার হলে নারীই বা কেন সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে”।^(১৩)

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন নিয়ে সমালোচক ‘সুদীপ বসু’র উক্ত মন্তব্যের নির্যাসে উঠে আসে গোটা সাহিত্যের ভিত্তিতে ‘শরৎচন্দ্রের’ সমাজচেতনা। অবশ্য দাম্পত্য-প্রেম ও দাম্পত্য বহির্ভূত প্রেম নিয়ে ‘শরৎচন্দ্রের’ মত তুলনায় অন্য সকল উপন্যাসিকের থেকে একেবারে পৃথক ছিল। তিনি একদিকে যেমন দাম্পত্য জীবনের স্বচ্ছন্দতা পছন্দ করতেন, অন্যদিকে তেমনি দাম্পত্য জীবন বহির্ভূত প্রেমকেও প্রাধান্য দিতেন। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর এই যুগ্ম ধারণার প্রকাশ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ‘শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়’

‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে লিখেছেন—

“প্রেম সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি বরাবরই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব। বিবাহের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না হইলেও, সামাজিক অনুমোদনের ছাপমারা না থাকিলেও, চিরাভ্যস্ত সংস্কারের খোলস বর্জিত না হইলেও প্রেমের যে একটা নৈসর্গিক মহত্ব, একটা বিপুল আত্মলোপী আবেশ আছে, সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রথম বয়সের উপন্যাসেও বেশ সচেতন আছেন”।^(১৪)

প্রেমের এই নৈসর্গিক মহত্ব ও আত্মলোপী আবেশকে ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ অনেক ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনের ভিত্তিতে উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ করার মতো সুখী-দাম্পত্য জীবনের কথা তেমনভাবে তাঁর কোন উপন্যাসেই দেখা যায় না। তিনি ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ সৃষ্ট ‘ত্রিভুজ ছকের’ প্রেমের রীতিকে অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করে উপন্যাসের মধ্যে চারিত্রিক দ্বন্দ্ব তৈরি করেছেন, ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসটি আলোচ্য বিষয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে ‘বিরাজ বৌ’ উপন্যাসের গল্পের মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের সুষ্ঠু একাত্ম মিলন দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু উপন্যাসের সমাপ্তিতে দারুণ বিপর্যয় অগাধ প্রীতি, ঈর্ষা ও অভিমানজাত সন্দেহ বিকারের কারণে ‘বিরাজ’ ও তার দাম্পত্য জীবনে কিছুটা অশান্তি ঘনিয়ে আসে। আসলে ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ জীবনের দ্বন্দ্বকে অনেকটাই স্বীকার করে নিয়েছেন কাহিনীর রস ঘনীভূত করার জন্য। অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনায় মূলত স্বামী-স্ত্রীর সুখী দাম্পত্য জীবন প্রাধান্য পেয়েছে। সেইসব ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ, তিরস্কার ও মনমালিন্য ছিল একেবারে ব্যতিক্রমী ঘটনা। কিন্তু পরবর্তীকালে ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, ত্রয়ী-বন্দ্যোপাধ্যায় ও ‘আশাপূর্ণা দেবী’দের মতো ঔপন্যাসিকদের কাছে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ ও তপ্রোত ভাবেই উত্তপ্ত হতে দেখা যায়। তাঁদের উপন্যাসে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সমস্যাকে উত্তপ্ত করে আগুনে পুড়িয়ে

লৌহশলাকার মতো নিংড়ে তৈরি করা হয় চরিত্র। আর তাই চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি হয়ে দাঁড়ায় মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের কারণ। আধুনিক ঔপন্যাসিকরা মনে করেন—

“স্থায়ী বন্ধন মাত্রই আনে অতৃপ্তি ও বন্ধনছেদের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, দাম্পত্য শান্তি ঝটিকার ক্ষণবিরতি মাত্র, এক অনিশ্চিত ও কৃচ্ছসাধ্য ভারসাম্যের উপরই নির্ভরশীল”^(১৫)।

এই ধারা কিছুটা ‘আশাপূর্ণা দেবী’ তাঁর লেখার মধ্যে অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের’ মতো উপন্যাসের মধ্যে দাম্পত্য-পূর্ব প্রেমকে তেমন বেশী প্রাধান্য দেননি। তাঁর মতে দাম্পত্য-পরবর্তী প্রেমই আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ তাতে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ সেখানে ব্যতিক্রমী, তাঁর ‘পল্লীসমাজ’, ‘দেবদাস’, ‘শ্রীকান্ত’ ইত্যাদি উপন্যাসে দাম্পত্য-পূর্ব প্রেমকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের সার্বিক সুষ্ঠু রূপায়নে দুজন ঔপন্যাসিক সমান কৃতিত্বের অংশীদার।

‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের’ পর যে পুরুষ ঔপন্যাসিকরা সাহিত্যের জগতে পদার্পণ করেন, তাঁরা সকলেই প্রায় ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ সমসাময়িক। চিন্তা-চেতনাতেও প্রায় সম-সহানুভূতি সম্পন্ন ও সহধর্মী। তাই ‘বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়’, ‘শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়’, ‘তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়’, ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’, ‘জগদীস গুপ্ত’, ‘সুবোধ ঘোষ’ প্রমুখদের রচনার সঙ্গে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাসের দাম্পত্য সম্পর্কের বিষয়ে তেমন বেশী পার্থক্য দেখা যায় না। সকলেই প্রায় একই যুগ যন্ত্রনা ও সামাজিক পরিস্থিতিতে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাই সার্বিক দিক থেকে হয়তো পার্থক্য নয় মিল বেশী চোখে পড়বে।

‘আশাপূর্ণা দেবী’ পুরুষ ঔপন্যাসিকদের কাছ থেকে আলোচ্য বিষয়ে যেমন অনেকটাই ঋণী, তেমনি নিজেও দিয়েছেন অনেকটাই। তিনি দাম্পত্য জীবনের নতুন দিশা তেমন ভাবে দেখাতে পারেননি, কিন্তু বহুকাল ধরে লালিত-পালিত কুসংস্কারে আবদ্ধ পুরুষ শাসিত দাম্পত্য জীবনের সংস্কার সাধনে অনেকটাই জয়ী হয়েছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে আমরা সেখানেই তাঁর সাহিত্যের সার্থকতাকে মান্যতা দিয়ে মাথা উঁচু করে তাঁর দিকে তাকাই।

<<<<<>>>>>

তথ্যসূত্র

- ১) Webster's, Encyclopedia Unabridged Dictionary of the English Language, New York-1989, Page-299.
- ২) Dr. Sarbapally Radhakrisnan, Contemporary Indian literature, George, K.m. (Ed). 1984. Page-84
- ৩) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা. লি., পুনর্মুদ্রণ-২০১১/১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৩-১৫৪.
- ৪) রামতনুলাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., প্রথম সংস্করণ-১৯০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২১.
- ৫) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা. লি., পুনর্মুদ্রণ-২০১১/১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৭.
- ৬) মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা, সুদক্ষিণা ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪৬.
- ৭) অন্নপূর্ণার মন্দির, নিরুপমা দেবী, প্রথম প্রকাশ-১৯১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৪.
- ৮) প্রথম প্রতিশ্রুতি, আশাপূর্ণা দেবী, মিত্র ও ঘোষ প্রা. লি., পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৩
- ৯) সমকালের জিয়নকাঠি, সম্পাদক- নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, আশাপূর্ণা দেবী বিশেষ সংখ্যা, ২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৯০.
- ১০) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা. লি., প্রথম প্রকাশ-১৯৬৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪২৪.

১১) বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৫.

১২) বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৫.

১৩) উপন্যাসে বিবাহ, সম্পাদনা-অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পূর্বা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- ১৪১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৬.

১৪) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা. লি., পুনর্মুদ্রণ-২০১১/১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২৬.

১৫) কালের প্রতিমা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৪১.

<<<<<>>>>>

উপসংহার

আশাপূর্ণা দেবী বিংশ শতকের কথাসাহিত্যিক।

তবে তাঁর সাহিত্য রচনায় ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সমাজ ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে। সেই সূত্রে প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আশাপূর্ণা দেবীর জীবন ও সাহিত্য কৃতির একটি সাধারণ পরিচয়। সেইসঙ্গে যে সম্পর্কের ভিত নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি করে, সেই দাম্পত্য জীবনের কথা নানাদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে নির্যাস রূপে তুলে ধরা হয়েছে। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের থেকে একেবারে ব্যতিক্রমী ছিলেন না। তিনিও লেখার মাধ্যমে মূলত সমাজের নর-নারীর জীবনের বিভিন্ন সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন। বাঙালীসমাজ জীবনের আতুর ঘরের কথা তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয়েছে বলে সমালোচকরা মন্তব্য করে থাকেন। অবশ্য তাঁর উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলির জীবনক্রম বিশ্লেষণ করলে পাঠক নিজেই বুঝে উঠতে পারেন যে, কিভাবে তিনি উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙালীসমাজ জীবনের অলিখিত নানাতর ইতিহাসের কথা লিখে রেখেছেন। যে ইতিহাস কোনদিন কোন ইতিহাস বইয়ের পাতায় মুদ্রিত হয়নি, কালের নিয়মে অবক্ষয় প্রাপ্ত বিলুপ্ত প্রায়, সেই ইতিহাসকে ঔপন্যাসিক তাঁর লেখার মাধ্যমে ভাবিকালের মানুষের জন্য তুলে রেখেছেন। তবে আলোচ্য গবেষণায় কোন ইতিহাসের পুনঃরাবিস্কারের কথা বলা হয়নি, মানুষের দাম্পত্য জীবনের নানাতর ঘাত-প্রতিঘাত, সংগ্রাম, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, কল্পনা-বাস্তব, চাওয়া-পাওয়ার বিভিন্ন মানসিকতার মাধ্যমে যে পরিণতি সাধন ঘটে; তারই চিত্ররূপ কিভাবে ঔপন্যাসিক ‘আশাপূর্ণা দেবী’ উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন; এবং কেনই বা লিখেছেন তার সার্বিক সত্যের অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাসের ক্রমানুসারে পর্যায় বিভাগ। এই পর্বে তাঁর সাহিত্য রচনার ধারাকে তিনটি পর্বে

বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন ‘প্রভাত পর্বে’ ১৯৪৪-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই পর্বে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ‘মধ্যাহ্ন পর্বের’ উপন্যাসে নারীর অন্তঃপুরের কথা, নারীর অন্তঃমননের কথা বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। যা দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো সে কারণে এই পর্বে রচিত উপন্যাসগুলি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে গেছে। এই পর্বের রচনা গুলির মধ্যে অন্যতম ‘বৃত্তপথ’, ‘যুগলবন্দী’, ‘সুবর্ণলতা’, ‘বিজয়ী বসন্ত’, ‘মনমর্মর’, ‘বকুলকথা’, ‘পলাতক সৈনিক’, ‘সুখের নিলয়’, ‘মায়াজাল’ ইত্যাদি উপন্যাসগুলি। ‘সায়াহ্ন পর্ব’ যেখানে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ আরো বেশী করে নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। এবং সমাজ বাস্তবতার নিরিখে নারী মনের জটিলতা ও দাম্পত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ‘আশাপূর্ণা দেবীর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপরেখা। ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ থেকে ‘তারাক্ষর’ পর্যন্ত পুরুষ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। ঠিক একই সঙ্গে নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা কতটা স্বতন্ত্র ভাবে উঠে এসেছে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’ থেকে ‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’ পর্যন্ত নারী ঔপন্যাসিকদের রচনা আলোচিত হয়েছে। আর তারই নিরিখে সমাজ নিয়ন্ত্রক কিছু সমাজপতিদের দ্বারা আরোপিত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের কথা ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ লেখায় বেশী করে পাওয়া যায়। তাঁর পূর্ববর্তী ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’, ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, ‘তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়’, ‘বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের’ মতো পুরুষ ঔপন্যাসিকরা সমাজের নানা চিত্র উপন্যাসের পাতায় তুলে ধরেছেন। নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, ‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’, ‘নিরুপমা দেবী’ থেকে ‘সীতা দেবী’, ‘শান্তা দেবী’, ‘রাধারাণী দেবী’দের উপন্যাসেও একইভাবে ফুটে উঠেছে

সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিন্নতর চিত্র। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম ‘আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ’। এখানে মূলত লেখিকার সমাজের রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে, নারী-পুরুষের বিচিত্র জীবন যাপনের চিত্রকে স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। কোথাও সুখী দাম্পত্য সম্পর্ক আবার কোথাও নষ্ট দাম্পত্যের কথা উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম ‘আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে নারীর সামাজিক অবস্থান’। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা কোণঠাসা। বিবাহ নামক যুপকাঠে নারীরা বলিপ্রদত্ত। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কুলীনবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি নিঃসন্দেহে নারীর সামাজিক অবস্থানকে নির্দেশ করে। আবার কোথাও নারী ভোগ্যপণ্য বা পণ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত। অথবা নারী হয়ে উঠেছে পুরুষ শাসিত সমাজের পণ্যসামগ্রী। জন্মের পরে নারী পিতার পরিচয়ে পরিচিত, বিবাহের পর স্বামীর, বার্ষিক্যে পুত্রের পরিচয়ে বেঁচে থাকতে হয়। নারীর সামাজিক অবস্থানের নিরিখে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতাই বিশ্লেষিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। ষষ্ঠ অধ্যায় ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ও অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে নারী ও পুরুষ ঔপন্যাসিকদের রচনার ধারা অনুসরণ করে আলোচিত হয়েছে তুলনামূলক দাম্পত্য সম্পর্ক। আসলে মানুষের জীবনের একটি অন্যতম অধ্যায় দাম্পত্য জীবন। যেখানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কারণে নারী ও পুরুষের ব্যবধানকে সুস্পষ্ট রূপে লক্ষ করা যায়। স্বাভাবতই নারী সেখানে প্রান্তিক। এবং এই প্রান্তিক অবস্থান থেকে কখনো কখনো উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। আবার কোথাও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে জীবনের ব্যর্থতা। যার গভীরে বহুলাংশে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাই দায়ী। এরূপ একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাসের দাম্পত্য সম্পর্কের বিভিন্ন দিক অবশ্যই সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচনা

করতে পারি। সেই সূত্রে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাসগুলি যেন সমাজ ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি।

আলোচনাকালে তাঁর সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনের প্রেক্ষিত, সফলতা ও পরাজয়ের কথাও প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা হয়েছে। তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, কোথায় ‘আশাপূর্ণা দেবী’ অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের থেকে দাম্পত্য জীবনের চিত্রাঙ্কনে সফল হয়েছেন, অথবা অনুসরণ করেছেন। তবে আলোচ্য গবেষণায় একটি বিষয় উঠে এসেছে যে, ‘আশাপূর্ণা দেবী’ পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের লেখার কখনো অনুকরণ করেননি, তিনি নিজেও সেকথা বহুবার স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে স্বভাবতই তাঁর লেখার সঙ্গে মিল দেখা যায় পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের লেখার। সেটা যে লেখার নিয়মেই চলে আসে সে কথা সকলেই জানে, কারণ তিনি যতটা না লেখিকা ছিলেন তার থেকে বেশী ছিলেন পাঠিকা। ‘রবীন্দ্রনাথের’ বেশীরভাগ কবিতা ছিল তাঁর মুখস্থ; তাঁর বোন ‘সম্পূর্ণা দেবীর’ সঙ্গে ছড়া মুখস্থ করার প্রতিযোগিতা ছিল তাঁর প্রতিদিনের কাজ। সেই খাতিরেই তিনি পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের লেখার কিছু ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন ও ঋণ গ্রহণ করে নিজের মতো করে মানবিক চরিত্র নির্মাণ করেছেন। সেই চরিত্রের মধ্যে বহুক্ষেত্রে তিনি মূলত অন্বেষণ করেছেন দাম্পত্য জীবনের ভিন্নতার মূল চাবিকাঠি। আদর্শ দাম্পত্য জীবনের সূত্র অন্বেষণে তাঁর নিরলস প্রয়াস লক্ষণীয়। কারণ তিনি মনে করেন আগামী প্রজন্মের পথ চলার জন্য কাউকে না কাউকে পথ কাটা শুরু করতে হবে, একদিন সেই পথকেই প্রয়োজনের খাতিরে কেউ চলার উপযোগী রাজপথে পরিণত করবেন। তাঁর সমকালে যে সমাজ ব্যবস্থা তিনি দেখেছেন, তাতে করে তাঁর মনে হয়েছিল নারীদের জীবনের চরম দুর্দশা মোচনের জন্য একমাত্র কলমকেই হাতিয়ার করে

নিতে হবে। মূলত নারীদের জীবনের দুর্দশার মূল কারণগুলি অন্বেষণ করে দেখা যায়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, দেবদাসী প্রথার মতো নানারকম কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে নারীরা পথভ্রষ্ট হয়। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ সমস্তরকম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সৃষ্টি করলেন একের পর এক প্রতিবাদী নারী চরিত্র। কারণ তিনি মনে করেন নারীদের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য নারীকেই এগিয়ে আসতে হবে সবার প্রথমে। আর একটি পরিবারের সম্পূর্ণ মুক্তি সাধন অথবা উন্নতি সাধন একজন নারীর মাধ্যমেই সম্ভব। কোনোরকম নারীবাদ প্রতিষ্ঠা নয়; জীবনের সাযুজ্যে, জীবনের প্রয়োজনেই ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর অভিব্যক্তিকে তিনি উপন্যাসের চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন মাত্র। আলোচ্য গবেষণায় উক্ত বিষয়গুলির তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এবং প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা হয়েছে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ ভাবনায় দাম্পত্য জীবনের নানারকম বিশ্লেষণ। মূলত উপন্যাসের প্রসঙ্গেই তাঁর মতামতকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর গবেষণার নিয়মানুসারে ও প্রয়োজনের খাতিরেই তাঁর অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্টির কথাও প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হয়েছে বহুক্ষেত্রে। দাম্পত্য সম্পর্ক ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের তুলনায় বেশী চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং বিভিন্ন উপন্যাসে চরিত্রের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর অভিমতকে প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য গবেষণায় একদিকে যেমন দাম্পত্য জীবনের নানাতর দিক আলোচিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি দাম্পত্য-পূর্ব সম্পর্ক ও বিবাহকেন্দ্রিক নানা বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণা কর্মের মৌলিকতা কোনদিন কোন শুভানুধ্যায়ীর জীবনে শুভপরিণতি সাধিত করলে আমার পরিশ্রমের সার্থকতা প্রাপ্তি ঘটবে।

<<<<<>>>>>

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ

গ্রন্থপঞ্জি

{ক} আকর গ্রন্থ

- আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী(প্রথম খণ্ড) ভূমিকা- পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম মুদ্রণ-
পৌষ ১৪০৬.
- আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী(দ্বিতীয় খণ্ড) ভূমিকা- অরুণকুমার বসু, মিত্র ও
ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম
মুদ্রণ-পৌষ ১৪০৬.
- আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী(তৃতীয় খণ্ড) ভূমিকা- অরুণকুমার বসু, মিত্র ও
ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম
মুদ্রণ- ভাদ্র-আশ্বিন ১৪০৭.
- আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী(চতুর্থ খণ্ড) ভূমিকা-নিতাই বসু, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম মুদ্রণ-
মাঘ ১৪০৭
- আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী(পঞ্চম খণ্ড) ভূমিকা – নিতাই বসু, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম মুদ্রণ-
অগ্রহায়ণ -১৪০৭.

- **আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী**(ষষ্ঠ খণ্ড) ভূমিকা:-সুমিতা চক্রবর্তী, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম মুদ্রণ—
বৈশাখ ১৪০৯
- **আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী**(সপ্তম খণ্ড) ভূমিকা- বারিদবরণ ঘোষ, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম মুদ্রণ—
মাঘ ১৪০২
- **আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী**(অষ্টম খণ্ড) ভূমিকা- সবিতেন্দ্র নাথ রায়, মিত্র ও
ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম
মুদ্রণ- মাঘ ২০১৪.
- **আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী**(নবম খণ্ড) ভূমিকা- মানস মজুমদার, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম মুদ্রণ—
ভাদ্র ১৪১১.
- **আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী**(দশম খণ্ড) ভূমিকা- মানস মজুমদার, মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম মুদ্রণ—
শ্রাবণ ১৪১২

<<<<<>>>>>

{খ} সহায়ক গ্রন্থ

(১) বাংলা সহায়ক গ্রন্থ

- ❖ কামালী, সাদ - রবীন্দ্রভাবনায় নারী ও বিবাহ, পত্রলেখা, কলকাতা- প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১১.
- ❖ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ - সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা-০৬, তৃতীয় সংস্করণ -১৯৭৬
- ❖ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল - সাহিত্যের কোনও শর্ত নেই, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০১১
- ❖ গোস্বামী, অচ্যুত - বাংলা উপন্যাসের ধারা, নতুন সাহিত্য ভবন, কলকাতা, ভাদ্র-১৩৬৪ বঙ্গাব্দ
- ❖ গুপগত, চিত্রলেখা - প্রথম আলোর চরণধ্বনি (উনিশ শতকের লেখিকাদের কথা), উর্বী প্রকাশন, কলকাতা-১৪, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৯
- ❖ গুপ্ত, নূপুর - আর এক আশাপূর্ণা (সম্পাদিত) দেবী আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম মুদ্রণ-মাঘ ১৪০১ বঙ্গাব্দ।
- ❖ গুপ্ত, ক্ষেত্র - বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ -১৯৮৭
- ❖ ঘোষ, প্রবীর - যুক্তিবাদের চোখে নারীমুক্তি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ১৯৯৪
- ❖ ঘোষ, প্রভাত - পরিণয় মঙ্গল, নকশিকাঁথা প্রকাশন, এন ২৫৫ ফতেপুর সেকেন্ড লেন, কলকাতা-২৪, প্রথম প্রকাশ -২০০৯

- ❖ ঘোষ, সুদক্ষিণা - মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা,
(কাহাকে থেকে সুবর্ণলতা) দে'জ পাবলিশিং,
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০১১
- ❖ চক্রবর্তী, সমুদ্র - অন্দরে অন্দরে: উনিশ শতকের বাঙালী ভদ্রমহিলা,
স্ট্রী প্রকাশনী, কলকাতা-২৬, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫
- ❖ চক্রবর্তী, সুবীর - প্রসঙ্গ : নারীবিশ্ব (সম্পাদনা), ধ্রুবপদ প্রকাশন,
কৃষ্ণনগর, প্রথম প্রকাশ -২০০৫
- ❖ চক্রবর্তী, সুমিতা - উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা,
প্রথম প্রকাশ-আগষ্ট ১৯৯৮
- ❖ চট্টোপাধ্যায়, পরাগরঞ্জন - বৈদিক সংহিতায় নারী, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা,
প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ১৯৯৫
- ❖ চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার- উপন্যাস পাঠের ভূমিকা, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট
লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৬২
- ❖ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন - বাংলা উপন্যাসে শিল্পরীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯২৮
- ❖ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন - উপন্যাসের রীপরীতি, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম
চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩,
প্রথম প্রকাশ -মে ২০১১.
- ❖ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন - সাহিত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯,
প্রথম প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
- ❖ চাকী, লীনা - বাউলের চরণদাসী, প্রকাশক - অণিমা বিশ্বাস,
গাঙচিল, কলকাতা-১১, পরিমার্জিত ও
পরিবর্ধিত সংস্করণ-২০০৯

- ❖ চৌধুরী, কবীর - জীবনযাপনের শিল্পকলা (আঁদ্রে মারোয়া) অনুবাদ, প্রতিভাস, কলকাতা-২, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ- ১৫ এপ্রিল ২০০৯
- ❖ চৌধুরী, নীরদচন্দ্র - বাঙালী জীবনে রমণী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা -৭৩, প্রথম প্রকাশ- চৈত্র ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।
- ❖ চৌধুরী, সংঘমিত্রা - আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচিত রচনার ক্রমবিকাশ, বোনা প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০২
- ❖ দত্তভৌমিক, গোপা - কথার অলিন্দে, এবং মুশায়ারা, কলকাতা -২০০৬
- ❖ দে, অশোককুমার - বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধান, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৪
- ❖ দেব, চিত্রা - অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ- ১৯৮৪
- ❖ দেব, চিত্রা - ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ- ১৩৮৭
- ❖ দেবী, অনুরূপা - সাহিত্যে নারী : স্রষ্টা ও সৃষ্টি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-১৯৪৯
- ❖ দেবী, মনোদা - সেকালের গৃহবধূর ডায়েরি, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা- ৬, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৬
- ❖ দেবী, মহাশ্বেতা - অপরাভেদা (সম্পাদিত), ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা-৬, প্রথম সংস্করণ- আগষ্ট ১৯৯৫

- ❖ দেবসেন, নবনীতা - আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন,
ন্যাশনাল বুক স্ট্রাস্ট, নয়াদিল্লী-১৬,
প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৩
- ❖ দাশ, শিশিরকুমার - মোদের গরব মোদের আশা,
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড,
কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
- ❖ দাস, নরহরি - বিবাহসঙ্গী, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৭৩,
প্রথম প্রকাশ-কলকাতা পুস্তকমেলা-জানুয়ারি ২০০৫
- ❖ দাস, সজনীকান্ত - বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং,
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা-৭৩,
প্রথম প্রকাশ-১৯৬১
- ❖ দাস, সজনীকান্ত - বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং,
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কোলকাতা-৭৩,
প্রথম দে'জ সংস্করণ- এপ্রিল ১৯৮৮
- ❖ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার - সমালোচনার কথা, মর্ডানবুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ,
১০বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯
- ❖ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপতিম- অন্তর্ভবন, কথাসাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯০
- ❖ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমী- মধ্যযুগের লোকসাহিত্যে দাম্পত্যসম্পর্ক,
ভাষা ও সাহিত্য, ১০/২বি রমানাথ মজুমদার
স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারী ২০১১
- ❖ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা - স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্ণের
অবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ
মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯,
প্রথম প্রকাশ-২৮শে নভেম্বর ২০০৫

- ❖ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার- **বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা**, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১০বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
- ❖ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ - **বাংলা উপন্যাসের কালান্তর**, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-১৯৬১
- ❖ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ - **বাংলা উপন্যাস : দ্বন্দ্বিক দর্পণ**, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদিশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-২০, প্রথম প্রকাশ-২০ মে ১৯৯৩
- ❖ বসু, অরুণকুমার - **কথাসাহিত্যের নানাদিক, মিত্র ও ঘোষ** পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০০৬
- ❖ বাগচী, যশোধর - **নারী ও নারীসমস্যা**, অনুষ্টিপ প্রকাশনী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০০২
- ❖ বেগম, মালেকা - **বাংলার নারী আন্দোলন**, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৯
- ❖ ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন - **উপন্যাসে বিবাহ (সম্পাদনা)**, পূর্বা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৬ জুন ২০০৫
- ❖ ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন - **বিংশ শতাব্দীর নারী উপন্যাসিক**. পূর্বা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০০১
- ❖ ভট্টাচার্য, জগদীশ - **আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী**, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৪

- ❖ ভট্টাচার্য, তপোধীর - আশাপূর্ণা নারী পরিসর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,
৬/২ রমানাথ মজিমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯,
প্রথম প্রকাশ- ২০০৯
- ❖ ভট্টাচার্য, তপোধীর - উপন্যাসের ভিন্নপাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,
৬/২ রমানাথ মজিমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯,
প্রথম প্রকাশ- ২০০৯
- ❖ ভট্টাচার্য, তপোধীর - উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়ারা,
কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০৫বঙ্গাব্দ।
- ❖ ভট্টাচার্য, দেবীপদ - উপন্যাসের কথা, জি এ ই পাবলিশার্স,
কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮২
- ❖ ভট্টাচার্য, সন্দীপন - মেয়েদের হার মেয়েদের জিত, (সংকলন ও
ভাষান্তর), মনফকিরা, কলকাতা-১২,
প্রথম প্রকাশ- জুলাই ২০০৮
- ❖ ভট্টাচার্য, সুকুমারী - প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য,
আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯,
প্রথম সংস্করণ- ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।
- ❖ ভট্টাচার্য, সুতপা - বাঙালী মেয়েদের ভাবনামূলক গদ্য,
সাহিত্য অকাদেমী, কলকাতা,
প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৯
- ❖ ভট্টাচার্য, সুতপা - মেয়েলি পাঠ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা
লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-
জানুয়ারি ২০০০
- ❖ ভট্টাচার্য, সুতপা - মেয়েলি সংলাপ, প্যাপিরাস প্রকাশনী,
কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ- ২০০৫

- ❖ ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ - উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র, জি এ ই
পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯০
- ❖ মাইতি, মাধবী - মিথ্যা গোপনীয়তা নৈঃশব্দ অবলা সন্দর্ভ
প্যাপিরাস, ২ গগেন্দ্র মিত্র লেন,
কোলকাতা-০৪, প্রথম প্রকাশ ২০১২
- ❖ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার - কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং,
কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯১
- ❖ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার - বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি, দে'জ পাবলিশিং,
কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০০৭
- ❖ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার - বাংলা কথাসাহিত্যের জিজ্ঞাসা, দে'জ
পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩,
প্রথম প্রকাশ-জুন ২০০৪
- ❖ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার - মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে, দে'জ পাবলিশিং,
কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০২
- ❖ মুখোপাধ্যায়, উমা মাজি - বাংলা সাহিত্যে মহিলা কথাকার,
(সম্পাদনা), দে'জ পাবলিশিং,
কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০১২
- ❖ মুখোপাধ্যায়, কনক - নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পশ্চিমবঙ্গ
গনতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, দ্বিতীয় বর্ধিত
সংস্করণ- ডিসেম্বর ২০০৩
- ❖ মুখোপাধ্যায়, জগমোহন - গবেষণা পত্র অনুসন্ধান ও রচনা,
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ - ১৯৯২

- ❖ মুখোপাধ্যায়, তরুণ - কথাপ্রতিমার চালচিত্র, করুণা প্রকাশনী,
কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০০৬
- ❖ মুখোপাধ্যায়, ড. বিমলকুমার - মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব,
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩,
প্রথম দে'জ সংস্করণ -জানুয়ারী ২০০৬
- ❖ মজুমদার, অর্চনা - রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা,
দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭০
- ❖ মাইতি, মাধবী - মিথ্যা গোপনীয়তা নৈঃশব্দ্য অবলা সন্দর্ভ,
প্যাপিরাস-কলকাতা-৪,
প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১২
- ❖ মাজী, বিপ্লব - ইকোফেমিনিজম নারীবাদ ও তৃতীয় দুনিয়ার
প্রান্তিক নারী, অঞ্জলি পাবলিশার্স,
১৪- রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯,
প্রথম প্রকাশ -২০০৯
- ❖ মাজী, বিপ্লব - আশাপূর্ণা দেবী নারীসত্তার বিনির্মাণ
ও শিল্পরূপ, (সম্পাদনা ও সংকলন),
অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা-৯,
প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী ২০১১
- ❖ মিত্র, ড. অরুণকুমার - কন্যা জায়া ও জননী,
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০১০
- ❖ মৈত্র, শেফালী - নৈতিকতা ও নারীবাদ,
নিউ এজ পাবলিশার্স,
কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৩

- ❖ রহমান, অবিন্দন - আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ,
বাংলা অ্যাকাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-
আষাঢ় ১৪০০ বঙ্গাব্দ।
- ❖ রহমান উর্মি - পাশ্চাত্যে নারী আন্দোলন,
নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-৬,
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬
- ❖ রায়চৌধুরী কালীপ্রসাদ - সমাজবিবর্তন ও বিবাহপদ্ধতি,
এই সহস্রধারা, ১৪ নৈনান পাড়া লেন,
কলকাতা-৩৬, প্রথম প্রকাশ-৩০তম
কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী ২০০৫.
- ❖ রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ - দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন কথাসাহিত্য,
দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি
স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭
- ❖ রায়চৌধুরী, তপন - বাঙালানামা, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫
বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯,
প্রথম সংস্করণ- মে ২০০৭
- ❖ রায়, দেবেশ - উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং,
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৯১
- ❖ রায়, নীহাররঞ্জন - বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব,
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩,
প্রথম প্রকাশ-২২ শে শ্রাবণ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।
- ❖ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ - বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা,
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ
সংস্করণ- বৈশাখ ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

- ❖ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ - শিল্পে সাহিত্যে দেশকাল,
দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮১
- ❖ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ - বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা,
দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বক্সিম চ্যাটার্জি
স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-
জুন ২০০০
- ❖ রুদ্র, অশোক ও অন্যান্যরা - শেকল ভাঙা সংস্কৃতি,
উৎস মানুষ সংকলন,
চতুর্থ প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭
- ❖ লাহা, চিত্তরঞ্জন - মূল্যবোধ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস,
পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০০৭
- ❖ শ, রামেশ্বর - আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ
প্রসঙ্গ, উত্তরসূরী প্রকাশনী, কলকাতা,
প্রথম প্রকাশ-১৯৮২
- ❖ শাস্ত্রী, শিবনাথ - রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,
(সম্পাদনা- বারিদবরণ ঘোষ) নিউ এজ
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১২ বি বক্সিমচন্দ্র চ্যাটার্জি
স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯০৪
- ❖ সমাদ্দার, কমল - বাংলা উপন্যাসে লোকজীবন চর্চা, মুখার্জী
পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৪
- ❖ সাহা, ড. সঙ্গীতা - জননী ভাবনা আশাপূর্ণা দেবী ও মহাশ্বেতা
দেবী, পাণ্ডুলিপি, ১এ, কলেজ রোড,
কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-বর্ধমান
বইমেলা, ডিসেম্বর-২০১২

- ❖ সিংহ, অসিত - বাংলা উপন্যাসে সমাজচিত্তার বিবর্তন,
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩,
প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০০৬
- ❖ সিংহ, কঙ্কর - বার্তাও রাসেল, বিবাহ ও নৈতিকতা (অনুবাদ),
প্রকাশক-অরুণ কুমার দে, রাডিক্যাল
ইম্পেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-মে ২০১১
- ❖ সুর, অতুল - ভারতের বিবাহের ইতিহাস,
আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি.,
কলিকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ-১৩৮০ বঙ্গাব্দ।
- ❖ সুর, অতুল - বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন,
সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬,
প্রথম প্রকাশ-১৯৮৬
- ❖ সুর, ড. অতুল - বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি,
কলকাতা-০৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯০
- ❖ সেন, আশালতা - সেকালের কথা,
নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-৬,
দ্বিতীয় সংস্করণ - ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬
- ❖ সেন, নবেন্দু - পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা
(সম্পাদনা), রত্নাবলী, ৫৫ ডি কেসবচন্দ্র
স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।
- ❖ সেন, সুকুমার - বাঙলা সাহিত্যে গদ্য, ইস্টার্ন পাবলিশার্স,
কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩

- ❖ সেনমজুমদার, জহর - উপন্যাসের ঘরবাড়ি, পুস্তক বিপণি,
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯,
প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০০১
- ❖ হাসান, ড. বদরুল - উনিশ শতক : বাংলা নবজাগরণ ও বাংলা
উপন্যাস, জগৎমাতা পাবলিশার্স,
কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯০

<<<<<>>>>>

(২) ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ

- * De, Sushil Kumar - Bengali literature in the
Nineteenth century (1857-1957)
Firms K.L.Mukhopadhyaya
Publications-1962
- * Dev, Amiya - The idea of comparative
Literature: in India,
Papyrus, Culcutta-1984
- * Fokkema, D.W - Issues in general comparative
Literature, Papyrus,
Culcutta-1987
- * Foster, E. M. - Aspects of the Novel,
Penguin Books, New York-1982
- * Hawthorn, Jermy - Studing the Novel,
Universal Book Stall,
New Delhi-1997
- * Lawrence, D. H. - Novelty and the Novel in
20th century literary Criticism,
Ed: David lodge Longman,
Landon-1975

- * Mvir, Edwin - the structure of the Novel,
B. I. Publication, Delhi-1979

- * Sen, Amit - Notes on the Bengali
Renaissance, National Book
Agency, Calcutta-1957

{গ} সহায়ক পত্র-পত্রিকা

(১) বাংলা পত্র-পত্রিকা

- ❖ অনুষ্ঠাপ - (সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক), একবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, প্রকাশিত ১৯৯৭
- ❖ অপরাজিতা সাহিত্যপত্র - (বিবাহ বিশেষ সংখ্যা), সাহিত্যপত্র বিশেষ সংখ্যা ২০১২, যুগ্ম-সম্পাদক-ড. সমর ঘোষ ও অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, বর্ষ ৩১ সংখ্যা ১-২ জানুয়ারী-জুন ২০১২
- ❖ আকাদেমি পত্রিকা ৮ - পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, অষ্টম সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৫
- ❖ আকাদেমি পত্রিকা ৯ - পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, নবম সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৫
- ❖ আত্মবিকাশ - আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পাদক- শ্রী শিবেন্দু শেখর চক্রবর্তী, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, জুন-আগস্ট ২০০৯
- ❖ আনন্দবাজার পত্রিকা - (রবিবাসরীয়). আশাপূর্ণা দেবীর স্ফাৎকার, সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার, ১৭/০৫/১৯৮৭.
- ❖ উত্তরধ্বনি - সম্পাদক- বীরেন্দ্র চন্দ্র, ২৫ বর্ষ : শারদ সংখ্যা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ
- ❖ উত্তরবঙ্গ সংবাদ - আজকের বাংলা উপন্যাস ও আশাপূর্ণা দেবী, তরুণ মুখোপাধ্যায়, ১০ এপ্রিল ২০০৫, রবিবার।
- ❖ এবং এই সময় - আশাপূর্ণা শতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা; সম্পাদক- অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্ষ ৮৪ তম শীত সংখ্যা ১৪১৫,

- ❖ এক্ষণ - সম্পাদক- নির্মল আচার্য, ৩৪ বর্ষ / ২০ খণ্ড/
৩-৪ সংখ্যা : শারদীয়া ১৪০১ বঙ্গাব্দ
- ❖ কথাসাহিত্য - আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পাদক- সবিতেন্দ্র
নাথ রায় ৬০ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ২০০৯
- ❖ কিরাতভূমি - সম্পাদক – অরবিন্দ কর,
২৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
- ❖ কোরক - সম্পাদক- তাপস ভৌমিক, প্রাক শারদ সংখ্যা,
মে-আগষ্ট ২০০৮,
- ❖ দিবা রাত্রির কাব্য - সম্পাদক- আফিফ ফুয়াদ, উপন্যাস সংখ্যা-৩,
একাদশ বর্ষ, জুলাই –সেপ্টেম্বর ২০০৩.
- ❖ দেশ - শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, নবনীতা দেবসেন,
১৪-০১-১৯৭৮,
- ❖ নকশিকাঁথা - সম্পাদক- প্রভাত ঘোষ, ৩য় সংখ্যা,
জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৯
- ❖ বলাকা - প্রাক স্বাধীনতা পর্ব নবচেতনায় বঙ্গনারী,
সম্পাদক- ধনঞ্জয় ঘোষাল, বর্ষ ২০ সংখ্যা
৩০ ডিসেম্বর-২০১১,
- ❖ লোক সংস্কৃতি গবেষণা - (আলপনা ও লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা)
সম্পাদক –সনৎকুমার মিত্র, ১৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা,
বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১২ বঙ্গাব্দ
- ❖ লোক সংস্কৃতি গবেষণা- (জ্ঞাতি-কুটুম লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা)
সম্পাদক –সনৎকুমার মিত্র, ২০ বর্ষ ১ম সংখ্যা,
মাঘ- চৈত্র ১৪১৪ বঙ্গাব্দ
- ❖ শিলীক্ল - আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পাদক-
কমল মুখোপাধ্যায়,
৪৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি –মার্চ ২০১০
- ❖ শুভশ্রী - সম্পাদক- পুলক কুমার সরকার, (নারী বাংলা
কথাসাহিত্য) ৪৩ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ২০০৪-০৫

নির্ঘণ্ট

অ

অমৃতস্য কন্যা -৪, ১১
অমৃতলাল রায় -১০
অতুলকৃষ্ণ রায় -২০
অগ্নিপরীক্ষা -২২, ২৩, ১০২, ১০৪, ১০৫,
১০৬, ১৪১, ১৫৫, ১৫৭,
অমলা দেবী -৫৬
অনুরূপা দেবী -৫৬, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৪,
৬৫, ১৮৪,
অনিলা দেবী -৬২
অর্ধাঙ্গিনী -৬৯,
অন্নপূর্ণার মন্দির -৬৬,
অথইজল -৮৩, ৮৪,
অরুণ কুমার বসু -৯৪, ১৪৫, ১৫৫,
অসমবিবাহ -১৯৭,
অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় -১১৩, ১২৯,
১৭৫,
অসুখী দাম্পত্য -১২৬,
অন্নদামঙ্গল -১৩৭,
অনুরাধা দেবী -১৮৪
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় -১৯৩,

আ

আশাপূর্ণা দেবী -৭, ৮, ১২, ২৬, ৩২,
৫৩, ৬২, ৬৩, ৭৩, ৮৩, ৯১, ৯৩, ৯৪,
৯৬, ৯৭, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১০৮,
১১০, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১২২, ১২৩,
১২৫, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩৪, ১৩৫,
১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৪৬,
১৪৭, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৬, ১৬১,
১৬২, ১৬৪, ১৬৯, ১৭১, ১৭৮, ১৮২,
১৮৪, ১৮৮, ১৯৭, ২০১, ২১৯,
আপার সারকুলার রোড -১৫, ১৬

আনন্দ বাজার পত্রিকা -১৯
আমিনুল ইসলাম -৩৭
আলালের ঘরের দুলাল -৫২, ১৩৮,
১৯৪,
আশালতা দেবী -৫৬
আনন্দধারা প্রকাশন -১০৮,

ই

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -৫৬,
ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী -৫৮,

এ

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা -৫৩, ৭৩,
একান্নবর্তী পরিবার -১০২, ১৪৮,
১৪৯, ১৫০,
একান্নবর্তী সংসার -১৪৯,

ঐ

ঐতিহাসিক উপন্যাস -৫৩

উ

উত্তর কলকাতার পটলডাঙা -১০,
উদ্যানলতা -৬৯,
উন্মোচন -১৪১,
উত্তরণ -১৪১,
উনিশ-বিশ- ১৭৭
উত্তরচরিত -১৮১,
উত্তরায়ণ -৬৪

ঊ

ঊনবিংশ শতাব্দী -৫৫, ২৩৮,
ঊনবিংশ শতক -১৩৬,
ঊণমানব -১৭৭

ক

কালিদাস গুপ্ত -১৮, ২৪,
 কমলা পাবলিশিং -২০, ৩৬,
 কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -২০,২১,২৪,
 কপালকুণ্ডলা -৫৪, ১০৭, ১১৪,
 কৃষ্ণকান্তের উইল -৫৪, ৭৯, ৮০
 কাহাকে -৫৬, ৫৭,
 কথাসাহিত্য পত্রিকা - ২৩, ৬৩
 কালিদাস -১৮১,
 কুমারসম্ভব -১৮১,
 কন্যাদান -১৯০,
 কালিপ্রসন্ন সিংহ -১৯৩,

খ

খোকাখুকু -১৮,

গ

গজেন্দ্র কুমার মিত্র -২২, ২৪,
 গিরিবালা দেবী -৫৬, ১৮৪,
 গরিবের মেয়ে -৫৯, ৬৫,
 গান্ধাজী -৭৩,
 গৃহদাহ -৮২,
 গ্রন্থভবন -১০৬,
 গ্রহাশ্রিতা -১৪৯,
 গলিপথ -১৬০,
 গৌরীদান -১৯০,

ঘ

ঘরে বাইরে -৭৮, ৮০, ১৯৭, ১৯৮,

চ

চিত্রা দেব -৪৩
 চক্র -৫৯,
 চোখের বালি -৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৮,
 ৭৯, ১৯৭,
 চতুরঙ্গ -৭৪
 চতুর্ভুজ ছক -১৯৮,
 চর্যাগীতি - ১৩৭,
 চর্যাপদ -১৩৭,
 চণ্ডীমঙ্গল -১৩৭,
 চল্লিশের দশক -১৪৯,

ছ

ছোট্টাকুর্দার কাশীয়াত্রা -১৯
 ছিন্নমুকুল -৫৬, ৫৭,
 ছায়াপথ -৭২, ১৪৭,
 ছন্দা রায় -৭৩,

জ

জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী -১১,
 জল আর আগুন- ১৯,
 জ্ঞানপীঠ -২৩, ২৫,
 জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় -২৪, ২৫,
 জগন্নারীণী স্বর্ণপদক -২৫,
 জ্যোতির্ময়ী দেবী -৫৬, ৬২, ৭২, ৭৩,
 ১৪৭, ১৮৪,
 জীবনদোলা- ৬৯,
 জন্মান্তরবাদ -৮১,
 জগদীশ গুপ্ত -৮৩, ২০১,
 জীবনস্বাদ -১০৬, ১০৭, ১০৮,
 জহুরি -১৪১,
 জয়দেব -১৮১,

ট

ট্রিবিউন -১০,
ট্রিলজি -১৪১,

ড

ড. সঙ্গীতা সাহা -৯৩,
ড. অনন্যা বড়ুয়া -১১২,
ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন -১৮২

ত

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় -৫৬,
ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় -৫৬,
ত্রিবেণী -৫৯,
তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়- ২২,
৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬,
ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় -৮৪, ২০১,
তপোধীর ভট্টাচার্য -১০৪, ১৭৩,
ত্রয়ী উপন্যাস -১১১, ১৭৮,
ত্রিভুজ ছক -২০০,
তিলোত্তমা মজুমদার -১৮৪,
তসলিমা নাসরিন -১৮৫,

দ

দেশিকোত্তম উপাধি -২৩,
দীপনির্বাণ -৫৬,
দাম্পত্যজীবন -৬৬,
দিবা রাত্রির কাব্য -৮৬,
দেবদাস -২০১,
দৌলতকাজী -১৩৮,
দশ চক্রে ভগবান ভূত -১৫১,
দূর আকাশের তারা -১৫৬,
দ্বিতীয় বসন্ত -১৭৮,

ধ

ধাত্রীদেবতা -৮৪,
ধ্রুতকুণ্ডলী -১৬০,

ন

নিস্তারিণী দেবী- ১০, ১৪,
নিশিকান্ত সেন -১৮,
নরেন্দ্র দেব-২১, ২২,
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-২২,
নরেন্দ্র নাথ মিত্র- ২২,
নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন-২৩,
নবনীতা দেবসেন -২৫, ২৭, ১৮৪,
নববাবু বিলাস -৫২,
নিরুপমা দেবী -৫৬, ৫৯, ৬৬, ৬৭,
১৮৪, ১৮৭, ২০৬,
নব দাম্পত্য সম্পর্ক -৭৫,
নষ্টনীড় -১৯৭, ১৯৮,
নিতাই বসু -১৫১,

প

পুষ্পরেণু রায় -১৩,
পল্লী ও প্রেয়সী -১৯,
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-২০,
প্রেম ও প্রয়োজন -২০, ৩১, ৩৩, ৩৬,
৯১, ৯৫, ৯৭, ১৪১, ১৪২,
পরিমল গোস্বামী- ২২,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার- ২২,
প্রথম প্রতিশ্রুতি -২৩, ১০১, ১১০,
১১১, ১১৫, ১১৮, ১৬০, ১৬৪,
প্রমথ নাথ বিশী- ২৩,
পদ্মশ্রী -২৩,
পালান্দো -৫৫,
পথহারা -৫৯, ৬৩,
পোষ্যপুত্র -৬২,
প্রবাসী -৬৮,
পদ্মরাগ -৭০, ৭১,
পুরুষতন্ত্র -৭১,
পল্লীসমাজ -৮১,
পুতুল নাচের ইতিকথা -৮৬,

পিতৃতন্ত্র -১১৯, ১৭৩,
প্রাগৈতিহাসিক -১৪৬,
পলাতক সৈনিক -২০৬,
প্যারাডাইস লষ্ট -১৮১,
প্যারিচাঁদ মিত্র -১৯৩,

ফ

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ -৫২,
ফুলের মালা -৫৬,

ব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -৯, ৫১,
৫২, ৫৫, ৭৪, ৭৫, ১০৭,
১৮১, ১৯৪, ১৯৭, ২০০, ২০৬,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ -১১, ২৪,
বৃন্দাবন বসু লেন -১৪,
বাইরের ডাক -১৭,
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় -২২,
৮৩, ৮৪, ২০১, ২১০, ২২৩,
বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন -২২, ২৩,
বকুলকথা -২৪, ১১০, ১২৬,
১৩০, ১৩৪, ১৫৭, ১৭০, ১৮৭,
২০৬,
বিশ্বভারতী -২৫,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় -২৫,
বিষবৃক্ষ -৫৪, ৭৭, ৮০,
বাল্য বিবাহ -৫৫, ১৮৯
বহুবিবাহ -৫৫, ১৮৯
বিধবা বিবাহ -৫৫, ১৮৯
বিদ্রোহ -৫৬,
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা -
৫৮, ২০০,
বাগদত্তা -৬৪,
বেথুন স্কুল -৬৯,

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন-৭০,
বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ -৭২,
বৌঠাকুরাণীর হাট -৭৪, ৭৫,
বৃত্তপথ -১০৯,
বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি -১১০,
বিবাহ -১২৪, ১৬০, ১৬৯, ১৯৯,
বিরাজ বৌ -২০০,
বিবাহের বিরুদ্ধে -১২৪,
বিশ্বজিৎ চৌধুরী -১২৭,
বিংশ শতাব্দী -১৩৫,
বড়ুচণ্ডীদাস -১৩৭,
বাৎসল্যমিশ্রিত -১৬৩,
বিজয়ী বসন্ত -২০৬,
বিদ্যাপতি -১৮১,
বিশ্ব সাহিত্য -১৮১,
বাণী বসু -১৮৪,

ভ

ভারতবর্ষ -১০,১১
ভবানী পুরের রমেশ মিশ্র রোড -১৮,
ভূষণ মোহিনী স্বর্ণপদক -২১,
ভূদেব মুখোপাধ্যায় -৫১, ৫৯, ১৯২,
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -৫১, ৫২,
ভারতী -৫৬,
ভারতবর্ষ -৭৩,
ভালোবাসার বিয়ে -১২৬,
ভারতচন্দ্র -১৩৭,

ম

মারকেন্টাইল ব্যাঙ্ক -১৮,
মিত্র ও ঘোষ প্রা. লি. -২২,
মহাশ্বেতা দেবী -২২, ২৩, ২৫, ১৮৪
মৃণালিনী -৫৪,
মিলিন রাত্রি -৫৬,
মিবাররাজ -৫৬,

মালতী -৫৬,
 মা -৫৯, ৬৬,
 মন্ত্রশক্তি -৫৯, ৬৩,
 মহানিশা -৫৯, ৬৫,
 মনের অগোচরে -৭২,
 মনের মানুষ -৮২,
 মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় -৮৩, ৮৬,
 ৮৭, ২০১,
 মিতির বাড়ি -৯৮, ৯৯, ১০১,
 ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৮৯,
 মধুসূদন দত্ত -১১৪,
 মেঘনাদ বধ কাব্য -১১৪,
 মেয়েলি সংলাপ -১২৪,
 মনসাবিজয় -১৩৭,
 মেয়েলি লেখা -১৪০,
 মনমর্মর -২০৬
 মায়াজাল -২০৬
 মিলটন -১৮১,
 মেথিউ আর্গল্ড -১৮১,
 মন্দাকান্ত সেন -১৮৪,
 মল্লিকা সেনগুপ্ত -১৮৫,

 র
 রবি প্রতিভা-৮,
 রত্নমালা দেবী-১১, ১৬,
 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -১৬, ৫৭, ৫৮,
 ৭১, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮৩,
 ১১৪, ১৪৪, ১৮১, ১৯৭,
 রাজকুমার চক্রবর্তী -১৭,
 রবীন্দ্র পুরস্কার -২২, ২৬,
 রাধারানী দেবী -২৩, ২৪,
 রবীন্দ্র ভারতী- ২৪,
 রমেশচন্দ্র দত্ত -৫৫, ৫৬,
 রামেশ্বরের অদৃষ্ট -৫৫,
 রামায়ণ -৬০,

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় -৬৮
 রজনীগন্ধা -৭০,
 রাজর্ষী -৭৫,
 রাঢ়অঞ্চল -৮৬,
 রামায়ণের সীতা -১০৪,
 রামী চক্রবর্তী -১২৩,
 রঙ্গমঞ্চ -১৪৫,
 রথ- ১৫৮,
 রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ-
 ১৮৬,

ল

ল্যাজারাস কোম্পানী -১১
 লাহোর -১১,
 লীলা পুরস্কার -২০, ২১, ২৩

শ

শিবেন্দু শেখর চক্রবর্তী -১১,
 শিশুসার্থী -১৬, ১৮,
 শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়- ২২,
 শিশু সাহিত্য পরিষদ -২৩,
 শরৎ পুরস্কার -২৬,
 শিবনাথ শাস্ত্রী -৫৬, ১৩৬, ১৮৬,
 শান্তা দেবী -৫৬, ৬২, ৬৮, ৬৯, ৭০,
 ১৮৪, ২০৭,
 শৈলবালা দেবী-৫৬,
 শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-৫৮, ৬১, ৬৫,
 ৬৭, ৭২, ১৩৮, ১৪৯, ২০০,
 শ্যামলী -৫৮
 শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-৬২, ৬৩, ৮১,
 ৮২, ৮৩, ১৪৪, ১৫৫, ২০০,
 শেষের কবিতা -৭৪, ৮০,
 শর্বাণী বিশ্বাস রায়চৌধুরী-১১৩,
 শ্রীকান্ত -২০১
 শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় -২০১,

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন -১৩৭,
শরৎ সাহিত্য -১৫৫,
শেক্সপীয়র -১৮১,

স

সরলাসুন্দরী দেবী -৭, ১৪, ২০,
সম্পূর্ণা দেবী -১২, ১৬,
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় - ২২,
সবিতেন্দ্র নাথ রায় - ২২, ২৩,
সজনী কান্ত দাশ- ২২,
সুমথ নাথ ঘোষ-২২,
সুবর্ণলতা-২৩, ১১০, ১১৯, ১২২,
১২৫, ১৭১, ১৯৭,
সাহিত্য আকাদেমি -২৫, ১৮২,
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় -৫২, ১৩৯,
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -৫৫, ৫৬,
স্বর্ণকুমারী দেবী -৫৬, ৫৭, ৫৮,
৫৯, ৬২, ৬৮, ৭৩, ১৮৭, ২০৬,
স্নেহলতা -৫৬, ৫৭,
সীতা দেবী -৫৬, ৬২, ৭০, ১৮৪,
সুদক্ষিণা ঘোষ -৫৮, ১৮৭,
সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় -৫৮,
সংযুক্তা দেবী -৬৮, ৬৯,
সুদীপ বসু -২০০,
সুতপা ভট্টাচার্য -১২৪, ১৪৭,
সুবোধ ঘোষ -২০১,
সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী -১৩৮,
সুখের নিলয় -২০৬,
সেঁজুতি ব্রত -১৬৪,
সাহিত্য -১৮১,
সুচিত্রা ভট্টাচার্য -১৮৪,
সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় -১৮৪,
সেলিনা হোসান -১৮৪,
সত্যেন্দ্রনাথ রায় -১৯৪,

হ

হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত - ৭, ১০,
হংস কুমার তেওয়ারী -২৩,
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় -২৩,
হরনাথ ঘোষ পদক -২৪,
হেনা ক্যাথারিন সুয়েন্স -৫১,
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী -৫৬,
হুগলীর ইমামবাড়ি -৫৭,
হিন্দুজ্ঞানী উপকথা -৬৮,
হরিজন উন্নয়ন কথা -৭২, ৭৩,
হাসানহুসেন -১৩৭,

য

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-২৪, ২৫,
যোগেন্দ্র নাথ বসু -৫৬,
যোগাযোগ -৭৪, ৮০,
যুগলবন্দী -২০৬
যবনিকাপাত -১৭২,
যুগোপযোগী -১৭৮,

>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<